বাঙলা ও বাঙালী

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ
দক্ষিণ কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়
রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ,
২১এ, রাজা বসন্ত রায় রোড,
দক্ষিণ কলিকাতা।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৭
মূল্য—২॥০

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

এই পুস্তকের নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রসচক্রের সদস্যগণের অনুরোধে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় সেই নিবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে সুগ্রথিত করিয়া রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্‌কে প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশ বিভাগের সৌজন্যে আমরা এই পুস্তকের প্লেট ও ব্লকগুলি পাইয়াছি—সেজন্য উক্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন —সেজন্য গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

প্রকাশক।

সূচিপত্র

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

বাঙালী ধ্বংসোন্মুখ, একথা আজিকার নহে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর সতর্ক-বাণী। কন্তু এই অর্দ্ধ শতাব্দীতে বাঙলার প্রকৃতি ও সমাজ খানিকটা নীরবে নির্ব্বিবাদে, খানিকটা বিপ্লবের ভিতর দিয়া ক্রমিক অধোগতির পথে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। গতযুগের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উদ্বেগে ও এই যুগের হিন্দু-মুসলমানের কলহের কলরবে বাঙালী কোন নিষেধ বা সতর্ক-বাণী শুনে নাই। বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক অধোগতিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙলার সামাজিক ব্যাধি নির্ণয় করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে "উপাসনার" সম্পাদকরূপে বাঙলার ক্ষয়রোগের দিকে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। তাহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ক্ষয়রোগ বৃদ্ধি পাইলে নানাদিক হইতে রোগীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ ও দূষিত হইয়া পড়ে। বাঙালীর সমাজ-দেহেও তাহাই হইয়াছে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জলসরবরাহ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র—সব ক্ষেত্রেই অবনতি বাঙালীর অতীতকে বিদ্রূপ করিয়া, বর্ত্তমানকে ধিক্কার দিয়া, তাহার সংস্কৃতিকে কোন ব্যর্থতার অতলে আজি টানিয়া লইতেছে।

এই নিদারুণ রোগের আশু প্রতিকার চাই বিজ্ঞানের দ্বারা, জাগ্রত সামাজিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা। প্রতিকার খুঁজিতে হইলে বাঙালীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাকে লক্ষ্য করিতে হইবে। শুধু ইতিহাস নয়, বাঙালীর প্রতিবেশে নদনদীর বিপর্য্যয়-হেতু যে তুমুল পরিবর্ত্তন সাধিত

হইয়াছে তাহার প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণ, এবং ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অবনতির উপর উহার প্রভাব, সমীক্ষণ করিতে হইবে।

ভৌগোলিক প্রকৃতির বিপর্য্যয়, বাংলার পাঁচ ভাগের দুইভাগে কৃষি, স্বাস্থ্য ও সম্পদের দ্রুত অপকর্ষ, নদনদীর প্রতিরোধ ও প্লাবন, অবনত হিন্দুশ্রেণীর প্রতি উচ্চ জাতির অবিচার ও নির্য্যাতন, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দ্রুত বৃদ্ধি এবং হিন্দু ও মুসলমানের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের সহিত অতীতের চিত্র, এমন কি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও মিলাইয়া লইতে হইবে। এই তুলনামূলক আলোচনার জন্য পুস্তকে এত সংখ্যানির্ঘণ্টের ও এত তালিকার অবতারণা। তবুও মূল সূত্র ও নিয়মগুলিকে ঘটনাপরম্পরার বিবরণের আধিক্য হইতে রক্ষা করিতে এবং উহাদিগের সাহায্যে আর্থিক ও সামাজিক ধারা সরলভাবে নির্দ্দেশ ও পবিমাপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

সামাজিক প্রগতি ও অধোগতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক, আর্থিক ও সামাজিক শক্তির সমবায় ও ঘাতপ্রতিঘাতের উপর নির্ভর করে। বাঙলার ক্ষয় ও অপকর্ষের প্রধান কারণ প্রাকৃতিক সাম্যচ্যুতি। ইহা খানিকটা অনিবার্য্য; কারণ ব’প্রদেশে নদী-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি ও উন্মার্গগমন অবশ্যম্ভাবী। নদীর এই পরিবর্ত্তন কখনও যুগ-সাপেক্ষ, কখনও বা দুই তিন শতাব্দীর অবকাশে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা ইহাকে নদী-বিপ্লব আখ্যা দিই।

বাঙলা আজ নদী-বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত। পশ্চিম বঙ্গে ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর গতিহ্রাস ও পদ্মার পূর্ব্ব-অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল যোড়শ

শতাব্দীতে। নদী-প্রকৃতি এখনও সাম্য অবস্থা খুঁজিয়া পায় নাই। মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি যতই জীর্ণ ও শুষ্ক হইতে থাকিবে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে নদীর ভাঙ্গন ও প্লাবন ততই বৃদ্ধি পাইবে। উভয়েই জলপ্রবাহের অসমতার পরিচায়ক। কিন্তু মানুষের অল্পদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচার শুধু যে এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের জন্য খানিকটা দায়ী তাহা নহে, ইহাই পরিবর্ত্তনকে দ্রুততর করিয়া ঘোর বিপ্লবে পরিণত করিয়াছে।

বাঙলাব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নদীর শাখা-প্রশাখাগুলির পার্ব্বত্য জন্মস্থল ক্ষেত্রে বহুকালব্যাপী অরণ্য-ছেদন ও সমতলভূমিতে পথ ঘাট ও সেতু নির্ম্মাণ যে নদীর অবরোধ ও গতি-পরিবর্ত্তন এবং জলসরবরাহের বিপর্য্যয়ের অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই প্রকৃতি পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গকে মানুষের দৌরাত্ম্যের জন্য অস্বাস্থ্য ও অনুর্ব্বরতা আনিয়া দিয়া, আজ দণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু মানুষকেও প্রকৃতির অভিশাপ মানিয়া লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রাকৃতিক ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে প্রকৃতিরই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনে।

কোথাও অরণ্য-রোপণ, কোথাও বা বিল ও তড়াগ রক্ষা ও পোষণ, কোথাও নদীপথে বাঁধ দিয়া জলাশয়-নির্ম্মাণ, কোথাও বা শুষ্ক নদীতে খরস্রোতা নদীর বন্যা-আনয়ন, কোথায়ও খাল-খনন, কোথাও বা নদীর পঙ্কোদ্ধার বা মোহানার পরিসর-বৃদ্ধি,—নানা উপায় অবলম্বনে নূতন ভগীরথকে আজ মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গকে অস্বাস্থ্য ও কৃষির দুর্গতি হইতে এবং উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গকে নদীর ভাঙ্গন ও প্লাবনের বেগ হইতে বাঁচাইতে হইবে।

কিন্তু কেবল নদীরক্ষা ও আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিলেই যে বাঙলা দেশ রক্ষা পায় তাহা নহে। যেমন পূর্ত্তকার্য্যে নিপুণতা চাই, তেমনই সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেরও সংস্কারে দক্ষতা চাই। বাঙলার

ক্ষয়রোগের প্রতিকার শুধু নদী ও জলসরবরাহের সংস্কার বা প্লাবন-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের আয়োজন করিলেই হইবে না। বাঙলার কায়েমী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন এবং কৃষকের এবং ভূমিহীন ও নিঃসম্বল কৃষাণ, ভাগচাষী ও বর্গাদারের স্বত্বাধিকার লাভের সহিত ক্ষয়িষ্ণু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষির উন্নতি নিবিড়ভাবে জড়িত।

ভূমি-সংক্রান্ত আইনের সংস্কারও ব্যর্থ হইবে, যদি দেশে অনুচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বহুজনন দ্রুত চলিতে থাকে এবং কৃষির জোত আরও পরিবার-পোষণের পক্ষে অনুপযোগী ও খণ্ডবিখণ্ডিত হইতে থাকে। বাঙলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রগতি অনেকটা ব্যর্থ বা বিলম্বিত হইতে থাকিবে যতদিন না বাঙলার কৃষক বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে সংযত না হইবে। একদিকে বাঙলার ভৌগোলিক প্রকৃতি হিন্দু-প্রধান মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবনতি ও মুসলমান-প্রধান ও অনুচ্চ জাতিসমূহের দ্বারা অধ্যুষিত পূর্ব্ব-অঞ্চলের প্রগতির হার বাড়াইয়া ক্রমশঃ হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক অঞ্চলে বসবাস উৎসাহিত করিতেছে, অপরদিকে রাষ্ট্রনীতি এক অখণ্ড বাঙলার প্রজাসমাজকে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের অজুহাতে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বৃদ্ধি করিতেছে।

রাষ্ট্রের অধিকারের সঙ্গে লোকসংখ্যার সংযোগ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণ; অবাধ-প্রজনন এই দ্বন্দ্বকে ভীষণ ও ব্যাপক করিয়া তুলে। ফলে, সমগ্র জাতির জীবনী-শক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে। অতিরিক্ত শিশু-মৃত্যু ও মধ্যবয়স্ক বৃদ্ধের সংখ্যান্যূনতায় যেমন বাঙালী ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী, তেমনই আবার বাঙালীদিগের মধ্যে মুসলমানের অবহেলা এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নদীপ্রবাহগুলি যে অঞ্চলে শুকাইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে সে অঞ্চল হইতে অর্থাৎ বাংলার পাঁচভাগের দুইভাগ হইতে মাটির অনুর্ব্বরতা, কৃষির অধোগতি ও ম্যালেরিয়া বিস্তৃত

হইয়া আজ সমগ্র বাংলাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এইরূপ দ্রুত অবনতি দেখা যায় নাই। বৎসর বৎসর আড়াই হইতে সাড়ে তিন লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া মহামারীতে অকালমৃত্যু পৃথিবীর অপর কোন দেশ এমন সহজভাবে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লয় না! অপরদিকে বাঙলার অতিজনন ক্রমেক্রমে দেশে স্বাস্থ্যহানি, অন্নকষ্ট এবং জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত এবং কৃষক ও কৃষাণের মধ্যে সংঘর্ষ ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা ভয়াবহভাবে বাড়াইয়া চলিতেছে। এই সংঘর্ষকে আবার উগ্র ও উত্তপ্ত করিতেছে ধর্ম্মসম্প্রদায়গত বিরোধ।

১৯২১-১৯৩১ সালের মধ্যে বাঙলার মোট শস্যভূমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এক লক্ষ একার, অথচ লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৩০ লক্ষ। মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষয় কৃষি-সঙ্কোচের প্রধান কারণ। অপরদিকে কতকগুলি বাঙলা-ভাষাভাষী অঞ্চল যাহা এখন বিহার ও আসামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা বাঙলার রাষ্ট্রিক সীমানায় থাকিলে একদিকে যেমন কৃষির সহিত কারখানা-শিল্পের বিয়োগের জন্য বাংলায় যে আর্থিক সাম্যচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহার কিছু প্রতিবিধান হয় অপরদিকে কৃষি বিস্তারের দ্বারা অন্নসংস্থানেরও কিছু সুবিধা হয়।

বাঙলা দেশ এখন ১$\frac{১}{৪}$ লক্ষ টন চাউলের জন্য অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পর বাঙলার বাহিরে বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত গুণের প্রতি অবিচারের জন্য বাংলা দেশকে মহাবঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেই হইবে।

পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসনে আয়ব্যয়ের বাটোয়ারায় বাঙলা সুবিচার পায় নাই এবং ফলে অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বাঙলা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, সমবায় প্রভৃতি জনহিতকর বিভাগে অনেক কম অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছে।

রাজকোষের অনটন বাঙলার অবনতির একটী প্রধান কারণ। কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে ভাষা-অবলম্বনে মহাবঙ্গ-বিভাগের নিরোধ ও রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্ত্তন বিষয়ে বাঙলা সুবিচার পাইবে বলিয়া এখনও মনে হয় না। সুরেন্দ্রনাথ যখন কংগ্রেস পরিচালনা করিতেন সেই যুগের কথা স্মরণ করিলে বাঙলার রাষ্ট্রীয় প্রভাব যে কত খর্ব্ব হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাঙলার আর্থিক অধোগতি ও আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

বাঙলার আর কোন যুগে এতগুলি দুরূহ সমস্যার একযোগে উদয় হয় নাই। আর কোন যুগে ধীর, বিচক্ষণ, বহুদর্শী নেতৃত্বের এমন অভাব বা প্রয়োজন হয় নাই। বাঙলার সেই নেতারই নেতৃত্বপদে এখন আসীন হওয়া উচিত যিনি জাতি ও সম্প্রদায় অপেক্ষা দেশকে, ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান অপেক্ষা মানবিকতাকে বড় করিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ নেতাই জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলনগ্রন্থি রচনা করিয়া সমগ্র দেশের নিকট একটা সার্ব্বজনীন কল্যাণকর আর্থিক ও সামাজিক সুব্যবস্থার বিধান করিতে পারিবেন। মানব ইতিহাসে বাঙালী বর্ত্তমান যুগে এমন এক ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে ব্যক্তিগত অদ্ভুত মনীষা জাতির তত কাজে আসিবে না, যতটা কাজে আসিবে একটা জাগ্রত সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা আর এক প্রকার ছিল। এই প্রজাতন্ত্র ও সামাজিক বিরোধের যুগে বাঙালীর নেতৃত্বের প্রধান অঙ্গ হইবে জনচৈতন্যের উত্তপ্ত স্পর্শ এবং প্রধান উপাদান হইবে—সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্যযুগের মত উচ্চ ও অনুচ্চ শ্রেণী-সম্প্রদায়ের বন্ধনী—এক সরল, উদার, সংস্কারভীতিহীন ধর্ম্মবোধ ও সমাজ নীতি।

বাঙলার যুগপরম্পরালব্ধ সংস্কৃতি যে মনোময়তা, উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা দেখাইয়াছে তাহা ভারতের অন্য প্রদেশে দেখা যায় নাই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, নিশ্চয়ই আশা হয়, বাঙালীর বিজ্ঞান ও চাতুর্য্য বাঙলার নদীবিপ্লব ও ভৌগোলিক সাম্যচ্যুতির প্রতিকার করিয়া দেশব্যাপী নৈরাশ্য ও অবসাদ দূর করিয়া দিবে এবং জাতিকে এমন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেশ-ধর্ম্মের নিকট সম্পুর্ণ পরাজিত হইবে, হিন্দু অনুচ্চ জাতির প্রতি উচ্চ জাতির অবহেলা ও নিপীড়নের প্রয়াস, প্রেম ও মানব ধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইবে এবং সম্পদ ও শিক্ষা যে মুষ্টিমেয় ধনিক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে এখন আবদ্ধ তাহা সমগ্র জনসমাজ-দেহে বণ্টিত হইবে। এই পুনর্গঠনেই বাঙলার আসল রাষ্ট্রের মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইব, বাঙলার জন-গণ-হৃদয়-মথিত রাজ্ঞী মূর্ত্তি, এখনকার ক্রূর কলহনিপুণা রাক্ষসী, ছিন্নমস্তা নয়। জনসমাজের রাষ্ট্রশক্তির আবাহনে যিনি রাজ্ঞী, তিনি উহার অপরোক্ষ অনুভূতিতে হইবেন লক্ষ্মী ও কান্তি, শান্তি ও মুক্তি।

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

বিশ্ববিদ্যালয়
লক্ষ্ণৌ }

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বাঙলা ও বাঙালী

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য

বাংলার রূপ

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত হইতে কিছু স্বতন্ত্র। বালার্ক-কিরণ-রঞ্জিত সুশ্যামল ধান্যক্ষেত্র, দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত বনভূমির স্নিগ্ধ-শ্রী, খরস্রোত বিশাল নদীর উদ্দামতা, জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর মদিরতা, জলে স্থলে আকাশে ষড়ঋতুর অপরূপ শোভা-বৈচিত্র্য, কখনও নীলনিবিড় মেঘসম্ভার, কখনও বজ্রবহ্নি, কখনও স্নিগ্ধ শীতল বারিধারা, শুধু বাংলার রূপ নয়—বাঙালীর সত্তাকেও গড়িয়া তুলিয়াছে।

উত্তরাপথে গঙ্গা ও যমুনা-তটের পল্লীজীবন নির্ব্বিবাদ,—মানুষ সেখানে শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য সেখানে মানুষের ক্ষোভের নিবৃত্তি করিয়াছে।

পূর্ব্বপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার ভীষণ উন্মত্ত প্রবাহ সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সঞ্চার করিতে দেয় নাই। যেখানে নদীর গতি চঞ্চল, যেখানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পর্য্যন্ত উন্মার্গগামী, সেখানকার পল্লীসমাজ সদা পরিবর্ত্তনশীল। নূতন চর গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে—সেইজন্য

কৃষির প্রকৃতি সেখানে নিত্যনূতন। ঝঞ্ঝা ও বন্যা অহরহঃ মানুষের কত যুগের পরিশ্রম ধ্বংস করিতেছে—তাই মানুষ সেখানে নির্ভীক, আত্মনির্ভরশীল।

নদী যেখানে কীর্ত্তিনাশা, মানুষ সেখানে নিত্য নূতন কীর্ত্তি অর্জ্জন করে। তাই কোন কীর্ত্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্ত্তি নষ্ট করিতে পারে নাই।

ইহা বিচিত্র নয় যে, যখন দিল্লীর সম্রাট্ আকবর সমস্ত উত্তরাপথকে আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ মিরজুম্‌লার মত দক্ষ সেনা-নায়ককেও হঠাইয়া আপনাদের স্বাধীনতার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। সমস্ত ভারত দিল্লীর বাদশার পদানত, কিন্তু পদ্মাতীরের বাঙালীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বারভূঁইয়াদের সাহস ও স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্ম্মম ভাঙ্গা-গড়া।

বাংলার মন

উত্তরাপথের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীর পরাজয়ের ইতিহাসের সহিত এই প্রাচ্য-ভারতের স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মানুষও এখানে বিচিত্র। অল্পসংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিক বাংলার অঞ্চলে অধিকসংখ্যক আদিমজাতীয় লোকদের মধ্যে বসবাস করিয়াছিল। ইহাই বাঙালীর অধিকতর রক্ত-মিশ্রণের কারণ। আদিম ও অনার্য্য জাতি এবং নূতন প্রতিবেশী আর্য্যজাতির রক্তের আদান-প্রদান বাঙালীর চরিত্র বিচিত্রভাবে গঠন করিয়াছে।

একদিকে যেমন দ্রাবিড়ী-জাতির শিল্পকৌশল বাঙালীর অপূর্ব্ব শিল্প-কলার উন্নতির কারণ হইয়াছে, অপরদিকে তাহা বাংলার মনের গঠনে একটা বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনশীলতার উপকরণ জোগাইয়াছে।

উত্তরাপথবাসীদের তুলনায় বাঙালীর অন্তর্দৃষ্টি,—ব্যাপকতর, অভিনিবেশ—উদারতর। ইহাই বাংলার প্রেমধর্ম্মে একটা দুর্নিবার আবেগ, সমাজ-রীতিতে একটা সার্ব্বজনীনতা আনিয়াছে, ইহাই বাংলার লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও প্রভাবের কারণ।

* পারিবারিক জীবন ও ব্যবহারশাস্ত্রে ইহাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নিদান হইয়া জীমূতবাহন-প্রবর্ত্তিত বাংলার নিয়ম-কানুনকে ভারতের নিয়ম-কানুন হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়। বাংলার পূজাপার্ব্বণ, আচার-পদ্ধতি উত্তর ভারতের সেই সনাতন অনুষ্ঠানপ্রিয়তা বর্জ্জন করিয়াছে। বাংলার পূজা-পদ্ধতিতে আমরা একটা নির্ভীক ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাই—যাহা কখনই বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠানের বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

বাংলায় যে তন্ত্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে বাঙালী আপনার মনোময়তা, আপনার নিপুণ, বিশ্লেষণশীল অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে। বাস্তবের নিত্য নূতন প্রভাবে বাংলার যে সত্তা জন্ম ও বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাই আধ্যাত্মিক জগতে এমন একটা ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা ও ভাবপ্রবণতা দেখাইয়াছে—যাহা ধর্ম্মের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল।

বাংলার কোমল ভাববিলাস

বাংলার ধর্ম্মজীবনে, বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনায় একদিকে যেমন আমরা অসাধারণ কল্পনা ও কবিত্বের পরিচয় পাই,—যাহা বাংলার জনসাধারণের রীতিনীতি ও লৌকিক জীবনকে এক অপূর্ব্ব ভাবুকতায় মণ্ডিত করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি দেখিতে পাই সূচ্যগ্র বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণপটুতা বহুযুগ ধরিয়া বাংলায় ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে।

বাংলার চারুশিল্প ও স্থাপত্য ও অনন্যসাধারণ। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের শিল্পের সহিত তুলনা করিলে এমন কি গুপ্তযুগের মহিমময় মূর্ত্তিগুলির তুলনায় বাঙালী-শিল্পী পাথরের উপরে যে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শান্তি ও সুকোমল ভাববিলাসের সংমিশ্রণ দেখাইয়াছে তাহা পৃথিবীর স্থাপত্যেও বিরল।

একাদশ শতকে লিখিত তিব্বতীয় (পোগ-সাম-জোম-জাম) গ্রন্থে আমরা বাঙালীর শিল্প-প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় ও বিচার পাই। বাঙালী ভারতবর্ষের মধ্যে চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে নিপুণতম, তাহার পর নেপালী, তাহার পর তিব্বতী এবং সর্ব্বশেষে চীনা শিল্পীরা। এই পর্য্যায় মধ্যযুগের তুলনামূলক শিল্পালোচনায় নির্ণীত হইয়াছিল। স্থাপত্য ও চারুশিল্পে বাঙ্গালীর অবদান আজও সম্মানিত হয় নাই, কারণ, বাঙালী-স্থাপত্যের ইতিহাস এখনও অলিখিতই রহিয়াছে।

সারনাথের বিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত রাজসাহীর (বিহারিলের মূর্ত্তি) বুদ্ধমূর্ত্তির (যাহা খুব সম্ভব পঞ্চম শতকে রক্তাভ বালু-পাথরে তৈয়ারী হইয়াছিল) তার তুলনা করিলে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ম্লান হইবে না।

দক্ষিণের নটরাজ মূর্ত্তির তুলনায় রামপালে প্রাপ্ত বৃষারূঢ় নটরাজ আরও সুন্দর ও মহীয়ান্। নৃত্য-ভঙ্গী ইহার আরও তুরীয় ও ব্যাপক; বৃষের ভাব-বিলাস অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী এবং শিল্পবস্তুর সমগ্রতা আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ।

ইহা ছাড়া বাঙালী-শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ্ লক্ষ্মী-নারায়ণ বা হরগৌরীর প্রকৃতি-পুরুষাত্মকভাব-সূচক যুগল-মূর্ত্তি ও মহাদেবীর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, লীলায়িত বিলাস অথচ ধ্যানসমাহিত স্তব্ধতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেয়।

বাংলার পটুয়াদের অঙ্কিত নানাপ্রকার ছবিতে, নানা ইট পাথরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে শিল্পী যে শান্ত গরিমার সঙ্গে অফুরন্ত ঘরের মাধুর্য্য, প্রেম ও মমতা ফুটাইয়াছে, তাহা ভারতের চারু শিল্পের ইতিহাসে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারতীয় চারুশিল্পের মত এখানে আছে ধ্যানস্থ তুরীয় ভাব, অথচ নূতন ভঙ্গী আসিয়া পর্য্যাপ্তভাবে রস ঢালিয়া দিয়াছে এক সহজ সরল কোমলতা ও মানবিকতার—যাহা কখনও ফুটিয়াছে বুদ্ধ ও বিষ্ণুর প্রসন্ন মুখমণ্ডলে, কখনও শিবের স্নেহাভিষিক্ত ঈষৎ হাস্তে, কখনও বা গৌরীর চঞ্চল লাস্যভঙ্গী ও নিবিড় আত্মনিবেদনে।

বাংলার লোক-সাহিত্যেও বহুযুগ হইতে আমরা পরিচয় পাইয়াছি মনোময়তা ও ভাববিলাসের। সমাজের দণ্ড, সংস্কারের নিগড়, পারিবারিক জীবনের গ্লানি সবই গল্প-উপকথায়, গীতে, আখ্যানে একটা অসামান্য সত্যনিষ্ঠা ও সহজ প্রেমের সাধনার দ্বারা চিরকাল লাঞ্ছিত। সাহিত্যের সাধনায় ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতার জন্যই বাংলায় এত গীতি-কবিতার বাহুল্য। সাহিত্যে সমাজধর্ম্মের প্রচার অপেক্ষা আমরা সুকুমার বৃত্তির

সহজ অনুশীলনেরই পরিচয় পাই। উত্তর ভারতের লোকসাহিত্য অনেকটা প্রাচীন সমাজ রীতিনীতির বন্ধন মানিয়া চলিয়াছে। বাংলার কথা-সাহিত্য বিচিত্র রস ফুটাইয়াছে,—সমাজ নহে, ব্যক্তি-হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া, সামাজিক বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া, পুরাতন আদর্শকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া ও ব্যক্তিজীবনের পরিণতি হইতেই নিষ্ঠা ও নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া।

প্রবাসী

এই ত গেল বাংলার রূপ ও মনের জন্ম-কথা। বিশাল গাঙ্গেয় সমতলভূমির একপ্রান্তে বাঙ্গালীর রক্তধারা অবিমিশ্রিত থাকিতে পারে নাই। উত্তর-পশ্চিম হইতে বিতাড়িত ও বিক্ষিপ্ত নানাজাতি ও গোষ্ঠীর লোক বাংলার বনজঙ্গল ও জলাভূমিতে বহুযুগ হইতে আশ্রয় পাইয়াছিল। এই জাতি-সংমিশ্রণ যেমন বাঙ্গালীর ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার জন্য দায়ী, তেমনই বহু নদী-পথ বাঙ্গালীকে ঘর হইতে হাতছানি দিয়া অকূলে লইয়া যায়। বাঙ্গালী যেমন বিদ্রোহী, তেমনই আবার অনিশ্চিতের পথে সদা ধাবমান।

ইতিহাসে বাঙালী প্রবাসী। তাম্রলিপ্তি, চম্পা, পাটলিপুত্র ও কাশী হইতে বাঙালী বহুযুগ ধরিয়া সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে, সমস্ত দক্ষিণ ঘুরিয়া পশ্চিমে ভৃগুকচ্ছে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, স্বুবর্ণ-ভূমিতে সমৃদ্ধিশালী বিপণি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং কত না সওদাগর লঙ্কায় পৌঁছিয়া শিল্পবাণিজ্যের ও সংস্কৃতি-বেদান্তের কীর্ত্তি পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। চাঁদ সদাগরের ও শ্রীমন্তের মত কত গ্রামের কত প্রবাসী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া যুগে যুগে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

এই অতৃপ্তবাসনা বাঙালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং তাহাই আজ এত বাঙালীকে দূর প্রবাসে পাঠাইয়াছে! সুদূর ত্রিবাঙ্কুরে বাঙালী প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। আরব সাগরের বন্দর আলিপ্পিতে বাঙালী কারখানার কর্ম্মাধ্যক্ষ। মহীশূরে বাঙালী প্রধান মন্ত্রসচিব। নেপালেও বাঙালীর আধিপত্য। কাশ্মীর, জয়পুর, বরোদায় বাঙালী আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেখাইয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশে বাঙালী উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতেছে।

বাঙালীর লজ্জাগৌরব

কিন্তু বাঙালীর যে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, তাহার যুগ পরম্পরা-লব্ধ সাধনার দান, তাহা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক জীবনে প্রতিষ্ঠাব সহায় হইয়াছে, অপর দিকে বংলা দেশে তাহাই আবার একটা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রশ্রয় দিয়াছে। একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, বাঙালী যেমন তাহার জাতিগত সাধনার উপলব্ধি করিয়াছে, অপর দিকে ভারতীয় শিক্ষা ও দীক্ষা হইতে সে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে বাঙালী ভারতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। নূতন শিক্ষায়, নূতন ধর্ম্মে, নূতন সমাজে বাঙালী যুগপ্রবর্ত্তক।

কিন্তু বিপ্লবের পর গঠনের যুগ। এই গঠনের যুগে বাঙালী তাহার নেতৃত্ব হারাইয়া বসিয়াছে। সমাজধর্ম্মে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ, শিক্ষায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের ভারতমান্য নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু সংস্কারযুগের বাংলার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, আজ এই গঠনের যুগে সম্পূর্ণ তিরোহিত!

যে বাঙালী বিপ্লবের নেতা ছিল, গঠন করিতে গিয়া সে পদে পদে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ বাঙালী সুদূর পশ্চিমের দিকে চাহিয়া যুগান্তর আনিয়াছিল। এই যুগে সে ভারতবাসী হইতে না পারিয়া অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব আদর্শ হারাইয়া অতীত সাধনার ভিত্তির উপর নবজীবন গড়িতে পারে নাই।

বাংলার পলিমাটির উপর যাহা কিছু উঠিয়াছে তাহা সবই ক্ষণভঙ্গুর, শিথিল, পরিবর্ত্তনশীল—তাই বাংলার সমাজধর্ম্মে উত্তর-ভারতের মত সে দৃঢ় বন্ধন নাই। বাংলার জাতি, সমাজ, পল্লী সকলেরই গ্রন্থি শিথিল; বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। বাংলার ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ও বাঁধা ঘাটের মত তাহাদের সকলেরই ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

উত্তর-ভারতের বৈশিষ্ট্য

উত্তর-ভারতের সমাজ স্থাণু, তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিকারহীন। উত্তরাপথ হইতে আর্য্য, শক, তুর্ক ও হূণ যুগের পর যুগ নদীপথ ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রবাহের মত গ্রামের উপর ঝঞ্ঝা ও অশনি বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে সনাতন সভ্যতার প্রতিক্রিয়ায় তাহারা হীনবীর্য্য, নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগে দেশীয় সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কতিপয় রাজধানীর ইতিহাস রাজন্যবর্গের জয়পরাজয়ে চঞ্চল ও বেদনাময়, কিন্তু পল্লীসমাজ একেবারে নির্ব্বিকার ও অনাসক্ত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সুদূর উত্তর-পশ্চিমের দুরতিক্রম গিরিপথগুলি আক্রমণকারীর হঠকারিতা ও দুর্নিবার বেগ রোধ করিয়াছে। অপরদিকে নদী-

সমুদয়ের উপকূল আক্রমণ ও আগমনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের প্রসারেরও অন্তরায় হইয়াছে। এই কারণে পঞ্চনদের উপকূল হইতে গঙ্গাযমুনার পথ, সকল যোদ্ধা ও সম্রাটকেই অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারই মধ্যবর্ত্তী দিল্লীনগর কত-না সাম্রাজ্য-গঠনের সূতিকা গৃহ, কত-না সাম্রাজ্য-ধ্বংসের শ্মশানভূমি। কিন্তু চারিদিকের পল্লীসমাজ ও সভ্যতা দিল্লীর বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল ইতিহাসের চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হয় নাই।

ভারতীয় সভ্যতার সজীবতা ও ধারাবাহিকতার তাই সুন্দর পরিচয় পাই উত্তরের গ্রাম্য সমাজে। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের লীলা চলিয়াছে, কিন্তু একদিকে উত্তর-ভারতের গ্রাম্য সভ্যতা যেমন ভারতের চিন্তা-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, অপরদিকে গ্রাম্যসমাজ বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে একটা কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। পাঠান, মোগল ও ইংরাজ এই প্রজাতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের জমিদারী ও তালুকদারী এই নীরব প্রজাতন্ত্রের মূলচ্ছেদ করিলেও ইহা নিশ্চিত যে, সমাজের ধর্ম্ম ও শক্তি পুরাতন গ্রাম্য সমাজের অটুট ভিত্তির উপর অটল, স্থির রহিয়াছে।

উদার, মুক্ত সমতল-ভূমিতে জাতির বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব থাকে না। বাংলা ও মাদ্রাজ প্রদেশের নমঃশূদ্র ও পঞ্চমের সমস্যা উত্তরাপথে নাই। উর্ব্বরা সমতল ভূমিতে বহুলোকে একত্র বাস করিলে জাতি-বৈরী প্রশ্রয় পায় না। তাই গ্রাম্য সমাজের সহিত জাতি-পঞ্চায়েতের সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে—উত্তর-ভারতের পল্লী-সভ্যতায়। অপরদিকে কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষতঃ নদীর জল সরবরাহে পরস্পরের সমবায় ও পঞ্চায়েত

কর্ত্তৃক উর্ব্বর অনুর্ব্বর ভূমির বাঁটোয়ারা গ্রামে গ্রামে যে ঐক্যমূলক সমাজতন্ত্র স্থাপন করিয়াছে, তাহার একমাত্র তুলনা হয় স্পেন ও উত্তর ইটালীর যৌথ-সমিতির সঙ্গে। কাবেরীর গ্রাম্য-সমাজ ভিন্ন এ সমবায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও লক্ষিত হয় না।

আদান

কি রাষ্ট্রীয়, কি বৈষয়িক দিক্ হইতে পল্লী-সমবায়ই পল্লী-স্বরাজ-গঠনের একমাত্র আশ্রয়। পল্লী-স্বরাজ-গঠনের এই উপাদান বাংলাদেশে বহুকাল হারাইয়াছে। তাই বাংলার পল্লীগ্রাম হতশ্রী, তাই বাংলার সভ্যতা কৃত্রিম, নব-নাগরিক। বাংলার মনোময়তা, ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা সবই তাই নিরর্থক হইয়া জাতির অন্তরে আজ অবসাদ আনিয়াছে।

বাংলার সভ্যতার সহিত ভারতের সভ্যতার তাই এত প্রভেদ। এ প্রভেদ বুঝিতে হইবে এবং এই প্রভেদ বুঝিয়া এখন গঠনের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে।

বাংলার যে মনোময়তা আজ গঠনের যুগে বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা আজ উত্তর-ভারতে অচল, অটল সমাজ-ধর্ম্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করুক। বাংলা' সবই নিতুই নব। কিসের উপর গড়িবে তাহা বাঙালী খুঁজিয়া পাইতেছে না। সমাজের শাসন বিলুপ্তপ্রায়। সমাজ-গ্রন্থি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আমদানী নূতন বন্ধনী অশিক্ষিতের সহিত শিক্ষিতের সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। তাই বাংলার সাহিত্যে ও চারুশিল্পে আভিজাত্য, সমাজে জাতি-বৈরী, রাষ্ট্র গঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

বাঙলা ও বাঙালী

উত্তর-ভারতের উদার ভূমিতে সমাজ-শাসনে শিথিলতা দেখি না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিরোধ দেখি না। সাহিত্য এখানে সার্ব্বজনীন, শিল্পে সকলের অধিকার। বাংলা দেশের মত উত্তরাপথে তাই সাহিত্যিক শ্রেণী দেখা দেয় নাই। ভারতীয় শিল্পকলারও আন্দোলন নাই। পল্লী-সভ্যতার পুনরুত্থানেরও চীৎকার উঠে নাই। গঙ্গার প্রবাহ বাংলাদেশে কত নগ-নগরী ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু কাশীর স্থানমাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। অটুট পাথরের উপর যেমন কাশী শত যুগের শত বন্যার মধ্যেও অচল অটল, তেমনি উত্তর ভারতে সমাজ-ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসন আজও শত বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে নির্ব্বিকার।

প্রদান

এই সমাজ-শক্তি বাঙালীকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তবেই বাঙালীর ভাবপ্রবণতা এই গঠনের যুগে জাতিসংগঠনের সহায় হয়। নচেৎ তাহা মস্তিষ্ক বিকারের নিদর্শনরূপে একটা উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য, একটা সমাজদ্রোহী সৌন্দর্য্যের আদর্শ, একটা অবাস্তব রাষ্ট্রীয় কল্পনাতেই পর্য্যবসিত থাকিবে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে বাঙালী ভাঙ্গিয়াছে বেশী, গড়িয়াছে কম, এমন কি বাঙালী ভাঙ্গিয়াছে, নূতন কিছু গড়িবার জন্য নহে, শুধু ভাঙ্গিবার মোহে। এ যুগের দায়িত্ব আর এক রকমের। বাঙালী এই দায়িত্বের গুরুভার বরণ করিতে পারিবে তখনই, যখন সে বাংলার সঙ্কীর্ণতার বাহিরে আসিয়া ভারতের লৌকিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইবে। বাঙালী ভারতবাসী হউক, তবেই বাংলার সার্থকতা—ভারতের রক্ষা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার মাটি, বাংলার জল

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী

আশ্চর্য্য আমাদের এই বাংলা দেশ, তাহার ভূমির উত্থান পতনে, তাহার নদ-নদীর গতি পরিবর্ত্তনে ও তাহার মানব ইতিহাসের বিপর্য্যয়ে। একদা গাঙ্গেয় ভূমিতে একটি নদী প্রবাহিত ছিল, যাহার নাম ছিল সরস্বতী। ঐ নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া প্রভাসে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইত। তখন বাংলা দেশ আদিম সমুদ্র অঙ্ক হইতে জাগিয়া উঠে নাই এবং এখনকার বঙ্গোপসাগর আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কতকাল এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর একই যুগে মানুষের উদ্ভব এবং হিমালয়ের অভ্যুত্থান। ধীরে ধীরে যখন হিমালয় মাথা তুলিতেছিল তখন আদ্যকালের নদ-নদী ও তাহাদিগের শাখাপ্রশাখাগুলির মধ্যে বিপুল বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল। যে-নদী পশ্চিমে বহিত, তাহা অন্য নদী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইল। কত নদী মরুপথে হারাইয়া গেল। কত নদী অন্যের সহিত মিশিয়া তাহাদের গতি ও নাম পরিবর্ত্তন করিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক সরস্বতী নদী পশ্চিমবাহী যমুনার খাতকে আপনার বিপুল স্রোতের দিকে উজান বহাইল পূর্ব্বদিকে। দ্বিখণ্ডিত সরস্বতীর উজান-প্রবাহ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। যাহা

যুক্ত ছিল প্রয়াগে তাহা মুক্ত হইল ত্রিবেণীতে। উপনিবেশের ধারা যুগ যুগ ধরিয়া হিমালয়ের উপত্যকা-ভূমি ধৌত করিয়া গাঙ্গেয় সমতল ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ সব চেয়ে আধুনিক সৃষ্টি। দক্ষিণের ভূমির অল্প নিম্নেই অরণ্য, ধান্যপংক্তি ও জলজ প্রাণীর কঙ্কাল এমন কি সরোবর, মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, সুন্দরবনের কোন এক বিরাট অবরোহের সাক্ষ্য দেয়। কেবল বাংলার পশ্চিম অংশ (যাহা পুরাতন গণ্ডোয়ানা ভূমির অংশ) পৃথিবীর আদিমখণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া পলিমাটীর তৈয়ারী বাংলার অধিকাংশের মত উত্থানপতন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চব্বিশ-পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া খুলনার উত্তরাংশ এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত সারি সারি অতি গভীর ও প্রায় অবিচ্ছিন্ন বিল ও জলাভূমির বিস্তারও বাংলার ভৌম অবরোহের সাক্ষী। বাংলার অপেক্ষাকৃত উচ্চ পশ্চিম খণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন ও সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ।

মহাভারতের উল্লিখিত সূহ্ম প্রদেশ ভাগীরথীর পশ্চিমাংশেই অবস্থিত ছিল। উহা পরে কর্ণসুবর্ণ আখ্যা পাইয়াছে। মধ্যযুগে কঙ্কগ্রামভুক্তি অথবা উত্তর রাঢ় ও বর্দ্ধমানভুক্তি অথবা দক্ষিণ রাঢ় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল অজয় বা দামোদর নদ। এই অঞ্চলই বাংলার সংস্কৃতির জন্মস্থান, কঙ্কগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ, বর্দ্ধমান, ভূরিশ্রেষ্ঠী, মহানদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া।

সংস্কৃতির আর এক প্রাচীন কেন্দ্রভূমি ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। করতোয়ার দ্বারা লালিত-পালিত এই উত্তর প্রদেশের ইতিহাস অত্যন্ত অসমান।

বাংলার আদিম জাতি

এই সংস্কৃতির রূপ দিয়াছিল আর্য্য সভ্যতা, কিন্তু তাহার দেহ ও প্রাণ ছিল বাংলার আদিম নিবাসী যাবতীয় ধীবর, শিল্পী, কৃষক ইত্যাদি জাতি সমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ। পশ্চিমবঙ্গের উপত্যকার নিম্নাংশই বাগদীদিগের আদিম নিবাস। দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলায় বাগ্‌দী রাজার প্রভুত্ব ইতিহাসে বিশ্রুত। সমুদ্রতটের নিকটস্থ জঙ্গল ও জলাভূমি পোদ ও নমঃশূদ্রের আদিম প্রতিবেশ। মধ্যস্থান মাহিষ্য ভূমি। ব'প্রদেশ সমুদ্র হইতে উঠিতে থাকিলে পোদ ও নমঃশূদ্রেরাই নূতন ভূমি অধিকার করিয়া সমুদ্রের দিকে কৃষির সীমানা বিস্তার করিয়াছিল। পোদেরা খুব সম্ভবতঃ আদি গঙ্গা ও যমুনার পথ ধরিয়া ব'প্রদেশের দক্ষিণ খণ্ডে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চব্বিশ-পরগণা ও খুলনাতে উহারাই প্রথম জনপদ স্থাপন করিয়াছিল। আরও আধুনিক কালে নমঃশূদ্রেরা ব'প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে কৃষি ও জনপদ বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের উপনিবেশের পথ ছিল ভৈরব ও পদ্মার প্রবাহ। উত্তর বঙ্গের আদিম ঔপনিবেশিক ছিল রাজবংশীরা। এইবার বাংলার প্রধান হিন্দু জাতি সমূহের ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিলাম।

জাতি	অবস্থান	শত বা বৃদ্ধি (১৯০১—৩১)
বাগ্‌দী	... পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭৫ ; বর্দ্ধমানে সর্ব্বাধিক ; বাকী মধ্যবঙ্গে।	২·৮
মাহিষ্য	... বাংলাময় বিক্ষিপ্ত ; মেদিনীপুর, হাবড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগণায় অধিক-সংখ্যক।	২১·৯

জাতি	অবস্থান	শতকরা বৃদ্ধি (১৯০১—৩১)
পোদ	... শতকরা ৮৪, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা ও যশোহরে।	৪৩·৭
নমঃশূদ্র	... অর্দ্ধেকের অধিক বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও যশোহরে ; ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায়ও সংখ্যায় অধিক।	১৩·৩
রাজবংশী	... শতকরা ৯০ দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে।	৪·৮

বাংলার উচ্চ জাতি সমুদায়, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, নানা জেলায় বিক্ষিপ্ত হইলেও নিম্নলিখিত জেলায় মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা পাঁচ বা ততোধিক :—বাঁকুড়া (১১%), হাওড়া (১০%), বর্দ্ধমান এবং চট্টগ্রাম (৯%) ; ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চব্বিশ-পরগণা (৬%) ; বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, যশোর, খুলনা, ত্রিপুরা নোয়াখালি, (৫%) ;

দেখা গেল পুরাতন কঙ্কগ্রাম ও দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত আধুনিক জেলাগুলিতে উচ্চ জাতির প্রাধান্য। বাঁকুডা ও মেদিনীপুর দণ্ডভুক্তির এলাকায়। এখানকার অধিবাসিগণ কখনও মুসলমানের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। মুসলমান অভিযানের ফলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে উচ্চ জাতি সমূদয় খুব সম্ভবতঃ শ্রীবিক্রমপুর, কর্ম্মান্ত প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানভ্রষ্ট হয়। উত্তর বঙ্গে উচ্চজাতি এখন সংখ্যায় খুব অল্প। গত এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলার যে-সকল অঞ্চলে উচ্চ জাতির ঐতিহাসিক প্রাধান্য ও কৃতিত্ব, ঠিক সেই অঞ্চলগুলিই নদীর গতিরোধ ও পরিবর্ত্তন হেতু ধ্বংসের পথে দ্রুত চলিয়াছে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মাধবপুর, সাভার, বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, কাপাসিয়া, কর্ম্মান্ত, পাটিকারা, বাকলা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে বাংলার সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে অস্পৃশ্য ধীবর ও চণ্ডাল কৃষকেরা কোন রকমে ঝড় ও বন্যার সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগের অনিশ্চিত জীবন যাপন করিত। ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চ জাতি তাহাদিগের সংসর্গে অবস্থান করিলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে মুসলমান আসিল সৈন্যবিভাগের অগ্রদল অথবা কৃষি বিস্তারের অগ্রদূত হিসাবে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে (১৩২৮—১৩৫৪) ইব্‌ন বাটুটা চট্টগ্রাম বন্দরকে একটা প্রকাণ্ড শহর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং আর একটি শহরের উল্লেখ করিয়াছিলেন হাবাঙ্ক নামে। ইহা সম্ভবতঃ মেঘনার শাখানদীর উপর হবিগঞ্জ। মেঘনা নদীর দুইপাশে অনেক গ্রাম, বাগান দেখিতে দেখিতে তিনি সোনারগাঁ পৌছিয়াছিলেন। মোগল যুগে সরকার মাহ্‌মুদাবাদ ১৪২৬—১৪৫৭ ও খালিফতাবাদ স্থাপিত হয়। মাহ্‌মুদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফরিদপুর, যশোহরের কিছু অংশ ও নোয়াখালি। যশোহর, খুলনা ও পশ্চিম বাখরগঞ্জ লইয়া খালিফতাবাদ। পরে খুলাসতউল-তারিখে আমরা জানিতে পাই (১৬৯৫) যে ঐ সময় খালিফতাবাদের জঙ্গলে বুনো হাতী দেখা যাইত। আমরা সুজার আমলে (১৬৫৮) মুরাদখানা অথবা জেরাদখানা নামে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবন রাজস্ববিভাগের অন্তর্গত হইবার প্রথম উল্লেখ পাই। কিন্তু পশ্চিমে সুন্দরবনের স্থানে স্থানে,—যেমন নোয়াখালিতে ও ২৪পরগণায়, প্রাচীন গুপ্ত মুদ্রা ও পাল যুগের পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া

গিয়াছে, খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ সুন্দরবনের স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, এক অবরোহে সমস্ত তলাইয়া গিয়াছে।

যশোহরে ষোড়শ শতাব্দীতে খাঁজেহান আলি সদল বলে জঙ্গল কাটিয়া যেমন কৃষিবিস্তার করিয়াছিল, সেরূপ পূর্ব্ববঙ্গেও মুসলমানেরা প্রথম জলাভূমি ও সমুদ্র হইতে জমি কাটিয়া লইয়াছে। তাহাদিগের মসজিদ, দীঘি, রাস্তা, কবর এখনও চারিদিকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে-সকল নিপীড়িত ও অধঃপতিত হিন্দু ছিল, তাহারা কতকটা ভয়ে, কতকটা আশায়, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

মোগলযুগের সোনার গাঁ, শ্রীপুর ও ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সুবার অন্তর্গত প্রদেশেই এখন মুসলমানের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। আকবরের সময় অনেক আফগান বিতাড়িত হইয়া ঢাকা জেলার সীমান্তে পলাইয়া আসে। তাহারা ধামরাইয়ের নিকটবর্ত্তীস্থানে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিয়াছিল। মোগল নবাব ও বাদশাহেরা দুর্দ্দান্ত সেনাপতি ও সৈনিককে বশে আনিবার জন্য তাহাদিগকে স্থানে স্থানে জমির অধিকার দিয়া ওমরাহ ও জায়গীরদারে পরিণত করিয়াছিলেন। উত্তরে সুদূর রংপুরের সীমানায় মোগল সৈনিকের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল কুচ ও অসমিয়াদিগের অত্যাচার দমনের জন্য।

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সেনানিবাসগুলি বগুড়ার উত্তরে ঘোড়াঘাটে আনীত হয়। গৌড় হইতে ঘোড়াঘাট এবং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা অঞ্চলটা মুসলমান শাসনাধীনে থাকিয়া অনেককাল হইতেই

মুসলমান-প্রধান হইয়াছিল। দক্ষিণে মগদিগের লুণ্ঠন নিবারণের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নোয়াখালিতে মুসলমান সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৬৬৬ সালে, তখন হইতেই সেখানে মোগল সৈনিকের বসতি। ব্লকম্যান সাহেব সুলতান নস্‌রত শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম একবার চট্টগ্রাম দখল করেন এবং ১৫২৩—৩৩ সালে চট্টগ্রামের অনেক অধিবাসীকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করান। হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের এই প্রকার বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকটা তখন বনজঙ্গলে পরিবৃত ছিল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে মুসলমান সেনানায়ক ও ওমরাহকে ভূম্যধিকার দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু ইহাদের বংশধরেরা সংখ্যায় খুব অল্পই। এই ভূম্যধিকারীরা আত্মরক্ষাকল্পে বহু হিন্দুকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়াছিল, অপরদিকে বহু হিন্দু প্রজাও মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য অশান্তি হইতে মুসলমান ভৌমিকের নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুলতান জালালউদ্দিনের মত ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অত্যাচারেও অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম বরণ করিয়াছিল। গেট সাহেবের মতে বাংলায় বিদেশী পাঠান মোগলের সংখ্যা মোট মুসলমান সংখ্যার ষষ্ঠাংশের অধিক নয়।

মুসলমানের সংখ্যা-প্রাবল্য

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ স্বাস্থ্যকর প্রদেশ। তাহা ছাড়া যে সকল নিম্নস্তরের হিন্দুরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগের প্রজনন-শক্তি অধিকাংশ হিন্দুশ্রেণীর তুলনায় অধিক। এই কারণে মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। একমাত্র মধ্যবঙ্গ,—যেখানে মুসলমানদিগের অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে ঘনবসতি,—সেইখানেই তাহারা গত ৫০ বৎসরে হিন্দুর তুলনায় হটিয়া গিয়াছে। যে সব জেলায় মুসলমানের প্রাধান্য, নিম্নে তাহা নির্দ্দেশ করা হইল। মুসলমানেরা অর্দ্ধেকের বেশী নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে।

মুসলমান-প্রধান জেলা

মুসলমান সংখ্যার পরিমাণ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা
বগুড়া	৮৩
রংপুর	৭১
রাজসাহী	৭৬
পাবনা	৭৭
মৈমনসিংহ	৭৬.৫
ত্রিপুরা	৭৬
বাখরগঞ্জ	৭২
নোয়াখালি	৭৮
চট্টগ্রাম	৯০

নদীয়া	৬২
যশোহর	৬২
ফরিদপুর	৬৪
ঢাকা	৬৭
দিনাজপুর	৫০·৫
মালদহ	৫৪
মুর্শিদাবাদ	৫৫

হিন্দু-প্রধান জেলা

হিন্দু সংখ্যার পরিমাণ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা
বাঁকুড়া	৯১
হুগলী	৮৩
মেদিনীপুর	৯০
হাবড়া	৭৮
বর্দ্ধমান	৭৯
দার্জ্জিলিঙ্	৭৪
বীরভূম	৬৭
২৪পরগণা	৬৪
জলপাইগুড়ি	৬৭·৫
কুচবিহার	৬৪
স্বাধীন ত্রিপুরা	৬৮
খুলনা	৫০·২

নদনদীর বিপর্য্যয়

অধিকাংশ হিন্দু-প্রধান জেলায় কৃষি ও স্বাস্থ্যের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। সামাজিক বৈষম্য হেতু মুসলমানের লোকবৃদ্ধির হার এমনিই হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। প্রাকৃতিক ও অর্থনীতিক শক্তি এখন প্রতিকূল হওয়াতে হিন্দুর বৃদ্ধির হার আরও অধিক পরিমাণে কমিয়াছে। ফলে সমগ্র বাংলায় পুরাতন সংস্কৃতির সমতার একটা ব্যতায় ঘটিয়াছে। ইহার মূল কারণ নদনদীর গতি-বিপর্য্যয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় এক তুমুল বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল,—যাহার ফলভোগী আমরা ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ। ১৭৫৭-১৭৬৫ সালে আমাদের পরাধীনতার সূচনা। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির অধোগতি এই সময় হইতে। দামোদর ভাগীরথীকে ত্যাগ করিল ১৭৭৭ সালে। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পে এবং ১৭৬৯-১৭৭০ ও ১৭৮৬-১৭৮৮ সালের ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে বাংলা দেশ জুড়িয়া জল সরববাহের এক বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এই সময় অন্ততঃ ছয়টী নূতন নদী বাংলায় দেখা দিল,—তিস্তা, যমুনা, জলাঙ্গী, মাথা-ভাঙ্গা, কীর্ত্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গিনী। নদীর গতিরোধ ও পরিবর্ত্তন ও নূতন জলপথের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ভীষণ মহামারী ও কৃষির দুর্গতি দেখা দিল। ১৭৮১ সালে রেনেল ও ১৭৯৭ সালে কোলব্রুক নদীপথে ভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, মধ্যবঙ্গের কোন নদীই তখন পূর্ণ বহতা ছিল না, গ্রীষ্মকালে নৌকাভিযান বাধা পাইত। সেই সময় হইতে বাংলায় ম্যালেরিয়া দেখা দিল। অনুমান হয় ম্যালেরিয়ার করাল মূর্ত্তি প্রথম দেখা দিয়াছিল

মুর্শিদাবাদে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এক ভীষণ মহামারী বরানগর রাজধানীকে বিনষ্ট করিল। খুব সম্ভবতঃ উহা ম্যালেরিয়া। বাংলাদেশে এখন ৮৬,০০০ গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ ৬০,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, কৃষির দুর্গতি, জঙ্গল-বৃদ্ধি ও ভিটাত্যাগ কি ভাবে সোনার বাংলা ছারখার করিতেছে তাহা এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে,—

		১৯০১-১৯৩১র মধ্যে কর্ষিত ভূমির হ্রাস, শতকরা	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ (জ্বরের মান)
বর্দ্ধমান	...	৪০	৫০·৪
নদীয়া	...	৭	৫৭·৫
মুর্শিদাবাদ	...	১৪	৪১·৭
যশোহর	...	৩১	৪৮·২
হুগলী	...	৪৫	৪৬·৬

বাংলার পাঁচভাগের দুই ভাগ হইতে ক্ষয়শক্তি বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র বাংলার ভবিষ্যৎকে আজ নিতান্ত অনিশ্চিত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোকের মধ্যে একটা জড়তা, ভয় ও অবিশ্বাস প্রতিকারের পথ রোধ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে (১৯৩০) গভর্ণমেণ্টের এক কমিটী আশঙ্কা লিপিবদ্ধ করিয়াছিল যে, মধ্যবঙ্গ জলাভূমি ও জঙ্গলে ফিরিয়া যাইবে, প্রতিকারের আর উপায় নাই। আর একদিকে এখনকার গভর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন যে, গঙ্গা আপনিই কিছুকাল পরে মধ্যবঙ্গের নদীগুলির উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সংস্কার সাধন করিবে। মানুষের

প্রতিকারের হাত নাই। গঙ্গাকে তপস্যা কর, ভজন কর; গঙ্গাই ভৈরব, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার পথে বহিয়া আবার দেশকে সুজলা, সুফলা করিবে।

নদী ও প্লাবন নিয়ন্ত্রণ

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ও সোভিয়েট রুশিয়ায় ভ্রমণ করিয়া নদী নিয়ন্ত্রণের বিপুল ব্যবস্থা সম্প্রতি দেখিয়া আসিলাম। অথচ এদেশের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ যাহা পৃথিবীর মধ্যে অনন্যসাধারণ ও নিদারুণ দ্রুত কৃষির অবনতি এবং যাহা সংখ্যা হিসাবে তিন কোটি লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হইয়াও নদনদীর স্বাভাবিক দুর্গতি ও পুনরুন্নতির আশা করিতেছে, অথবা অলস ও উদাসীন ভাবে ভাগ্য বিপর্য্যয়কে মানিয়া লইতেছে। একটা বিপুল ও উচ্চ বালুকাস্তূপ ভাগীরথীর মোহনায় জলপ্রবাহ রোধ করিতেছে। জলাঙ্গীর ও ভৈরবের মোহানাও অপকৃষ্ট হইয়াছে। আপনি যে গঙ্গা নদী এই সব প্রবাহে আবার বহতা হইবে তাহা দুরাশা। তাহা ছাড়া গড়াই-মধুমতীর আবির্ভাব মধ্যবাংলার নদীগুলির স্বাভাবিক পুনরুদ্ধারের আশা নির্ম্মূল করিয়াছে। মাথাভাঙ্গার যে কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ খুব সম্ভবতঃ হিমালয় ও আসাম উপত্যকায় বন্যাপরম্পরা হেতু যমুনার প্রবাহাধিক্য। যদি আরও কিছু বৎসর আমরা নিরুদ্যমে কালযাপন করি তাহা হইলে বাংলার তিনভাগের দুইভাগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকায় মিসি-সিপি, অহাইও ও টেনিসি ও রুশিয়ায় ভল্‌গা নদীতে যে স্রোতো-নিয়ন্ত্রণ, খাল-খনন, বন্যা-নিবারণ, রিজারভয়ের নির্ম্মাণ প্রভৃতি দেখা গিয়াছে,

ঐ রকম বিপুল পরিকল্পনা আমাদের দেশেও কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে বাংলাব ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতার সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া চটুল উপকূলে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

জলপ্রবাহের পরিমাণ ও বেগ ও সমতল ভূমির তলসাম্য প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এবং প্রবাহ-গবেষণা প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার পর যে সকল পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেইগুলির বিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নহে। মোটামুটি উহাদিগের নির্দ্দেশ এখানে করিতেছি।

বড়াল মোহনার কিছু নীচে অথবা গোয়ালন্দের কিছু উপরে বিপুল বাঁধ বাঁধিয়া পদ্মার জল ভৈরব, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; দামোদরের সহিত রূপনারায়ণ অথবা ভাগীরথীর যোগ স্থাপন করিয়া, কিংবা দামোদরে বাঁধ বাঁধিয়া বাঁকা, বেহুলা, কাণা দামোদর প্রভৃতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বেগবতী নদী যাহাতে বর্ষার সময় স্ফীতায়তনা হইয়া বন্যা না আনে তাহার জন্য নানা দেশে বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা প্রকাণ্ড জলাশয় সৃষ্টি ও তাহা হইতে জলসেচ-প্রথা প্রচলিত আছে।

উচ্চ ভূমি অবলম্বনে নহর কাটিয়া গঙ্গার জল এইরূপে মধ্যবঙ্গে কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষী, কাদলা, বেলনা, ইচ্ছামতী প্রভৃতি নদীতে আনা যাইতে পারে। নদী যেখানে বাঁকা পথ ধরিয়াছে সেখানে সরল রেখায় খাল কাটিয়া যোগ স্থাপন করা, নদীর মোহনায় বালির অবরোধ দূর করা এবং স্থানে স্থানে পঙ্ক উদ্ধার করাও আবশ্যক।

ইটালীতে ও প্যালেষ্টাইনে যে ভাবে নদীতে ও জলপথে স্লুইস

গেট রাখিয়া দেশময় নিয়ন্ত্রিত জলধারা আনা হয়, ঐ পদ্ধতি পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে অবলম্বন না করিলে কৃষি ও স্বাস্থ্য রক্ষা অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে দামোদর, ভাগীরথী, ভৈরব, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার উচ্চ বাঁধগুলি যতদূর ও যেখানে সম্ভব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে দেশময় ঋতু পর্য্যায়ের অনুযায়ী চাষের জন্য নিয়মানুবর্ত্তী প্লাবন ও জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। কৃষকগণকেও পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে আমন ও বোরো ধান্য বুনিতে হইবে এবং গ্রামের ভিটা ও কুটীরপংক্তি প্লাবন- -রেখার উপরে উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করিতে হইবে।

হল্যাণ্ড ও মিশরের বহু স্থানে যেমন বাতাস বা তেলের ইঞ্জিনের দ্বারা চালিত পম্পের সাহায্যে প্লাবিত ভূমির সংস্কার সাধিত হয় সেরূপ প্রথা এদেশেও অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তন করা উচিত। হল্যাণ্ড, দক্ষিণ জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশে বাতাসের পরিচালনায় অনেক স্থলে কৃষিকার্য্য হয়। পশ্চিম বঙ্গে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় যেখানে বহু বর্ষব্যাপী অরণ্যচ্ছেদ ও কৃষ্ট ভূমির ক্ষয় ও অপকর্ষ হেতু অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানে বায়ু-চালিত পম্পের সাহায্যে জলকূপ হইতে সেচ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

বিহার ও বোম্বাইয়ের গভর্ণমেণ্ট বায়ু-চালিত পম্পের চলন পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমাদের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। পশ্চিম বঙ্গে শুধু দামোদর, কাঁসাই ও বক্রেশ্বর নহর স্কিমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলিবে না। অবস্থা অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিয়মানুগত প্লাবন, নলকূপ এবং নহরের সেচও অবলম্বন করিতে হইবে।

পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অধোগতি ও পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মার বিপুল ভাঙ্গন জলপ্রবাহের বিপর্য্যয়ের তুইটী দিক। পশ্চিমের নদীগুলি ও জল সরবরাহের অবনতির সঙ্গে পদ্মার বন্যা ও নোয়াখালির ধ্বংস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অপর দিকে পদ্মার প্রবাহ মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিলে পদ্মার বন্যা ও ধ্বংসের ভয় কম হইবে পূর্ব্ব অঞ্চলে। মেঘনার মুখ এখন চট্টলপ্রদেশের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার বেগ রোধ করিতে হইলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের জলপথগুলির পুনরুদ্ধার ও পদ্মার বিপুল জলরাশিকে হুগলী ও হরিণঘাটার মুখের দিকে অনেক পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইবে।

নদী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক সাম্যচ্যুতি

বাংলার জল ও মাটী পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর সভ্যতাকে গড়িয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে। বাংলার জল ও মাটীর অবস্থা সুদূর পর্ব্বতের শ্যামল আচ্ছাদন অথবা সানুদেশের ঝিল, বিল ও হ্রদের উপর নির্ভর করে। ছোটনাগপুর উপত্যকায় অরণ্য বিনাশের ফলে দামোদরের গতি পরিবর্ত্তন ও অজয়, ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকেশ্বরের অধোগতি।

সেইরূপ শ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের ঝিলের সঙ্কোচের ফলেও, নদীর প্রবাহ-বেগের হ্রাস ও গতির পরিবর্ত্তনও সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাপথের অবনতি, যমুনার খাতে তিস্তার অনুগমন, তিস্তার স্ফীতি ও আত্রেয়ী, করতোয়া ও তাহাদিগের শাখা-প্রশাখার অবনতি, সবই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত এবং তাহার মূলে আছে কত

ভূমিকম্প, কত বন্যা, কত অরণ্যবিনাশ ও জলভূমি আক্রমণের ইতিহাস। নদীর উৎপত্তি-ভূমিতে অরণ্যের আচ্ছাদন বৃষ্টির বেগ ধারণ করিয়া যেমন বন্যা নিবারণ করে ও নদীর সমতা রক্ষা করে, তেমনি ঝিল, বিল অথবা জলভূমিগুলি প্লাবনের পর অতিরিক্ত জল ধারণ করিয়া নদীর পুষ্টি সাধন করে। বহু যুগ ধরিয়া উত্তর বঙ্গে হিমালয়ের সানুদেশে ও ছোটনাগপুরে অরণ্য বিনাশ কার্য্য বিনা বাধায় চলিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নহে। মানুষ যত সংখ্যায় বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে অরণ্যচ্ছেদের সঙ্গে বহু বিল বা জলভূমির সংস্কার চলিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, নদীকে সৃষ্টি করে পর্ব্বত ও উপত্যকা, তাহাকে পালন করে গাছপালা, ঝিল ও জলভূমি ও তাহাকে ধ্বংস করে মানুষের তৈয়ারী রেলপথ, সেতু ও বাঁধ।

ছোটনাগপুর, আসাম ও উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে পর্ব্বতের সানুদেশে অরণ্যচ্ছেদ ও জলভূমির সংস্কার বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার প্রতিরোধ চাই। অরণ্যরোপণ ও ঝিল রক্ষা না করিতে পারিলে নদীর বন্যা ও প্রবাহ পরিবর্ত্তন নিবারণ অসম্ভব। তিস্তা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া সেখানে কৃত্রিম জলপ্রপাতের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন করা যাইতে পারে। একদিকে ইহাতে যেমন তিস্তার বন্যা নিবারিত হইবে, অপরদিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চা বাগানের, এবং কাঠ, কাগজ ও নানাবিধ আরণ্য পদার্থের শিল্প-ব্যবসায়ের বিপুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে। তিস্তা হইতে একটি নহর কাটিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে টানিয়া তদ্দ্বারা আত্রেয়ী, করতোয়া ও পুনর্ভবার পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে এবং উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে নিয়ন্ত্রিত জল-প্লাবনও আনা সম্ভবপর।

সুজলাম্ সুফলাম্

মাটীর সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদানের দ্বারা উর্ব্বরতা রক্ষা না করিলে মানুষের স্থায়ী বসবাস ও সংস্কৃতির উন্মেষ সাধন অসম্ভব। তেমনই মানুষের সঙ্গে জলস্থল ও গাছপালারও একটা বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপন মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। আবার বিভিন্ন নদ-নদী তাহাদিগের শাখা-প্রশাখা ও খাল, বিল, জলাশয় মিলিয়া জল সরবরাহেরও একটা সাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। উহার বিচ্যুতি ঘটিলেও মানুষের সভ্যতা মরুভূমির করালগ্রাসে অথবা বনজঙ্গলের অনিবার্য্য আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। মরুভূমির দ্বারা সভ্যতার বিলোপ সাধনের সাক্ষ্য দেয় গাঙ্গেয় ভূমির অন্তর্গত ব্রজভূমির অধোগতি। অন্যদিকে জঙ্গল ও জলভূমির আক্রমণে সভ্যতার বিলয়ের উদাহরণ,—কপিলাবস্তু, বিদেহ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংস। প্রত্যেকক্ষেত্রেই মানুষের পর জঙ্গল, জলা ও মশকের প্রভুত্ব। পরবর্ত্তী যুগে কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, ও গৌড়ের ধ্বংসও গাছপালা, জল ও মানুষের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলেই ঘটিয়াছে। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে যে ক্ষয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আজ সমগ্র দেশময় বিস্তৃত হইতেছে তাহার প্রতিকার না হইলে এই অঞ্চলও মানুষের সঙ্গে জলও গাছপালার প্রাকৃতিক সাম্যচ্যুতির একটী নিদারুণ দৃষ্টান্তস্থল হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ প্রবাহেব ক্ষেত্র ক্ষুদ্র বঙ্গদেশও নহে। উত্তর হিমালয়ের অরণ্যচ্ছেদ, মিথিলা ও সুরমা ভূমিতে জলভূমির সঙ্কোচ, যমুনার উপকূলে ক্ষয় ও ভাঙ্গন, গঙ্গা, যমুনা ও পদ্মা খাতের দ্বারা নদীপ্রবাহের বিক্ষেপ, রেলসেতুর দ্বারা জল-

স্রোতের প্রতিবন্ধ, সবই জল সরবরাহের বিপর্য্যয় ঘটায়, এবং গাছপালা ও মানুষের জীবনে অসামঞ্জস্য আনে। প্রতিবেশ বিজ্ঞান (Ecology) মানুষের জীবনের সঙ্গে অচেতন প্রাকৃত জগতের বহু সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য গ্রন্থি আবিষ্কার করিতেছে। এই বিজ্ঞানের বলে পরিণামদর্শী হইয়া বাঙ্গালী আপনার প্রতিবেশের সংস্কার ভার না লইলে পলিমাটীর তৈয়ারী এই ভঙ্গুর ভূখণ্ডের মতই শীঘ্রই সে কোন অতলে ডুবিয়া যাইবে।

বাংলার নদী ও সংস্কৃতি

বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার সহিত মাটী, গাছপালা ও নদনদীর বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা কেবল বাঁচিবার জন্য নয় উহা তাহার সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতিরও একমাত্র উপায়। বাংলার নদী দিয়াছে কৃষিক্ষেত্রে অপরিসীম শস্যদায়িনী শক্তি। সে শক্তি প্রতি বর্ষার নূতন প্লাবনে নূতন করিয়া পৃথিবীর বিপুলতম জনতার পালনে ব্রতী হয়। বাংলার নদী দেশকে বাণিজ্যের সম্পদ দিয়াছে, মানুষকে দিয়াছে সাহস ও গতিশীলতা। বাংলার সমাজ-বিন্যাসে ধীবর, কৃষক, শিল্পী ও বণিকের মধ্যে তেমন ব্যবধান নাই, যেমনটি আছে উত্তর ভারতের গ্রাম্য সমাজে। বাংলার জলস্থলের নিত্য রূপ-পরিবর্ত্তন ও অধিবাসিগণের নদীপথে নিরন্তর প্রসারণকে আশ্রয় করিয়া বাংলায় চিরকাল জাগিয়াছে গোষ্ঠীভাব অপেক্ষা ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা অপেক্ষা নিত্যনূতন আচার-আচরণের প্রবর্ত্তন।

যুগের পর যুগ ধরিয়া কত নূতন পরাক্রমশালী জাতি গঙ্গা ও তাহার শাখা-প্রশাখা ধরিয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা রাজ্য স্থাপন

করিয়া বহতা নদীর কূলে কূলে উচ্চভূমিতে গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং দেশের আদিম-নিবাসী ধীবর, মাঝি ও কৃষক জাতিরা বিতাড়িত ও বিসারিত হইয়া ক্রমশঃ দূরে দক্ষিণ ও পূর্ব্বের জঙ্গল ও জলভূমির কিনারায় বাঘ, কুমীর, লোনা জল ও প্লাবনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়াছে। এই বিস্তারের ফলে ইহারাই এখন অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে অধিকতর সংখ্যায় তাহাদিগের বসবাস নির্ম্মাণ করিয়া বাংলার কৃষি-সমৃদ্ধি ও লোকবল বৃদ্ধি করিতেছে।

বাংলার কৃষকজাতিই বাংলার মেরুদণ্ড। তাহাদিগের দেহবল, সাহস ও মানবিকতা বহুযুগের বহু প্রকার জাতি সংমিশ্রণের ফল। নদীর স্রোত মানুষের জীবন-গতিকে দ্রুত করে, সামাজিক সম্বন্ধ শিথিল করে এবং রক্ত ও কৃষ্টির মিলন ও মিশ্রণের সহায় হয়।

বহু যুগ ধরিয়া উত্তরাপথ হইতে যেমন আর্য্য, মেডিটারেনীয়ান, আলপাইন ও মুণ্ডা জাতিরা গঙ্গার শাখা-প্রশাখা অবলম্বন করিয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তেমনই ব্রহ্মপুত্রের ধারা অবলম্বন করিয়া মোঙ্গল রক্ত-প্রবাহ ও কৃষ্টির ধারা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের অভ্যন্তরেও আজ অনুপ্রবিষ্ট।

শুধু নদীর প্রবাহ নহে, নদীর ভাঙ্গন ও গতি-পরিবর্ত্তনও বাংলার জাতিসমূহের স্থান-পরিবর্ত্তন ও আচার-অনুষ্ঠানের সম্মিলনের কারণ হইয়াছে। একদিকে বাংলার বড় ও ছোট নদী, বহু খাল, বিল ও দিগন্ত-বিস্তৃত প্লাবন, বাংলার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে বহুকাল অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। মুঘল সেনানায়কগণ বার বার পরাস্ত হইয়াছিলেন বারভূঁইয়াদিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের নিকট। বাংলার জলপথগুলি ও

তাহাদিগের অনুপূর্ব্ব বিপুল প্লাবন কখনই প্রকাণ্ড সৈন্যব্যূহ রচনা করিতে দেয় নাই। অনেক সময় বাঙ্গালী যোদ্ধা তাই পরাজয়কে জয়লাভে পরিণত করিয়াছে। জরাসন্ধের যুগ হইতে শের শাহ, প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দরাম, সীতারাম, এমন কি আধুনিক বিপ্লববাদীর যুগ পর্য্যন্ত বাংলার বন ও জলভূমি ও তাহার জলপথের জটিল জাল বিস্তার বাঙ্গালীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে অতিযত্নে পোষণ করিয়াছে। তাই নদ নদী দিয়াছে বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে এক আশ্চর্য্য স্বতন্ত্ররূপ, যাহা কখনও উত্তরভারতের সংস্কৃতির পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বাংলা দেশ এই কারণেই অতি সহজেই বিদ্রোহ-মূলক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে আশ্রয় দিয়াছিল। এমন কি সেকালে নহে, সপ্তদশ শতাব্দীতে, বর্দ্ধমানের এক রামানন্দ ঘোষ পূর্ব্বভারতে এক বিশাল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বাংলার নদী দিয়াছে বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। তেমনিই জাতির সম্প্রসারণ ও সংমিশ্রণের কারণ হইয়া তাহার সংস্কৃতিকে একটা সার্ব্বজনীনতা ও নমনীয়তা প্রদান করিয়াছে। বাংলার গান ও চারু শিল্পকলার লৌকিক অনুপ্রেরণা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনের জাতি-বিদ্রোহ, তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির অসাম্প্রদায়িকভাব ও আদর্শ, বহুবিধ লৌকিক উপাসক সম্প্রদায়ে মানুষ দেবতার ভজন-পূজন, সহজিয়া সাধনায় মানবীয় প্রেমের সহজ রূপান্তর, দরবেশী ও ঐ প্রকার নানা সম্প্রদায়ে হিন্দু মুসলমান আচার ও ভাবের সম্মিলন,—এ সবই বাংলার জনসমাজের অসাম্প্রদায়িকতা ও জনচৈতন্যের সরল মানবিকতার সাক্ষ্য দেয়।

বাঙ্গালীর লৌকিক সংস্কৃতি অতীত যুগে কত বিদ্রোহ-ভাব-ধারা ও

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের ন্যায় কত নব নব সংস্কারকে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে এবং আজও কত নিত্য নূতন ভাবে এক উদার প্রগতিশীল সার্ব্বজনীনতার অনুশীলন করিতেছে। ইহা বাংলার বিচিত্র কলতানে মুখর উদার নদী-প্রবাহের, বাংলার মেঘমুক্ত সুনীল আকাশের ও দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের নিবিড় শ্যামলতার স্বাভাবিক দান। তাই যখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলপ্রবাহ ও সরবরাহের একটা অখণ্ড প্রাকৃতিক সাম্যস্থাপন বাঙ্গালীর বিলোপ নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা বার বার ঘোষণা করি, তেমনি হৃদয়ে জাগে একটা অদম্য আশা যে, গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শুধু হিন্দু বা মুসলমানের, উচ্চ ও অনুচ্চজাতির নহে, তাহারা সকলেরই এবং তাহার সকলকেই দিবে আবার পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য, সাহস ও সম্পদ।

দুই চার বৎসরের সাম্প্রদায়িক কলহ বাঙ্গালীর বহুযুগার্জ্জিত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও উদারতাকে লাঞ্ছিত করিতে পারিবে না। ব'প্রদেশ মাত্রেই ভূগোল নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করে একটী নদী। বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা লইয়া, বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভরণ পোষণ করিতে করিতে অখণ্ড সাম্য-পরিস্থিতি চাহে। ঐ সাম্য সংস্থাপনের সঙ্গে সকল প্রদেশের ও সকল জাতির কল্যাণ সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালীর ইতিহাসও এক আর্য্যজাতির বা এক হিন্দুর খণ্ড ইতিহাস নহে। তাহা অপূর্ব্ব জাতি-সংমিশ্রণ ও সংস্কৃতির মিলনের ইতিহাস। অর্ব্বাচীন রাজনীতির সাধ্য কি বাংলার রূপ ও প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করে, হউক না কূট তাহার অভিসন্ধি, ক্ষুদ্র তাহার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং চটুল তাহার সম্ভাষণ !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষয়িষ্ণু বাঙলা

বাঙলার অবনতির কারণ অনুধাবন

অনেক কারণে বাঙালী জাতির ও সমাজের অচিরে ঘোর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। একযুগ পূর্ব্বে সুপণ্ডিত কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি' সম্বন্ধে আলোচনার সূচনা করিয়া দেশময় আন্দোলন আনিয়াছিলেন। 'অমৃতবাজার', 'সঞ্জীবনী', 'উপাসনা', 'গৃহস্থ' প্রভৃতি পত্রিকা বহুবৎসর এই আন্দোলনকে সজীব রাখিয়াছিল। বাংলা দেশের নানা প্রকার সমাজ-সংস্কার ও অনুন্নত জাতিগণের মধ্যে শিক্ষার আন্দোলন তখন হইতে সুরু হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে নানা উদ্যোগ-অনুষ্ঠান তখন হইতেই বাংলায় দেখা গিয়াছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াগুলি মানুষের সশঙ্ক সতর্ক বাণী শুনে নাই। এই যুগে বাংলাদেশ জুড়িয়া ব্যাধি, দৈন্য ও অবনতির জয়ঘোষণা অতি নির্ম্মমভাবে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করিতেছে। বাঙালী জাতির অধঃপতনের মূলে ম্যালেরিয়া অথবা জলপ্লাবন, বাংলাদেশের শিল্প-ব্যবসায়ে অ-বাঙালীর প্রতিষ্ঠা বা বাঙালীর শ্রমকাতরতা ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার, বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানের প্রভাব অথবা বিপ্লববাদের আবির্ভাব,

—এইরূপ একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে ঐ সমস্যার প্রতি সুবিচার করা হয় না। কোন জাতির দুর্দ্দশার কারণ এত সহজে নির্ণয় করা যায় না। কোন একটি মাত্র কারণ এরূপ ঘোর অবনতিরও সূচনা করে না। ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে বাংলার অধঃপতনের কারণ অনুধাবন করিতে হইবে।

কীর্ত্তিনাশা গঙ্গা নদী ছয় শতাব্দী ধরিয়া পূর্ব্বগামিনী

বাঙলার সভ্যতা নদী-মাতৃক। রোমীয়গণ প্রাচীন বাংলাকে **গঙ্গারাজ্য** বলিয়া বর্ণনা করিতেন। গঙ্গা নদী বাঙলাদেশকে গড়িয়াছে ও ভাঙ্গিয়াছে, আবার গড়িয়াছে ও নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়াছে। নদীর 'ব'-প্রদেশে প্রাকৃতিক বিশেষত্বেই এই উত্থান-পতন। জল ও স্থলভূমির বিপ্লব বাংলার সভ্যতার মানচিত্রকে বহুবার নূতন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছে। যুগে যুগে এই বিপ্লব গঙ্গামাতার প্রসাদ ও অভিশাপের সাক্ষ্য দেয়।

একদা গঙ্গানদীর মূল প্রবাহ মেদিনীপুর অঞ্চলকে শ্রী ও সম্পদ দান করিত। সে এক হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে কথা। তখন তাম্রলিপ্তি প্রাচ্য ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত, যখন ফা-হিয়েন ঐ বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্তির গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সপ্তগ্রাম বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া রোম ও পশ্চিম এশিয়ায়

খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে সরস্বতী নদীর গতিহ্রাস লক্ষিত হয় এবং তাহার ফলেই সপ্তগ্রামের কীর্ত্তিনাশ। যে বন্দর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১৭ বর্গ মাইল ছিল, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহাকে ভ্যান ডেন ব্রুক (Van Den Broucke) একটি নগণ্য গ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই ভাগীরথী নদীরও দুরবস্থার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাভার্নিয়া (Tavernier) লিখিয়াছিলেন যে, বার্ণিয়া (Bernier) গঙ্গাপথে আসিতে আসিতে রাজমহলের নিকট অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর মুখে পদ্মার চর তাঁহার নৌকার গতি রোধ করিয়াছিল। তিনি কাশিমবাজারে যাইতেছিলেন। কাশিমবাজার তখন একটা প্রধান শহর; অনেক ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও আরমেনিয়ান বণিক তখন সেখানে ব্যবসায় করিত।

বাংলার বন্দরগুলির ইতিহাসের সবিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুগে যুগে তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, যশোহর, চট্টগ্রাম, বাকলী প্রভৃতি বন্দর বাংলার সামুদ্রিক সম্পদ ও প্রভাবের সাক্ষী। 'ব'-প্রদেশে নদীধারা কত জনপদকে জনাকীর্ণ ও সম্পদশালী করিয়াছে, আবার জনহীন, শ্রীহীন, বিপর্য্যস্ত করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যখন গঙ্গানদী ভাগীরথীর প্রবাহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বগামিনী হইল, তখন হইতে পর পর জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও গড়াই নদী পূর্ব্বশতাব্দীর রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর মত ধন-সম্পদের পরিবেষিকা হইল। কিন্তু শাখাগুলিকে একে একে নিদারুণভাবে ত্যাগ করিতে করিতে, কত

শত পুরজনপদ অভিশপ্ত করিতে করিতে, গঙ্গার অনিবার্য্য গতি ক্রমাগত পূর্ব্বসমুদ্র-মোহনার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

বাঙালীর কল্পনায় ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা, ক্ষিপ্রগতি। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর সিন্দূররেখা প্রভাতসূর্য্যের নির্ম্মল কিরণ। যখন তিনি স্নানান্তে সিক্তবসনে তালীবনশোভিত সমুদ্র-উপকূলে উঠিয়া দাঁড়ান, তখন নবারুণ তাঁহার কপোলদেশ রঞ্জিত করে।

মেদিনীপুর হইতে নোয়াখালি, সাগর হইতে সন্দ্বীপের অনেক ব্যবধান, তবুও যে-নদীগুলি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রাম অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিল, তাহারাই আবার নূতন করিয়া চট্টগ্রাম উপকূলে বাঙলার বালার্ককিরণ-স্নাতা ভাগ্য-লক্ষ্মীর চরণ বন্দনা করিতেছে। মেঘনার উপকূলে বাঙলার লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন বসাইতেছেন, আর পশ্চিমে অলক্ষ্মী ও মৃত্যুর করাল ছায়া দিগন্ত-প্রসারিত হইতেছেন।

গঙ্গার পূর্ব্বযাত্রার কারণ

গঙ্গার এই পূর্ব্ব-অভিযানের কারণই বা কি? নদী-মাতৃক দেশে লোকসংখ্যা অতি সত্বর ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সমগ্র সমতল ভূমিতে বসতি ও কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কুঠার ও লাঙ্গল লইয়া পর্ব্বতের সানুদেশ আক্রমণ করে। অরণ্য ভূমিসাৎ হইতে থাকে, গোচারণ ও কৃষি গিরিলঙ্ঘন করে। নদীর শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি-স্থলে এই যুগপরম্পরা ধরিয়া মানুষের অরণ্যচ্ছেদন ও পশুর দূর্ব্বাদলনের পাপের ফল মানুষের পরবর্ত্তী বংশকে ভোগ করিতে হয়। গিরির সানুদেশে মাটির অবিরাম ক্ষয় হইতে থাকে।

বনভূমি বৃষ্টি-ধারা রক্ষা করিবার আর সুযোগ পায় না, সুতরাং মরশুম বৃষ্টিপাতের পরেই আসে নদীতে বিপুল বন্যা। পর্ব্বতের সানুদেশের সমস্ত মাটি ধুইয়া পুছিয়া সেই বন্যা ক্রমাগত ঐ পলি ঢালে নদীর গর্ভে। তাহার ফলে হয় নদীগুলির গতিহ্রাস, অবরোধ বা গতিপরিবর্ত্তন। নদী-তটের দুই দিকের দেশ নদীর জল ও পলি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইতে থাকে। নদীগুলিও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মজিয়া গিয়া ক্রমশঃ বহুবিধ আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নদী যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন দেশের জল-সরবরাহের বিপর্য্যয় ঘটে। ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, মানুষের স্বাস্থ্যহানি, লোকসংখ্যার হ্রাস এবং আরণ্যশক্তির পুরাতন অধিকার বিস্তার।

বরেন্দ্রভূমি ও রাঢ় বহুযুগ পূর্ব্বে জনাকীর্ণ পুরজনপদে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার ফলে বাঙলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের গিরিপ্রদেশে অরণ্য-বিনাশের অপচার বহুপূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছিল।

পর্ব্বতগাত্রে ও পর্ব্বতের সানুদেশে অরণ্যবিনাশের ফল বহুদেশ ভোগ করিয়াছে।

চীনদেশে হোয়াংহো নদী এই কারণে বৎসর বৎসর এত ভীষণ বন্যা সৃষ্টি করে যে, চীনারা ঐ নদীর নাম দিয়াছে 'চীনের অভিশাপ'। বহুশতাব্দী ধরিয়া বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের অরণ্যচ্ছেদনের ফলে, দামোদর ও তিস্তা নদী তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে। সে সময়কার কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ঘটনা অপেক্ষাও অধিকতর স্মরণীয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যখন দামোদর নদ কাটোয়ার সঙ্গমস্থল ত্যাগ করিয়া

পশ্চিমগামী হইল, তখন হইতে বাংলাদেশের একটি পুরাতন সভ্যতা ও শ্রীসম্পদের কেন্দ্রস্থলের অধঃপতনের সুনিশ্চিত সূত্রপাত হইল। ১৭৬৪ হইতে ১৭৭৫ সালের মধ্যে পদ্মানদীও ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া স্বাধীন প্রবাহ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রবাহ ধরিল এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা নদীও ফুলচুরি ঘাটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইল। এই নদী-পরিবর্ত্তনের ফলাফল সমগ্র বাংলাদেশ এখন ভোগ করিতেছে।

একদিকে দামোদরের বিপথগমন ও মধ্যবাঙলার শাখানদীগুলির গতিরোধ যেমন সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অস্বাস্থ্য, লোকহানি ও কৃষির অবনতির কারণ হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি নূতন যমুনানদীর অবাধ বিপুল প্রবাহ দিকে দিকে নব নব জনাকীর্ণ জনপদের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতি নদীর গতি পরিবর্ত্তন করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রকৃতি মানুষকে অন্যভাবেও শাস্তি দিতেছেন। তিস্তা, আত্রেয়ী ও যমুনা, অজয় ও ময়ূরাক্ষী, সুবর্ণরেখা ও দামোদরের ভীষণ বন্যা—বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন বংশের অপরিণামদর্শিতাকে এখনও নিদারুণভাবে বিদ্রূপ করিতেছে।

নদীর গতিবেগের হ্রাস ও পরিবর্ত্তন, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে কৃষি ও লোকসংখ্যার হ্রাস

গত চার শতাব্দী ধরিয়া অবণ্যচ্ছেদন, নদীর গতিবেগের হ্রাস ও সমতল ভূমির শনৈঃ শনৈঃ অধিরোহণ চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিম ও মধ্য বাঙলার সমতল ভূমি এখন নদীগুলির জলরেখা অপেক্ষা উচ্চে।

উত্তর বঙ্গেও নদী-প্রকৃতির এই অনিবার্য্য বিপর্য্যয় দ্রুতবেগে সংঘটিত হইতেছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সকল অঞ্চলেই নদ-নদীর বিনাশের নানা ক্রম বা পর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়। কোথাও নদী আগাছায় ভরা, মনে হয় না সেখানে জল আছে; কোথাও স্থানে স্থানে ঈষৎ স্রোত বা আবর্ত্ত পুরাতন প্রবাহের নির্দ্দেশ করে। কোথায়ও বা নদীর শুষ্ক গর্ভে কয়েক পুরুষ ধরিয়া চাষ-বাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শুধু গ্রামের নাম হয়ত প্রাচীন নদী-পথের সন্ধান দেয়। নদী-পরিত্যক্ত প্রত্যেক অঞ্চলই শীঘ্রই জঙ্গলে ভরিয়া উঠে, এবং যেখানে জঙ্গল গ্রামের ভিটাকে আক্রমণ করে, সেখানেই ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়া গ্রাম উজাড় করিয়া দেয়।

'ব'-প্রদেশের অনিবার্য্য বিপর্য্যয়ের ফলে মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ নদীগুলি ক্ষীণতোয়া,—সমগ্র দেশের জল-সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত, এবং অসংখ্য ম্যালেরিয়া-দুষ্ট খাল, বিল, জলা, জঙ্গলের উদ্ভব। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের বাঙালী বিরূপা প্রকৃতি ও শ্রীহীনা কঙ্কালিনী নদীর প্রেতমূর্ত্তির সহিত সংগ্রামে পরাস্ত। এ সংগ্রামে ভবিষ্যতে তাহার জয়ের আশাও কম।

জলপ্লাবনের দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণ ও কৃষির পুনরুদ্ধার

বিহারপ্রদেশের মত গঙ্গা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অপ্রাকৃতিক সরোবর তৈরী করিয়া, জেলায় জেলায় খাল কাটিয়া

বর্ষার নূতন জল মরা গাঙে বৎসর বৎসর না বহাইলে এই ক্ষয়িষ্ণু 'ব'-প্রদেশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে, যেখানে যত মরা নদীর ধ্বংসাবশেষ বহু স্রোতোহীন বিল ও খালরূপে দেখা যায়, এবং গ্রামে গ্রামে যেখানে যত পঙ্কিল জলাশয় আছে, সেখানে ভরানদী হইতে নূতন জল আনিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্লাবিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ভূমিও পলিমাটি পাইয়া উর্ব্বরা হইবে। খাল, বিল, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে মৎস্যের চাষ বাড়িবে, ও মশককুলও বিনষ্ট হইবে। চারিদিকে এখন কৃষির যে অবনতি ও দৈন্য দেখা গিয়াছে, তাহার এবং নদীর বন্যারও প্রতিরোধ হইবে। যদি এই প্রকার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে বাঙলার পূর্ত্তবিভাগ কমিটির (১৯৩০) শঙ্কাবহ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে—মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ অচিরে জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শুধু জলপ্লাবনের দ্বারা ইতালী ও পালেষ্টাইনে একই সঙ্গে কৃষির উন্নতি ও ম্যালেরিয়া-নিবারণ সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। পাঞ্জাবের পূর্ত্তবিভাগ ঐ প্রদেশের জলপথ রক্ষা ও সংস্কারকল্পে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রীদিগের অর্থবল নাই। জলপ্লাবনের সঙ্গে এক একটা জেলার ম্যালেরিয়া-বিষ-জর্জ্জরিত অংশের সমস্ত লোককে কুইনাইন ও প্লাসমোচিন দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হইবে। তখন মশককুলও বিষ গ্রহণ ও উদ্গিরণ করিয়া ম্যালেরিয়া বহন ও বিস্তার করিতে পারিবে না। একই সঙ্গে কৃষির উপযোগী সাময়িক, নিয়ন্ত্রিত প্লাবন (Bonification), জলাভূমির

সংস্কার, মশককুলের বিরুদ্ধে অভিযান ও মানুষের দেহের বিষ নিঃশেষ না করিলে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা নাই। জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা হইলে, এবং শিক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির ফলে রোগ প্রতিষেধিকা শক্তি বাড়িলে, মশকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর ফল পাওয়া যায়, —ইহাই ইতালীর অভিজ্ঞতা।

রেলপথ ও সেতুর দ্বারা নদীর গতিরোধ হেতু কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবনতি

আমরা দেখিলাম, মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অধোগতির প্রধান কারণ নদনদীর গতিবেগের হ্রাস ও গতিপরিবর্ত্তন। 'ব'-প্রদেশে সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। মানুষ গিরি-প্রদেশের জঙ্গল কাটিয়া, পর্ব্বতের সানুদেশের শ্যামল আচ্ছাদন কাড়িয়া লইয়া আপনার বাসস্থান গড়ে, কৃষিবিস্তার করে, অথবা খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করে। বিবস্ত্র পর্ব্বতগাত্র যেন লজ্জায় রক্তিম হইয়া বৎসর বৎসর বর্ষাগমে আরক্ত জলের বিপুল বন্যাতে দিগ্‌দিগন্ত ভাসাইয়া দিয়া প্রতিশোধ লয়। যখন সমতলভূমি জলে জলময় হয়, তখনই নদী নিম্নভূমিতে নূতন পথ খুঁজে।

সীমাহীন প্লাবনের মধ্যে এইরূপেই দামোদর, তিস্তা, যমুনা ও পদ্মা আপনাদিগের নূতন প্রবাহ-পথ অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছিল। মানুষও নদীতটে বাঁধ বাঁধিয়া, বড় রাস্তা, রেলপথ ও রেলসেতু নির্ম্মাণ করিয়া জলপ্রবাহ রোধ করিয়াছে। তখন নদীগুলি স্রোতোহীন ও পঙ্কিল হইয়া ম্যালেরিয়া মহামারী সৃষ্টি করে, অন্য নদীগুলি বর্ষাগমে

অস্বাভাবিকরূপ স্ফীত হয় এবং বন্যা আরও রোষে গর্জ্জিয়া উঠে; মানুষ প্রকৃতির শাস্তি-দানকে এইরূপে আরও নির্ম্মম করিয়া তুলে।

যেখানে মরানদী সমতলভূমিকে তাহার আশীর্ব্বাদী গেরুয়া জলধারা দান করিতে পায় না, সেখানে মাটি হয় অনুর্ব্বর ও অভিশপ্ত এবং একই সঙ্গে কৃষির অবনতি, গোজাতির দুর্গতি ও মানুষের স্বাস্থ্যের অধঃপতন ঘটে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনত জাতির কৃষ্টি-বিকাশের অন্তরায়

পূর্ব্ব-কালে এই প্রদেশে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গ। যুগের পর যুগে তাম্রলিপ্তি, মহাস্থান, বর্দ্ধমান, কোটিবর্ষ, বিজয়নগর, ভূরিশ্রেষ্ঠ, কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, ও নবদ্বীপ বাংলার গৌরবের উত্তরাধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে যে নূতন কৃষ্টি বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে অনুন্নত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনের ও সমাজের আদান-প্রদান নাই। আর এই উনবিংশ শতাব্দীতেই মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতি। ইহার ফলে আমাদের নূতন সভ্যতা হইয়াছে অনেকাংশে নব-নাগরিক। সাহিত্যে, চিন্তায় ও রাজনীতিতে আমরা মধ্যবৃত্তশ্রেণীসুলভ (Bourgeoise) কৃত্রিমতার প্রভাব দেখিতে পাই; ইহাদিগের সঙ্গে জাতির সভ্যতার মর্ম্মস্থলস্বরূপ মূঢ় ও মূক বিরাট কৃষক-সমাজের ভাব-বিনিময় ঘটে নাই।

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গের দ্বি-তৃতীয় অংশে পল্লীসভ্যতার গ্লানি ও বিলোপ শুধু যে বাঙালী জাতির বর্ত্তমান বৈষয়িক দুরবস্থার কারণ

হইয়াছে তাহা নয়, ইহা এখন তাহার কৃষ্টিরও পরম অন্তরায় হইয়াছে। পক্ষান্তরে নষ্টপ্রায় পল্লীগ্রামের পুনরুদ্ধার ও বহু গ্রামের সঙ্ঘ-শক্তির জাগরণ ও সম্মিলন না হইলে, আমরা এক অলীক প্রজাতন্ত্রের মরীচিকার পিছনে মিছামিছি ঘুরিয়া মরিব। জনসাধারণ আপনাদিগের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে না।

কলিকাতা নগরী এখন একটা বিরাটকায় অক্টোপাসের মত অসংখ্য শুঁড় বিস্তার করিয়া চারিদিকে পল্লীসমাজকে শোষণ ও রিক্ত করিতেছে, এবং জাতীয় ধ্বংসের স্তূপের উপরে তাহার সৌধমালা আকাশকে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধায় উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতেছে।

মানভূম সিংহভূম অঞ্চলে, খনিজ পদার্থ সমুদায় একটা নূতন বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যদি বিহার প্রদেশেব অন্তর্ভুক্ত করা না হইত তাহা হইলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের কৃষি ও শিল্প সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইত না। বঙ্গ-বিভাগ এখনও রদ হয় নাই। এই অঞ্চলে অনেক বাঙলাভাষাভাষী বাঙালী আছে,—তাহারা এখন বাংলার বাহিরে। এই প্রদেশ হইতে নানা আদিম জাতিও আসিয়া পশ্চিম বঙ্গে চাষ-আবাদ করিতেছে। অনেকগুলি বাঙালী জনপদ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, অনেক কারখানায় ও খনিতেও বাঙ্গালীর সুপ্রতিষ্ঠা। এই অঞ্চল বাঙলাকে প্রত্যর্পণ করিলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অবনতি ও শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণীর বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্যসমস্যার কিছু প্রতিকার হইত। পল্লীগ্রামের সম্পদহানি ও স্বাস্থ্যহানি শুধু যে ভদ্রলোকশ্রেণীর দুরবস্থার কারণ তাহা নহে, ইহা বাঙলার সহজাত ও সাধারণ লৌকিক সভ্যতার গ্লানিরও প্রধান কারণ।

পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলি কিন্তু শ্রীহীন বা বিধ্বস্ত নয়। সেখানকার সমৃদ্ধির পরিচয় আমরা কেবলমাত্র কয়েকটি বড় সহর ও জনপদেই পাই না। পশ্চিম বঙ্গের মত পূর্ব্ববঙ্গে নগর ও গ্রামের প্রতিকূলতা দেখা যায় না। সেখানকার স্বাস্থ্য ও সম্পদ, সমাজবল ও লৌকিক সভ্যতা লোকবহুল সকল জনপদগুলিই কম-বেশী ভাগ করিয়া লইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের আধুনিকতা

নদীর প্রবাহরোধ ও 'ব'-প্রদেশের স্বাভাবিক অধোগতি হেতু বাঙলার কৃষি, বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্র আজ পূর্ব্ববঙ্গে অপসারিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে কর্ম্মান্ত ও শ্রীবিক্রমপুর এই দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়িয়া দিলে সমতল-ভূমির অধিকাংশ মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত জঙ্গল ও জলাভূমিতে সমাকীর্ণ ছিল। উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য্য যুগে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। মহাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালেখে ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি ও বহু বিপুলায়তন বিহারে বিদ্যানুশীলন দেখিয়া হিউএন সাং বিস্মিত হইয়াছিলেন। গুপ্তযুগের কয়েকটি পাথরের মূর্ত্তি, যেমন—বিহারিলের অপরূপ বুদ্ধ মূর্ত্তি ও মহাস্থানের ধাতব মূর্ত্তি অতি-সুন্দর মঞ্জুশ্রী,—আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এসব পৌণ্ড্রদেশেরই অন্তর্গত। ত্রিপুরা প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন রাজধানী কর্ম্মান্ত নগর খুব সম্ভবতঃ খড়্গ বংশীয় রাজাদিগের সময়ে (সপ্তম শতক) প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খড়্গবংশীয়েরা সমতটের অধিপতি ছিলেন। এখনকার পূর্ব্ববঙ্গকে প্রাচীন সমতট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দেব

খড়্গের (সপ্তম শতক) সময়কার দুই খানা অনুশাসন ও অনেকগুলি অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্ত্তি বড় কামতার নিকট (কুমিল্লার ছয় ক্রোশ পশ্চিমে) পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে দেব খড়্গ ও রাজভট্ট সমতটের 'নিখিলক্ষিতিপতিজয়ী' অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল কর্ম্মান্ত, আধুনিক বড় কামতা এবং তাহার অনতিদূরেই চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত বিখ্যাত বিহারমণ্ডল ছিল। কুমিল্লার এই অঞ্চলে বহু পুরাতন বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য শিলামূর্ত্তি তখনকার সমতটের অসামান্য শিল্প-গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। অষ্ট শতক বাংলার ইতিহাসের পক্ষে ঘটনাবিরল। নবম শতকে পাল রাজেরা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের রাজধানী ছিল উত্তরবঙ্গে। একাদশ শতকে আমরা পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে সমতটের অধিপতি রোহিতাগিরিতে চন্দ্রবংশের উল্লেখ পাই। রোহিতাগিরি ত্রিপুরা জেলার ঠিক মাঝখানে, এখনকার নাম তাহার লালমাই পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের অন্তর্গত পট্টিকেরা নগরী প্রাক্ মুসলমান যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এখন তাহার নাম পাটিকারা। এই চন্দ্রবংশের একজন রাজা শ্রীচন্দ্রদেব শ্রীবিক্রমপুর হইতে তাঁহার অনুশাসন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভট্টশালীর মতে ইহাই শ্রীবিক্রমপুরের প্রথম উল্লেখ। শ্রীবিক্রমপুরের বিশাল ধ্বংসাবশেষ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আধুনিক রামপালে লুক্কায়িত হইয়াছে। বাখরগঞ্জে লক্ষ্মণকাটিতে এমন একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা গুপ্ত স্থাপত্য-রীতির ব্যঞ্জনা করে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, প্রাক্ মুসলমান যুগে বাখরগঞ্জেরও দুএক অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া-

ছিল। ঢাকা অঞ্চলের সাভার, শ্রীবিক্রমপুর, সোনারং, মহাকালী প্রভৃতি, ফরিদপুর অঞ্চলে উজানি ও মাঝবাড়ি, ত্রিপুরা জেলার কর্ম্মান্ত, চৌদ্দগ্রাম ও পাটিকারা এবং বাখরগঞ্জের লক্ষ্মণকাটি প্রভৃতি অঞ্চল প্রাক্ মুসলমান যুগে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। ভট্টশালী মহাশয় লোক-প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বল্লালসেনের আমলে কাস্তল ও অষ্টগ্রামের দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজার বিরাগভাজন লইয়া ময়মন-সিংহের পূর্ব্ব অঞ্চলে মেঘনার উপকূলে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য শিলামূর্ত্তি প্রাক্ মুসলমান যুগে শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরে এইরূপ নানা পুরাতন উপনিবেশের পরিচয় দেয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুরাতন রাজধানী ও গণ্ডগ্রাম ছাড়া পুর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশই মধ্যযুগে জঙ্গলে আবৃত ছিল।

রালফ্ ফিচ্ (ষোড়শ শতাব্দী), খুলাসাত-উল্-তারিখ্ প্রভৃতির বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অংশ জনবিরল ছিল। মামুদাবাদ ও খলিফাতাবাদে (দক্ষিণ যশোহর, ফরিদপুর, নোয়াখালি ও পশ্চিম বাখরগঞ্জ) তখন বন্য হস্তীর অত্যাচার ছিল এবং প্রধান নগর (?) সোনার গাঁয়ে রাত্রে বাঘের বিষম ভয় ছিল।

বাংলার লোক ও সম্পদ বৃদ্ধির কেন্দ্র পূর্ব্ব অঞ্চলে অপসারিত

বাংলার প্রাচীন জনপদের ধ্বংস ও অর্ব্বাচীন মুসলমানী সভ্যতার উত্থানের সহিত বাংলার ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি, স্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যার বিপরীত গতি বুঝা যাইবে।

ক্ষয়িষ্ণু 'ব'-প্রদেশের জেলা	১৯০১ সালের কর্ষিত জমি (একর) পরিমাণ	১৯২১ সালের কর্ষিত জমি (একর) পরিমাণ	কর্ষিত জমির হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা)	ম্যালেরিয়ার পরিমাণ	লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি (শতকরা)
বর্দ্ধমান	১,২৪৮,৩০০	৭৪২,১০০	—৪০	৫৩'৪	+৩'৭
নদীয়া	৯৯০,৪০০	৯১৩,২০০	—৭	৫৬'৫	—৮'১
মুর্শিদাবাদ	১,১০৬,৬০০	৯৪৬,৫০০	—১৪	৪১'৭	+২২'৯
যশোহর	১,৩০৩,৬০০	৮৮৭,৩০০	—৩১	৪৮'২	—৭'২
হুগলী	৫৪১,৪০০	২৯৩,৯০০	—৪৫	৪৬'৬	+৬'২
বর্দ্ধিষ্ণু 'ব'-প্রদেশের জেলা					
ঢাকা	১,০৮৬,১৬৯	১,৭০৯,০০০	+৫৭	৯'৭	+২৮'৯
মৈমনসিংহ	৩,০৭৬,৮০০	৩,৬৭৪,৫০০	+১৯	১১'১০	+২৮'৫
ফরিদপুর	১,২৯৫,৮০০	১,৪৭০,৩০০	+১৩	২৬'৬	+২১'৮
বাখরগঞ্জ	১,৬৬০,০০০	২,০১৫,০০০	+২১	৮'৩	+২৭'১

ত্রিপুরা	১,৩১৫,৯০০	১,৪৭২,৮০০+১১	৭·২	+৩৭·৭
নোয়াখালি	৪২৯,০৮৭	১,১৯২,৬০০+১৫২	১০·৫	+৪২·৯

নিম্নে প্রদত্ত ১নং ছবিতে বাখরগঞ্জ ও ঢাকায় অবাধ কৃষির প্রসার এবং যশোহর ও নদীয়ায় কৃষির ক্রমশঃ বিলোপ স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। আর ২নং ছবিতে এই চারিটি জেলার গত ৭০ বৎসরে লোকসংখ্যার (প্রতি বর্গ মাইল) বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হইবে। কৃষির সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে যশোহর ও নদীয়ার লোকক্ষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

দুইটি মানচিত্রে বাংলার বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে গত ৩০ বৎসরের লোকসংখ্যার প্রগতি ও অধোগতি (৩নং চিত্র) ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপের পরিমাণ (৪নং চিত্র) নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

মরানদী ও ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশ বনাম জীবন্ত নদী ও বর্দ্ধিষ্ণু প্রদেশ

মধ্যবঙ্গে মরানদীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই অঞ্চলে মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ হিসাবে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ শতকরা মাত্র ৪৭·৫ বর্দ্ধমান বিভাগে এবং ৫৫·৭ প্রেসিডেন্সি বিভাগে; ঢাকা বিভাগের পরিমাণ শতকরা ৮৯·৩ এবং চট্টগ্রামের ৬২.৫।

বর্দ্ধিষ্ণু 'ব' প্রদেশের কৃষিবিস্তার ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের সঙ্কোচ নিম্নলিখিত তালিকাতে পরিস্ফুট হইবে।

প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা

বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ঢাকা	৬৫৭	৭৫২	৮৬১	৯৫২	১,০৬৬	১,১৪৮	১,২৬৫
মৈমনসিংহ	৩৭৭	৪৮৯	৫৫৬	৬২৭	৭২৪	৭৭৬	৮২৩
ফরিদপুর	৬৫৮	৭১৬	৭৮৫	৮৩৩	৯০৫	৯৪৯	১০০৩
বাখরগঞ্জ	৫৪০	৫৪৪	৬১৬	৬৫৬	৬৯৫	৭৫২	৮৩৪
ত্রিপুরা	৫৬২	৬০৬	৭১৩	৮৪৮	৯৭২	১,০৭২	১১৯৭
নোয়াখালি	৫১১	৪৯৯	৬১৪	৬৯৪	৭৯২	৯৭২	১১২৪
চট্টগ্রাম	৪৫২	৫৫৪	৫১৮	৫৪৩	৬০৫	৬৪৫	৬৯৯
ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল							
নদীয়া	৫৩৫	৫৯৩	৫৮৬	৫৯৪	৫৮০	৫৩৫	৫৩১
মুর্শিদাবাদ	৫৬৭	৫৭২	৫৮৪	৬২২	৬৪০	৫৯৫	৬৫৬
যশোহর	৪৯৬	৬৬৩	৬৪৬	৬২০	৬০১	৫৯৩	৫৭৬
হুগলী	৯৪২	৮২১	৮৭০	৮৮৩	৯১৮	৯০৯	৯৩৮

পূর্ব্ব অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা জেলার মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির অনুপাতে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ (৯৪·৮) কৃষি বিস্তারের মাপকাটি ধরা যাইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এখনও চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালিতে অধিক পরিমাণে শস্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে।

কর্ষণযোগ্য ভূমির অনুপাতে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ

শতকরা

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ঢাকা	৮৯.০	৯৪.১	৯৪.৮
ত্রিপুরা	৮৬.৮	৯৩.৩	৯৫.৬
বাখরগঞ্জ	৮১.৮	৮৮.৩	৮৯.৯
নোয়াখালি	৯৫.১	৮৭.০	৯২.১
চট্টগ্রাম	৮২.২	৮৫.২	৭৯.৮

বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এখনও সেরূপ লোকবহুল হয় নাই। চট্টগ্রামের কিছু অংশ অস্বাস্থ্যকর ও পর্ব্বতাকীর্ণ। কিন্তু বাখরগঞ্জে এখনও কৃষির সুবিধা অনুযায়ী পূর্ণ-লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ঝড় ও তুফানের ধ্বংসভয় থাকিলেও ঐ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল ও দক্ষিণ শাহাবাজপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে অপেক্ষাকৃত নূতন মাটি,—এখানে লোকবৃদ্ধির স্বর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। মেঘনা ভারত-বর্ষের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ নদী। শ্রীহট্টের জলাভূমি হইতে মেঘনা অত্যধিক পরিমাণে পাঁক ও গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ বহিয়া আনে। ফলে পদ্মার পলিমাটি অপেক্ষা মেঘনার পলিমাটি অনেক বেশী উর্ব্বর। মেঘনার চর জল হইতে উঠিতে না উঠিতেই বোরো ধান্যসম্ভারে কৃষককে পুলকিত করে। এই কারণে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, যত নীচে আমরা পদ্মা-মেঘনা বহিয়া যাই, ততই উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমন চাষের পরিমাণ বাড়ে, অথবা পাট, লঙ্কা, শাঁকালু ও অন্যান্য নানাবিধ রবিশস্য মিলিয়া কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করে। খুব

সম্ভবতঃ মেঘনা যে তিনটি জেলার (ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ) সম্পদবৃদ্ধির ভার লইয়াছে তাহাদিগের উন্নতি ও লোকসংখ্যা পূর্ব্ব বঙ্গের অন্য জেলাকে অদূর ভবিষ্যতে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এখনও ত্রিপুরা ও বাখরগঞ্জের দো-ফসলি ভূমির পরিমাণ কমই রহিয়াছে। ইহার বৃদ্ধি এবং শাঁকালু, লঙ্কা, পান ও নারিকেলের বিস্তার প্রভৃত কৃষি-সম্পদের কারণ হইবে। পাটের পরিবর্ত্তে আক, তুলা এবং সরিষা, ডাল প্রভৃতি নানাপ্রকার রবিশস্যেরও বিস্তার সহজ ও অবশ্যম্ভাবী।

	মোট বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)	আমন ধান জমির পরিমাণ	দো-জমির পরিমাণ	লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইল
		(মোট কর্ষিত ভূমির পরিমাণ হিসাবে)		
বৰ্দ্ধিষ্ণু ব'প্রদেশের উপর অংশ			শতকরা	
ঢাকা	৭৪·৩	৪১	১৮·৬	১,২৬৫
মৈমনসিংহ	৮৯·১	৫৩	৪৪·৮	৮২৩
ফরিদপুর	৭৩·২	৭২	১০·৫	১,০০৩
বৰ্দ্ধিষ্ণু ব'প্রদেশের নিম্নতম অংশ				
ত্রিপুরা	৮২·০	৭৪	২৮·২	১,১৯৭
নোয়াখালি	১১৪·২	৯০	৫৭·৫	১,১২৪
বাখরগঞ্জ	৯১·১	৯৬	৭·৩	৮৩৪
চট্টগ্রাম	১১৪·৫	৯০	৪·২	৬৯৯

নিম্ন ভূমির সমস্ত অঞ্চলে বাৎসরিক নদীপ্লাবন যে প্রাকৃতিক জলসেচের ভার, এবং শীত ঋতুতে সুদূর বিল ও জলাভূমি হইতে

অতিরিক্ত জল অসংখ্য খাল ও পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া বহিয়া আনিয়া যে জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার, লইয়াছে রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ তাহার বিঘ্ন ঘটায় নাই। ফলে ব'প্রদেশের নিম্নতম অংশ পূর্ব্ববঙ্গের অন্য অংশ অপেক্ষা দ্রুততর সম্পদ ও লোকবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে প্রকৃতির বিপর্য্যয় হেতু অনুর্ব্বর ভূমি লোকসংখ্যার ভার বহন করিতে পারিতেছে না, যদিও সে ভার পূর্ব্ব অঞ্চল অপেক্ষা অনেক লঘু। কিন্তু পূর্ব্ব অঞ্চলে পর্য্যায়ক্রমে তিনটি নদীপ্লাবন-প্রদত্ত ভূমির শস্যোৎপাদন-শক্তি আরও গুরুতর লোকভার বহন করিতে পারিতেছে, তাই মানুষেরও উৎপাদন তদ্রূপ চলিতেছে।

এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা কৃষির অবনতি, লোকসংখ্যার হ্রাস ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে নদীগুলি অবাধ ও খরস্রোতা; সেখানে বাঁধ, রাস্তা ও রেলপথের সংখ্যা কম। পূর্ব্ব অঞ্চলে গত তিনটি আদম-সুমারীতেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সকল জেলাতেই কৃষির বিপুল প্রসার এবং অধিকাংশ সাব-ডিভিসনই ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত।

বাখরগঞ্জের এক অংশের প্রদত্ত জলপথের মানচিত্র (৫নং চিত্র) হইতে কৃষির সঙ্গে জলপ্রবাহের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। জলপ্লাবন হেতু আমন ধান এখানকার প্রধান ফসল। সমগ্র কর্ষিত ভূমির শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে বাখরগঞ্জে আমন ধান জন্মে। নিয়মিত বন্যা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিয়া দেয়, দিগ্‌দিগন্তপ্রসারিত সবুজ আমন

ধান বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষা বন্যাই কৃষির সহায়। যে জলপথগুলি কৃষির অবলম্বন, বর্ষার পর যখন জলপ্রবাহ বিপরীত দিকে বহিতে থাকে, তখন তাহারাই আবার সমগ্র অঞ্চলে জলনিকাশ ও আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের সুব্যবস্থা করে। আমন ধান ও সুপারী বাগানের সম্পদে বাখরগঞ্জের অনেক এলাকায় ১৫০০ হইতে ১৭০০ লোক প্রতি বর্গ মাইলে প্রতিপালিত হয়। বাখরগঞ্জের ফল ও শাক-সব্জীর বাগানের পরিমাণও বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—১৬৫,০০০ একর; বর্দ্ধমানে ১১০০০, নদীয়ার ৫৯০০ ও যশোহরের ৩২০০ একরের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এখনও বাখরগঞ্জের সমৃদ্ধি ও লোকসংখ্যা অনেক বাড়িবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলার বিপর্য্যয়

পূর্ব্ব অঞ্চল বর্দ্ধিষ্ণু, কিন্তু হিন্দু এখানে ক্ষয়িষ্ণু

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে লোকসংখ্যার অবনতি ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি ও লোকসংখ্যার বিস্তার বাংলার আধুনিক ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তথ্য। আর একটি প্রধান তথ্য এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের যে-সব জেলায় কৃষি ও অন্যান্য সম্পদ বাড়িতেছে, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। অপর দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হিন্দু হটিয়া যাইতেছে, কিন্তু মুসলমান সেই শূন্যস্থান দ্রুত অধিকার করিয়া লইতেছে।

হিন্দু—প্রতি হাজার

ক্ষয়প্রাপ্ত ব-প্রদেশ	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বর্দ্ধমান	৮০৩	৭৯৭	৭৯৩	৭৮০	৭৮৬
মুর্শিদাবাদ	৪৯৬	৪৮৩	৪৬৯	৪৫০	৪৩০
নদীয়া	৪১৯	৪০৬	৩৯৭	৩৯১	৩৭৫
যশোহর	৩৯০	৩৮৭	৩৮০	৩৮১	৩৭৯
বর্দ্ধিষ্ণু ব-প্রদেশ					
বাখরগঞ্জ	৩১৬	৩১১	২৯৬	২৮৭	২৭৬

বৰ্দ্ধিষ্ণু ব-প্রদেশ	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ফরিদপুর	৩৮৮	৩৭৯	৩৬৫	৩৬২	৩৫৯
ঢাকা	৩৮৬	৩৭৩	৩৫৫	৩৪২	৩২৭
মৈমনসিংহ	৩০১	২৭৮	২৫৭	২৪৩	২২৯
নোয়াখালি	২৪৬	২৪০	২৩০	২২৩	২১৫
ত্রিপুরা	৩১২	২৯৪	২৭৭	২৫৮	২৪১

মুসলমান—প্রতি হাজার

ক্ষয়প্রাপ্ত ব-প্রদেশ	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বৰ্দ্ধমান	১৯২	১৮৮	১৮৯	১৮৫	১৮৬
মুর্শিদাবাদ	৪৯৫	৫০৮	৫২০	৫৩৬	৫৫৬
নদীয়া	৫৭৬	৫৮৯	৫৯৫	৬০২	৬১৮
যশোহর	৬০৯	৬১২	৬১৯	৬১৮	৬২০
বৰ্দ্ধিষ্ণু ব-প্রদেশ					
বাখরগঞ্জ	৬৭৯	৬৮৩	৬৯৭	৭০৬	৭১৬
ফরিদপুর	৬১০	৬১৯	৬৩২	৬৩৫	৬৩৮
ঢাকা	৬০৯	৬২৩	৬৪০	৬৫৪	৬৬[illegible]
মৈমনসিংহ	৬৯০	৭১৪	৭৩৪	৭৪৯	৭৬৬
নোয়াখালি	৭৫৩	৭৫৯	৭৬৮	৭৭৬	৭৮৫
ত্রিপুরা	৬৮৭	৭০৫	৭২২	৭৪১	৭৫৮

যত পুরাতন লোকসংখ্যা পাওয়া যায় তাহা সমীক্ষণ করিলে হিন্দু-মুসলমান-বৃদ্ধির এই অসমতা আরও পরিস্ফুট হইবে। কয়েকটি বিশেষ

মুসলমানপ্রধান জেলা লইয়া মোট লোকসংখ্যা হিসাবে উনবিংশ শতকের মুসলমান-বৃদ্ধি নিম্নে দেখানো হইল ঃ—

মুসলমান, মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে

শতকরা

	১৮০১	১৮৫৫-৬৩	১৮৭১	১৯০১	১৯৩১
রংপুর	৫৬}১৮০৭	অজ্ঞাত	৬০	৬৩·৬	৭১
ঢাকা	৫০	৫০}১৮৫৭-৬০	৫০	৬২·২	৬৭
বাখরগঞ্জ	৩৭	৬১	৬৪·৮	৬৮·২	৭২
যশোহর	৫৬ (যশোহর ও ফরিদপুর)	৫২·৫ (যশোহর ও ফরিদপুর)	৫৫·৫	৬১·২	৬২
ফরিদপুর			৫৮	৬১·৯	৬৪
নদীয়া	৩৭·৫	অজ্ঞাত	৫৪	৫৮·৯	৬২

কেবলমাত্র ২টি জেলায় মুসলমান-বৃদ্ধি অব্যাহত হয় নাই। মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরে মুসলমান-লোকসংখ্যা খুব কমিয়া আবার এই শতাব্দীতে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মুসলমান, মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে

শতকরা

	১৮০১	১৮৫৫-৬৩	১৮৭১	১৯০১	১৯৩১
মুর্শিদাবাদ	৬৬	৩৬	৪৫	৫০·৭	৫৫·৫
দিনাজপুর	৭০}১৮০৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৪৯·৫	৫০·৫

১৮৭১ ও ১৯৩১ সালের লোকগণনার তুলনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে বাংলার যে-সকল অঞ্চল পূর্ব্বে মুসলমান-বহুল ছিল না তাহার অনেক-গুলি এখন মুসলমানপ্রধান হইয়াছে, অথচ বহু হিন্দু-অঞ্চলেও মুসলমান-প্রাধান্য ঘটিতেছে। ১৮৭১ সালে মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ৭০এর অধিক মুসলমান-বহুল জেলা (তারকা চিহ্নিত) কেবলমাত্র ৪টি ছিল; বগুড়া (৮০'৭), রাজসাহী (৭৭'৭), নোয়াখালি (৭৪'৭), চট্টগ্রাম (৭০'৫); কিন্তু এখন বাংলার নয়টি জেলায় শতকরা ৭০এর অধিক মুসলমান, সে নয়টি জেলা—বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, পাবনা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম। অপর দিকে ১৮৭১ সালে মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ৭০এর অধিক হিন্দু যে-সকল জেলায় ছিল তাহাদের হিন্দুপ্রাধান্য কমিতেছে। (মানচিত্র)

মুসলমান-প্রধান জেলা

জেলা	মোট লোকসংখ্যা হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা (শতকরা) ১৮৭১	১৯৩১
*বগুড়া	৮০'৭	৮৩
রংপুর	৬০'০	৭১
*রাজসাহী	৭৭'৭	৭৬
পাবনা	৬৯'৯	৭৭
মৈমনসিংহ	৬৪'৭	৭৬'৫

ত্রিপুরা	৬৪·৮	৭৬
বাখরগঞ্জ	৬৪·৮	৭২
*নোয়াখালি	৭৪·৭	৭৮
*চট্টগ্রাম	৭০·৫	৭৪
নদীয়া	৫৪·৩	৬২
যশোহর	৫৫·৫	৬২
ফরিদপুর	৫৮·১	৬৪
ঢাকা	৫৬·৭	৬৭
দিনাজপুর	৫২·৮	৫০·৫
মালদহ	৪৬·০	৫৪
মুর্শিদাবাদ	৪৪·৬	৫৫

১৮৭১ সালে যে-জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান ছিল (যেখানে শতকরা ৭০ এর অধিক হিন্দুর সংখ্যা) উহা নিম্নের তালিকায় তারকা-চিহ্নিত হইয়াছে।

মোট লোকসংখ্যা হিসাবে হিন্দুর সংখ্যা

শতকরা

জেলা	১৮৭১	১৯৩১
*বাঁকুড়া	৯২·৬	৯১
*হুগলী	৭৯·৭ (হুগলী ও হাবড়া একত্রে)	৮৩
হাবড়া		৭৮

*মেদিনীপুর	৯০˙০	৯০
*বর্দ্ধমান	৮২˙৫	৭৯
*দার্জ্জিলিঙ্	৭৩˙৭	৭৪
*বীরভূম	৮২˙৯	৬৭
২৪ পরগণা	৫৯˙১	৬৪
জলপাইগুড়ি	৫৫˙৬	৬৭˙৫
নদীয়া	৪৫˙৩	৩৭
যশোহর	৪০˙১	৩৮
মুর্শিদাবাদ	৫৪˙২	৪৩
দিনাজপুর	৪৬˙৮	৪৫
মালদহ	৫২˙৭	৪২
ঢাকা	৪২˙৯	৩৩
ফরিদপুর	৪১˙৬	৩৬

মুসলমান বৃদ্ধির কারণ, পশ্চিম অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু মুসলমান এখানে বর্দ্ধিষ্ণু

উল্লিখিত তালিকাগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে, বাংলার যে-অঞ্চল আজ অতীত সম্পদ ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সে-অঞ্চলে শুধু যে মুসলমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নয়, হিন্দুর সংখ্যার হ্রাসও দেখা দিয়াছে। উপরন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত 'ব'-প্রদেশ, যেখানে লোকসংখ্যার সাধারণ অবনতি, সেখানেও হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে।

অধিকাংশ মুসলমান বাংলাদেশের নিম্নস্তরের জাতি সমুদায় হইতে উদ্ভূত। নিম্নজাতি সমুদয় মাটি ও চঞ্চলা প্রকৃতি হইতে শক্তি আহরণ করে,—তাই তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধনশীল। বাংলার নিম্নজাতি সমুদায়েরই মত মুসলমানেরও প্রজনন-শক্তি প্রবল। মুসলমানের আহার্য্য অধিকতর পুষ্টিকর। মুসলমানেরা অনুন্নত হিন্দুশ্রেণীগুলিরই মত নদীর চর ও জলাভূমিগুলিকে কৃষিকার্য্য ও বসবাসের উপযোগী করিয়া লয়। নূতন জনপদগুলি অধিকতর স্বাস্থ্যকর। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার যে-সব অংশে মুসলমানের প্রাধান্য, সে-সকল অংশের নবগঠিত জনপদগুলি ম্যালেরিয়া-পীড়িত নয়। হিন্দুর অধ্যুষিত পুরাতন জনপদসমূহ এখন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেখানে না আছে স্বাস্থ্য, না আছে জীবনের স্ফূর্ত্তি, না আছে অন্নসংস্থানের যথেষ্টরূপ সঙ্গতি। দারিদ্র্য ও অলসতা প্রজনন-শক্তির হানি করিতেছে। মুসলমান নবাব ও জায়গীরদারের নির্য্যাতনের মত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সামাজিক অবিচার, অশিক্ষিত, অবনত ও অস্পৃশ্য জাতি সমুদায়কে গত এক শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অত্যাচার ও অবিচার হিন্দু-সমাজের শক্তি-ক্ষয়ের একটি প্রকৃষ্ট কারণ। এই প্রকারে প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামজিক শক্তি মিলিয়া, বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যার অসমতা অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক লোক সামুদ্রিক জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। হিন্দু-শাস্ত্র পশ্চিমে তাম্রলিপ্তের গৌরবময় যুগের অনেক পরে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং নোয়াখালি, চট্টগ্রামের অনেক মাঝি, মাল্লা ও

লস্কর যে মুসলমান হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ১৮০১ সালে বাখরগঞ্জের বর্ণনা করিতে গিয়া আদম সাহেব লিখিয়াছেন, ঐ জেলায় শতকরা ৩৭·৫ জন মুসলমান এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংবৎসর নৌকাতেই জীবন যাপন করে। অবনত রাজবংশী, ও তথাকথিত চণ্ডালেরা বহুকাল হইতেই হিন্দু-সমাজের কোলে কোন আশ্রয় বা আশ্বাস না পাইয়া এবং হিন্দুত্বের সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার যে-সব জেলায় মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যা হিসাবে অর্দ্ধেকের অধিক, সেখানে অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতিরও সংখ্যা খুব বেশী।

অনুন্নত জাতির সংখ্যা

জেলা	মুসলমানের সংখ্যা শতকরা	মোট হিন্দুসংখ্যা হিসাবে শতকরা	মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা
বগুড়া	৮৩	৪·০	৬·৭
রংপুর	৭১	১২·৬	৩·৬
রাজসাহী	৭৬	৩৬·৩	৮·৩
পাবনা	৭৭	৩৬·৭	৮·৪
ময়মনসিংহ	৭৬·৫	৪০·৮	৯·৩
ত্রিপুরা	৭৬	৩২·৩	৭·৮
বাখরগঞ্জ	৭২	৫২·৪	১৪·৫
নোয়াখালি	৭৮	২৩·২	৫·০
চট্টগ্রাম	৭৪	১৫·৯	৩·৫

নদীয়া	৬২	৩২'০	১২'০
যশোহর	৬২	৫২'৭	২০'০
ফরিদপুর	৬৪	৬০'২	২১'৬
ঢাকা	৬৭	৪১'৮	১৩'৭
দিনাজপুর	৫০'৫	২৪'৮	১১'২
মালদহ	৫৪	৩৬'৭	১৫'৪
মুর্শিদাবাদ	৫৫	৩২'৯	১৪'২

ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার

কেবলমাত্র বগুড়া, রংপুর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলায় হিন্দু অবনত জাতির সংখ্যা কম। রংপুরে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বুকানন সাহেব (১৮০৭) লিখিয়াছেন যে, এখানকার মুসলমানেরা আরব, আফগান বা মোগল আগন্তুকের বংশধর নহে, অধিকাংশই স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদিগের বংশধর, রাজা ও ভূস্বামীদের গোঁড়ামী ও অত্যাচারের ফলে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে। রাজা রামমোহনের সময়ও এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন প্রবলভাবে চলিয়াছিল। রংপুর অপেক্ষা বগুড়া জেলায় আফগান জায়গীরদারদিগের ধর্ম্মপ্রচার অধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকে অনেক আফগান করতোয়ার পশ্চিমতীরে দিনাজপুর হইতে ঘোড়াঘাট এমন কি নাটোরের নিকট পর্য্যন্ত নিষ্কর জমি লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল করতোয়ার পূর্ব্ব পারের কুচজাতির অভিযান ও আক্রমণ হইতে শান্তি-স্থাপন এবং দেশ রক্ষা করা। একদিকে যেমন তাহারা তাহাদিগের প্রজাদিগকে জোর করিয়া ইস্লাম

ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে লাগিল, অপরদিকে তাহারা পূর্ব্ব অঞ্চলে সৈন্যাভিযান করিয়া আদিম জাতিদিগের সম্মুখে একহস্তে তরবার ও অন্যহস্তে কোরাণ লইয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ ব্যাপার প্রায় দুই শত বৎসর চলিতে থাকে। তুঘ্রিল খাঁর (১২৫৭) আক্রমণ ও হুশেন শাহের কামাতাপুর ধ্বংসবিধান (১৪৯০) ইহার সাক্ষ্য দেয়। অপরদিকে কুচবিহারের রাজা বিষ্ণুসিংহ (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) যখন হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন, তখন ঐ অঞ্চলের উচ্চ শ্রেণীর অনেকেই তাঁহার অনুকরণে হিন্দু হইল। অবশিষ্ট কুচ, মেচ, বোদো, ধীমলি প্রভৃতি নিম্নজাতির লোকেরা হিন্দু-সমাজের বাহিরে উপেক্ষিত ও অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। তখন তাহাদিগের ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক হিন্দু ক্রীতদাস ও চাকরও পেটের দায়ে ধনী মুসলমানের শরণাপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল। বগুড়া যে বাংলার সব জেলা অপেক্ষা মুসলমানবহুল, তাহার প্রধান কারণ বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের এক করুণ বিস্মৃত অধ্যায়ে নিহিত রহিয়াছে। এখনও বগুড়া ও রংপুরে শেখ, খাঁ, ও মোল্লা কমই পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ মুসলমান নশ্যা বলিয়া অভিহিত। নশ্যার অর্থ খুব সম্ভবতঃ পতিত। এখনও অনেক মুসলমান পরিবারে এখানে হিন্দুরীতিতে বৈবাহিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়, বিবাহিতা স্ত্রীলোক সিঁথিতে সিঁদুর পরে, কোন কোন স্থানের মুসলমানেরা বিষহরি বিবির পূজা করে এবং গোপাল মহেন্দ্র ইত্যাদি হিন্দু দেবতার অনুরূপ নাম রাখে। নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুসলমান আধিক্যের প্রধান কারণ,—

আফগানেরা আজিম খাঁ মৃজার দ্বারা পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইলে (১৫৮৩) পলাইয়া আসিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম এই সীমান্ত জেলাগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদিগের বংশধরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল তাহারা মিলিয়া নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুসলমান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

চট্টগ্রাম নোয়াখালিতে নসরত শাহের ধর্ম্ম প্রচারের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চারটি জেলা ছাড়িয়া দিলে প্রায় সব জেলায় হিন্দুর এক-তৃতীয়াংশ এমন কি অর্দ্ধেক লোক অবনত ও নিপীড়িত। উত্তরে—রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা ও ময়মনসিংহে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বের ৪টি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা যত অধিক, পুরাতন মুসলমান রাজধানী যে-যে স্থানে ছিল,—যেমন, গৌড়, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ,—সে-সে স্থানে মুসলমানের সংখ্যা তত অধিক নহে। মুসলমানের এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাঠান ও মোগল রক্তের আমদানির ফলে ঘটে নাই,পল্লী সমাজের অধিকাংশস্থলে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। অপর দিকে ইহাও স্মরণ করা উচিত যে,একশত বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে,(যদি বুখানন সাহেবের (১৮০৭) বর্ণনা বিশ্বাস করিতে হয়) হিন্দু-মুসলমানেরা অনেক ক্ষেত্রেই একই পূজা-গৃহে সম্মিলিত হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে একই দেবতার আবাহন করিত, সুতরাং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কখনও বা নীরবে ও নির্ব্বিবাদে চলিয়াছিল, কখনও বা নিষ্ঠুর নির্য্যাতন ও প্রচণ্ড ধর্ম্মান্ধতার ফলেও ঘটিয়াছিল।

হিন্দুর উচ্চজাতি সমুদয়ের মধ্যেও নানাপ্রকার সামাজিক কুপ্রথা হিন্দুসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে

বিবাহের বিধি-নিষেধ হিন্দু জাতির ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। একে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অল্প, তাহার উপর বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবার বিবাহ দিলে জাতি ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার মাপকাঠিতে নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। এই সকল নানা বিধি-নিষেধের জন্য উচ্চ ও অর্দ্ধ-উচ্চ হিন্দু জাতিগুলির প্রজনন আজ বাধাপ্রাপ্ত।

অপর দিকে মুসলমান উচ্চ নীচ যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক, ধর্ম্ম ও সমাজে সে সমান অধিকার পায়। বিবাহের রীতিতে তাহার বিধি-নিষেধ বিশেষ কিছুই নাই। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ অনুষ্ঠান তাহার যেমন প্রজননের সহায়, তাহার নূতন ও এমন কি সুদূর নদীসৈকত ও বিপৎসঙ্কুল জলাভূমিতে কৃষি সম্পাদন ও বসবাস বিস্তারের পক্ষেও উহা তেমনি অনুকূল। সব শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই, বিশেষতঃ পূর্ব্ব অঞ্চলে, বহুবিবাহ খুব প্রচলিত। আইন অনুসারে মুসলমানের চারিটি বিবাহ হইতে পারে। নিজের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সে অনেক সময় অতগুলি বিবাহ করে এবং তাহার পরিবার-গোষ্ঠীও প্রকাণ্ড হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের গত অর্দ্ধশতাব্দীতে বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

	১৮৭১	১৯৩১	শতকরা বৃদ্ধি
হিন্দু	১৮১ লক্ষ	২২৩ লক্ষ	২৩
মুসলমান	১৭৬ লক্ষ	২৭৮ লক্ষ	৫৮

মোট লোকসংখ্যার প্রতি হাজারে

	১৮৭১	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	৪৯৩	৪৮৮	৪৭৭	৪৭০	৪৫২	৪৩৭	৪৩৫
মুসলমান	৪৭৯	৪৯৭	৫০৭	৫১২	৫২৩	৫৩৫	৫৪৪

১৮৭১ সালে বাংলায় মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা কম ছিল। ১৮৮১ সাল হইতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হাজারকরা ৯ দেখা যায় ১৮৮১ সালে, ৩০ হয় ১৮৯১ সালে, ৪২ হয় ১৯০১ সালে, ৭১ হয় ১৯১১ সালে, ৯৮ হয় ১৯২১ সালে এবং ১০৯ হয় ১৯৩১ সালে। ১৮৯১—১৯০১ সালে মুসলমানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পূর্ব্বে ও পরের মত তত বৃদ্ধি পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ,—ঐ দশকে বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের কতক অংশ ম্যালেরিয়া মহামারীর পর কিছু অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

গত অর্দ্ধশতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ; অর্দ্ধশতাব্দী পরে দুই সম্প্রদায়ের সংখ্যা-নির্দ্দেশ

সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমানের সংখ্যা ১৮৮১ সালে হাজারকরা ৪৯৭ হইতে বাড়িয়া ১৯৩১ সালে হাজারকরা ৫৪০ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের প্রবল প্রতিপত্তি। হাজারকরা ৬৪৫ হইতে সেখানে তাহারা গত ৫০ বৎসরে বাড়িয়া ৭১০ জন হইয়াছে। যে-কোন দেশে অধিবাসিগণের লোকসংখ্যার এরূপ তারতম্য উপস্থিত হইলে একটা সামাজিক বিপ্লব বা সভ্যতার ধারা-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

এরূপ নির্দ্দেশ করা যায় যে, আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি দশজন লোকের মধ্যে ৮ জন মুসলমান ও বাকী ২ জন হিন্দুর মধ্যে একজন নমঃশূদ্র দেখা যাইবে। সমগ্র বঙ্গদেশে ৫০ বৎসর পরে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন উচ্চজাতির হিন্দু, ৬ জন মুসলমান এবং আর তিন জনের মধ্যে একজন মাহিষ্য, একজন নমঃশূদ্র ও একজন রাজবংশী অথবা একজন অপর কোন জাতির লোক পাওয়া যাইবে। এখনই ত নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও বাখরগঞ্জে দশ জন লোকের মধ্যে ৭ জন মুসলমান, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু নমঃশূদ্র জাতীয়।

অনুন্নত হিন্দুজাতির বৃদ্ধি

বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা সমগ্র হিন্দুর অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী। সমগ্র বাংলায় অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা, সমগ্র হিন্দুর হাজারকরা তিনশত। ক্রমোন্নতিশীল পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় অবনত হিন্দুজাতিগুলির সংখ্যা খুব বেশী। এই সকল জেলায় ইহারা ভবিষ্যতে সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক অপমানিত এই সকল শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি বাংলার সামাজিক শান্তি ও সভ্যতার উপর কম প্রভাব বিস্তার করিবে না। যতদিন তাহারা অনাদর ও অবহেলার গণ্ডী পার হইতে পারিবে না, ততদিনই তাহাদিগের ক্ষোভ, দুঃখ ও অবমাননা হিন্দুসমাজের লজ্জা, দুঃখ ও দৈন্যের কারণ হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ	সমগ্র হিন্দুর সংখ্যায় প্রতি হাজারে অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা
* বর্দ্ধমান	৫০৬
* খুলনা	৬৫৪
২৪ পরগণা	৪৭৭
* যশোহর	৫২৭
বাঁকুড়া	৪৪০
* বীরভূম	৫৭০
পূর্ব্ববঙ্গ	
* বাখরগঞ্জ	৫২৪
ঢাকা	৪১৮
মৈমনসিংহ	৪০৮
* ফরিদপুর	৬০২
ত্রিপুরা	৩২৩

তারকা-চিহ্নিত জেলাগুলিতে অনুন্নত হিন্দুশ্রেণীর সংখ্যা সমগ্র হিন্দুর অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী।

অনুন্নত হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষার অভাব

উল্লিখিত তালিকাগুলির আসল মর্ম্ম বুঝা যাইবে যখন আমরা হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ ও অনুচ্চ হিন্দু জাতির বৃদ্ধির অনুপাতের সঙ্গে তাহাদিগের শিক্ষার পরিমাণের তুলনা করিব।

	১৮৮১	১৯৩১	শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ	শতকরা ৭ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক শিক্ষিতের পরিমাণ
ব্রাহ্মণ	১০.৮ লক্ষ	১৪.৫ লক্ষ	৩৩	৪৫
কায়স্থ	১০.৫ ,,	১৫.৫ ,,	৪৭	৪০
বৈদ্য	৭০ হাজার	১ লক্ষ ১০ হাজার	৫৭	৬৩
মাহিষ্য	২০ লক্ষ	২৩.৮ লক্ষ	১৮	১৮
নমঃশূদ্র	১৫.৭ ,,	২১ ,,	৩১	৮
রাজবংশী	৯ ,,	১৮ ,,	১০০	৫
				শতকরা ৫ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক শিক্ষিতের পরিমাণ
হিন্দু	১৮০.৭ লক্ষ	২২২ ,,	২৩	১৬
মুসলমান	১৮৪ ,,	২৭৮ ,,	৫১	৭

গত ৫০ বৎসরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রত্যেকের সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ হইয়াছে। বৈদ্যের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার হইতে বাড়িয়া এখন ১ লক্ষ ১০ হাজার হইয়াছে। এই তিনটি জাতি সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত এবং সকল ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অলোচনায়, বিদ্যায় ও চাকুরিতে, রাষ্ট্রিক আন্দোলন ও ব্যবসায়ে ইহাদিগের প্রবল প্রতিপত্তি। কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষা মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও রাজবংশীদিগের সংখ্যা

অনেক অধিক এবং তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি অনুপাতেও কম নয়। ৪৪ লক্ষ হইতে তাহারা এখন সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছে ৬২ লক্ষ,—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মোট সংখ্যার দ্বিগুণ। বলা বাহুল্য, এই সকল অনুচ্চ জাতিদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আদৌ বিস্তৃত নয়।

ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও বাংলায় এমন অনেক অনুচ্চ জাতি আছে, যাহারা এখন শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং সমাজ-বিন্যাসে বহু নীচে। অনুমিত হয় বাংলাদেশে ১৫০ লক্ষ বাঙালী, উচ্চজাতির অনুশাসনে অপাংক্তেয়, অবনত ও অস্পৃশ্য। তাহারাই বাংলার কৃষি, মৎস্যের ব্যবসায় ও নানা প্রকার কুটীর-শিল্প বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও হ্রাস বিপ্লবের কারণ

দেখা যায় যে, বাংলায় মুসলমান ও যে অনুচ্চ হিন্দুজাতির সংখ্যা অধিক, তাহারাই দ্রুত বাড়িতেছে এবং তাহাদিগের মধ্যেই অশিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটিত। শুধু বৈদ্যদিগের বংশবৃদ্ধির অনুপাত অধিক, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা অত্যন্ত কম। মাহিষ্য ও নমঃশূদ্রেরা প্রত্যেকে সংখ্যায় প্রায় বৈদ্যদের বিশ গুণ। সকল হিন্দু ধরিলে শিক্ষিতের সংখ্যা (৫ বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক শিক্ষিতের সংখ্যা) দাঁড়ায় শতকরা ১৬, মুসলমানের শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৭ মাত্র। ২০ বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে শতকরা ২৯, মুসলমান শিক্ষিতের মাত্র ১৪। মাহিষ্য ও নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা সাধারণ হিসাবে কম হইলেও মুসলমানের অপেক্ষা অধিক।

এই তুলনামূলক আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, বাংলার আগামী যুগ বাংলার অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী লোকের হঠাৎ সংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ইতিহাসের ধারা যে একেবারে বদলাইয়া দেয়, তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ মিলিবে মিসর, সিরিয়ার দাসশ্রেণী ও উত্তরাপথের গথ ও বর্ব্বর সম্প্রদায়ের প্রাবল্যে রোমীয় সভ্যতার অধঃপতনের ইতিহাসে। বাংলার নাগরিক সভ্যতার যে পরিপাটী চাকচিক্য, যে শালীনতা, উদারতা ও শোভনতা আছে, যে অঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুজাতির প্রাবল্য, সেখানে সে-সভ্যতা কি করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে? মুসলমানের যেখানে প্রাধান্য, সেখানে বাংলার চিন্তাধারা ও সাহিত্যের প্রগতি অক্ষুন্ন থাকিবে কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসার সহিত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার প্রতিষ্ঠা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত থাকিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলার জাতি ও সমাজ-বিন্যাস

বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ বাংলায় সীতারাম রায়ের নেতৃত্বে মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারদিগের সম্মিলিত জীবনপণ বিদ্রোহ যখন বিফল হইল, এবং ঐ বীর যোদ্ধা যখন মুর্শিদাবাদে বন্দী হইয়া নীত হইলেন, হিন্দু বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রদীপের শেষ শিখা তখন ভাগীরথী-জলে নির্ব্বাপিত হইল।

১৭১২ সালে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ সালেই আজিম ওস্মানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি বাংলার নবাব হন। তাহার পর ৫০ বৎসরের মধ্যেই মুসলমানের পরিবর্ত্তে ইংরাজ-শাসনের সূত্রপাত আরম্ভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার মাটি ও নদীর প্রচণ্ড বিপ্লব দেখা দিল। হিন্দু-প্রধান মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে নদ-নদীর গতি হ্রাস ও রোধ, এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে নদীর বিপুলতর প্রবাহ ও ভাঙ্গা-গড়া, বাংলার সমাজকে নূতন করিয়া ভাঙ্গিতে ও গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নদ-নদীর বিপর্য্যয়ের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলায় হিন্দুর অবনতি ও মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের সূচনা হইয়াছিল। ইংরাজ আমলে যখন প্রথম বাংলায় লোকগণনা হয়, তখন হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৮৭১

সালে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৮১ লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৭৬ লক্ষ। ১৮৮১ সালে মুসলমানেরা বাড়িয়া ১৮৪ লক্ষ হইল, হিন্দুরা কমিয়া ১৮০·৭ লক্ষ হইল। সেই হইতেই মুসলমানের সংখ্যার প্রাধান্য দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে।

কি পরিমাণে বাংলার বিভিন্ন অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমান বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।

সমগ্র লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা পরিমাণ

পশ্চিম বঙ্গ	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	৮৪	৮৩	৮৩	৮২	৮২	৮৩
মুসলমান	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪
মধ্যবঙ্গ—						
হিন্দু	৫০	৫০	৫০	৫০	৫১	৫১
মুসলমান	৪৯	৪৯	৪৯	৪৮	৪৭	৪৭
উত্তর বঙ্গ—						
হিন্দু	৪০	৪০	৩৯	৩৭	৩৫	৩৬
মুসলমান	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬১
পূর্ব্ববঙ্গ—						
হিন্দু	৩৬	৩৪	৩৩	৩১	৩০	২৮
মুসলমান	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭০	৭১

১৮৮১—১৯৩১ শতকরা বৃদ্ধি

	পশ্চিম বঙ্গ	মধ্যবঙ্গ	উত্তর বঙ্গ	পূর্ব্ববঙ্গ	সমগ্র বাংলা
হিন্দু	১৫·৪	২৬·৭	১৩·১	৩৮·৯	২২·৯
মুসলমান	২৭·৭	১৭·৪	২৭·১	৮৭·৫	৫১·২

উহার কারণঃ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বনাম সমাজের কুসংস্কার

একমাত্র মধ্য বঙ্গেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার কম। হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে একমাত্র মধ্য বঙ্গেই। কৃষির দুর্দ্দশা ও ম্যালেরিয়া মহামারী এখানে মুসলমানদিগকে সংখ্যায় বাড়িতে দেয় নাই। খুলনা ও ২৪ পরগণা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও বর্দ্ধিষ্ণু। এখানে পোদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সতেজ হিন্দু জাতিরই প্রাধান্য। অপর দিকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর অঞ্চলে যেখানে মুসলমানের আধিক্য সে-অঞ্চল ম্যালেরিয়া-পীড়িত ও ক্ষয়িষ্ণু। তাহা ছাড়া কলিকাতা ও ভাগীরথী-তীরে শিল্পপ্রধান সহরগুলিতে হিন্দু শ্রমিক ও ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে অনেক আসিয়া বসবাস করিতেছে। মধ্য বঙ্গ ছাড়া অন্য সব অঞ্চলেই মুসলমানের বিপুলতর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব অঞ্চলে মুসলমানের বৃদ্ধির হার (৮৭·৫) জগতের উপনিবেশ ও কৃষির ইতিহাসে অসাধারণ। পশ্চিম বঙ্গ ক্ষয়িষ্ণুতম, এখানে বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিন্দু

বৃদ্ধির বিষম অন্তরায়। যেখানে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুইই বর্ত্তমান, —যেমন উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ,—সেখানে হয় হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন, ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে অবস্থানের জন্য, অথবা বহু বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির অপ্রচলনের জন্য, মুসলমানের মত সমান হারে বাড়ে নাই এবং মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে বরং কমিয়াই গিয়াছে।

নদনদীর গতি ও জল সরবরাহের ওলটপালটের জন্য ৫০ বৎসরে মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশের যে পরিবর্ত্তন হইল তাহার ফলে ক্রমে প্রাকৃতিক বিধানে যেন হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক অঞ্চলেই বসবাস সূচিত হইতেছে। কোন সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধে নয়, প্রকৃতির শাসনে ও অনুশাসনেই ইহা হইতেছে। ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গ হইতে মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া বাস করিতেছে না, এবং হিন্দুরাও উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেছে না। প্রকৃতি ও কৃষির পরিবর্ত্তনের জন্যই মুসলমান-প্রধান জেলাগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অতি দ্রুত হিন্দুর সংখ্যা অতিক্রম করিয়া বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে যেখানে হিন্দুর প্রাধান্য পূর্ব্বে ছিল, সেখানেও হিন্দুর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার হ্রাস হইতেছে। হিন্দুর মোট লোকসংখ্যা হিসাবে অনুপাত কমিতেছে প্রায় সর্ব্বত্র; এবং অস্বাস্থ্যকর জেলাগুলিতে উহা শোচনীয়ভাবে কমিয়াছে।

১৮৭১—১৯৩১ সালের মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুরে মোট লোকসংখ্যা হিসাবে হিন্দু কমিয়াছে শতকরা ৮·৩, ১১·২ ও ৫·৬।

৬০ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে খুব বেশী রংপুর, পাবনা, মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায়, মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ১১, ৭.১, ১১.৮, ১১২ এবং যে সকল জেলায় হিন্দু খুব কমিয়াছে অথচ মুসলমান বাড়িয়াছে তাহাদিগের মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৭.৭, ১০.৪, ৭.৯। একমাত্র মধ্যবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর আধিক্য শতকরা ৯.৩ বাড়িয়াছে। ক্ষয়িষ্ণুতম পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক দূর হটিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হিন্দু-মুসলমান-সংখ্যার অসমতার প্রধান কারণ হইলেও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের কারণকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানপ্রধান ও নমঃশূদ্রপ্রধান জেলাগুলির অত্যুন্নতি এবং উচ্চ হিন্দুপ্রধান মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সভ্যতা. আচার, নিয়ম ও আদর্শ যে রূপান্তরিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি হইতে মুক্তি, প্রচুর আমিষাহার, বনজঙ্গল ও জলাভূমির জীবনধারা ও কৃষির বিস্তার, নূতন ঔপনিবেশিক-সুলভ আগ্রহ ও শ্রমশীলতা, বাংলা দেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে, যমুনার চরে, পদ্মাতীরে, মেঘনার মোহানায় তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে থাকিবে। সেখানকার মুসলমান

বা নমঃশূদ্র কৃষক যেমন পরিশ্রমী, তেমনি সাহসী। উন্মত্ত ঝটিকা বা বন্যার আক্রমণে ত্রস্ত না হইয়া সে তাহার ফসল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যমুনা বা মেঘনার চরে হিংস্র পশুর সঙ্গে রাত্রিবাস করে। দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দরবনে ও পূর্ব্ব-অঞ্চলে আসামের উপত্যকায় সে কুঠারহস্তে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়, নিবিড় জঙ্গল ভূমিসাৎ করিয়া সে রাস্তা বাহির করে, চাষ-আবাদের প্রবর্ত্তন ও বসতি স্থাপন করে। জলে কুমীর ও স্থলে বাঘের সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংগ্রাম। যেখানে নদীচরে সে শস্য উৎপাদন করে, সেই জনবিরল বিপৎসঙ্কুল স্থানে হয়ত স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করা অসম্ভব, তাই সে দিনের কাজ শেষ করিয়া নির্ভয়ে সীমাহীন পাথারে তরী ভাসায়, নিঃশঙ্কচিত্তে ভগবানের নাম লইয়া সে তুফানকে অগ্রাহ্য করে। তাহার তুলনায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কৃষক অলস, বিলাসী, ও ক্ষীণপ্রাণ।

কিন্তু উদ্যম, সাহস ও লোকবৃদ্ধি যেমন জাতিকে সতেজ রাখে, তেমনি তাহার চাই শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার। পূর্ব্ব-অঞ্চলে কৃষি উন্নতিশীল, পরিবার লোকবহুল, জনপদও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু।

কিন্তু সংখ্যা বাড়িলেই কি সম্পদ ও কৃষ্টির পরিপুষ্টি হয়? বরং কৃষক ও বর্গাদারের অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পদের বিঘ্ন, এবং সমাজের অনৈক্য ও অশান্তির কারণ; সমগ্র প্রদেশে উচ্চ ও শিক্ষিত স্তর অপেক্ষা নিম্ন ও অশিক্ষিত স্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি কৃষ্টিরও অন্তরায়—ধর্ম্ম, জাতি ও বিদ্যাভিমান ভুলিয়া বাঙালী এই নিছক সত্যটি গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই শেষরক্ষা হয়। হিন্দুর উচ্চজাতি সমুদায়ের এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব।

উচ্চজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা, নিম্নজাতি ও মুসলমান অর্ব্বাচীন বলিয়া অধিকতর শক্তিমান্ ও প্রজননশীল

উচ্চজাতিদিগের মধ্যে যে সকল কুপ্রথা তাহাদের বংশবৃদ্ধির অন্তরায়, সেগুলিকে বিনা দ্বিধায় সত্বর বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ এবং বিধবাদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া জীববিজ্ঞান যে নিকট যৌন সম্বন্ধের কুফল ভয় করে, তাহা দেখা দিয়াছে।

হিন্দুর সমাজ-বিন্যাসে যে-শ্রেণী ব্রহ্মণ্য সভ্যতার মাপকাঠি অনুসারে উচ্চ সোপানে রহিয়াছে, তাহার স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির অনুপাতে কম, এবং যে-শ্রেণী নিম্ন সোপান অধিকার করে, তাহাদিগের মধ্যে এই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। পুরাতন জাতি মাত্রেই অধিকতর সংখ্যায় পুরুষের জন্মদান করে। ইহা একদিকে যেমন তাহার যুদ্ধ-বিগ্রহের রক্ষাকবচ, অপর দিকে শান্তির সময় ইহাই আবার তাহার বংশহানি ও ধ্বংসের সূচনা করে। পক্ষান্তরে আদিম জাতিরা—প্রকৃতির সহিত গাছপালা ও মাটির সহিত যাহাদিগের শক্তির সহজ আদান-প্রদান হয়, যাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কৃত্রিমতা ও সমাজশাসনের নির্ম্মম দৃঢ়তা অধিক প্রবেশ করিতে পারে নাই,—তাহাদিগের যেমন প্রজনন-শক্তি অধিক, তেমনি তাহাদিগের মধ্যে বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোকের অভাব ত দৃষ্টই হয় না, অধিক ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যই দেখা যায়। বাংলার মুসলমানেরা বেশীর ভাগই সমাজের নিম্নস্তরে সেই আদিম বীর্য্যবান্ কর্ম্মঠ জাতি সমুদায় হইতে উদ্ভূত। একই কারণে তাহাদিগের মধ্যেও

বাংলার অতিসভ্য উচ্চজাতির ন্যায় বিবাহযোগ্যা স্ত্রীজাতির সংখ্যাল্পতা দেখা যায় না।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটিতে উচ্চ ও অনুচ্চ হিন্দু জাতির ও মুসলমানের মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যার বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল।

	প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের অনুপাতে বিধবার সংখ্যা
সাঁওতাল	৯৮৪	১৩৬
কোচ	৯৪৯	১৪৯
বাউরি	১০১৭	১৯৪
ডোম	৯৬৫	২০৩
নমঃশূদ্র	৯৬৪	২১৭
মুসলমান	৯৫৮	১৪০
মাহিষ্য	৯৫২	২৪৩
সাহা	৯৫০	১৯৬
বৈদ্য	৯২২	১৫৮
কায়স্থ	৯০১	২০০
ব্রাহ্মণ	৮৪৭	২০০

হিন্দুর বিবাহবিধির সংস্কার জাতিক্ষয় নিবারণের প্রধান উপায়

সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায় মিলিয়া বাংলাদেশের প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৪। বাংলার উচ্চজাতি তিনটিতেই

স্ত্রীলোকের সংখ্যা এই গড় সংখ্যা অপেক্ষা কম। সমস্ত হিন্দুজাতি ধরিলে স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ২২৬, কিন্তু মুসললান বিধবার সংখ্যা মোট ১৪০। উচ্চ ও অর্দ্ধোচ্চ হিন্দু জাতিগুলি বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়া স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক সংখ্যাল্পতার কুফল আরও অধিক প্রকট করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে বহু বিধবা পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুজাতি সমুদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ অনেক কম প্রচলিত। অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যাকে উচ্চপণে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া বহু পুরুষ যৌবন অতিক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু পুরুষ প্রৌঢ়কাল পর্যান্ত সহরে উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। সেখানে চারিদিকেই নিঃসঙ্গ যুবার পাপপথের প্রলোভন রহিয়াছে, অথচ তাহার পক্ষে সমাজ-শাসনের কোন বাধা বা নিষেধ নাই। বিবাহের জন্য অল্পবয়স্ক বালিকাকেও সে গ্রহণ করে। তাহাও বংশবৃদ্ধির অন্তরায়। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও পণপ্রথা বাস্তবিক পক্ষে অনুচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে পাপাচার, বন্ধ্যাত্ব ও ভ্রূণহত্যাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছে। সব দিক হইতেই জাতিক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত।

তাহা ছাড়া বিবাহের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হওয়াতে ও বহুবিবাহের প্রচলনে, পুরুষের মধ্যে অবিবাহিতেরও সংখ্যার অনুপাত মুসলমান অপেক্ষা অধিক।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক নির্ব্বিশেষে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রত্যেক বয়সে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক। বিধবার সংখ্যাও হিন্দুর অপেক্ষা কম।

শতকরা সমান বয়স ও যৌবন অবস্থায় পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা

হিন্দু

বয়স	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
সকল বয়স	৫৭	৯০	৪৫২
০—১০	৮৫	৪১৯	৮৮৫
১০—১৫	৪৫	৪৯২	১২৮৮
১৫—৪০	৭	৯৯	৬২৫
৪০ বা ততোধিক	১৬	৩০	৩৭২

মুসলমান

বয়স	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
সকল বয়স	৬৩	৯৯	৫৯০
০—১০	৮৩	৩২২	৫৩৬
১০—১৫	৪৫	৩১৪	৫৬১
১৫—৪০	৯	১০৭	৫৩০
৪০ বা ততোধিক	৩৬	২৯	৬২৯

বিবাহের গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা হেতু অন্তর্বিবাহের দোষে লোকবৃদ্ধির ক্ষতি এবং বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশে ও শাখায় গুণক্ষয়ও দেখা গিয়াছে।

উচ্চজাতির আত্মঘাত

উচ্চজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, ও অন্যান্য নানা প্রকার বিভাগ-বর্জ্জন অত্যাবশ্যক। বিধবাবিবাহ প্রচলনও অতি প্রয়োজনীয়। একশত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশজন বিধবা, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে মাত্র ১৪ জন। উচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে বৈদ্যগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচারের সঙ্কীর্ণতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর।

প্রাচীন এথেনীয়গণ ও বাঙালীদের ধ্বংসের তুলনা

যেভাবে বাংলার উচ্চজাতিগুলি এইযুগে প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে, যেভাবে তাহাদিগের আদিম বাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহারা যেভাবে দারিদ্র্য ও ব্যাধির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে নির্দ্দেশ করা যায় যে, সমাজ-সংস্কারের একটা চরম চেষ্টা না করিলে তাহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন এথেনীয়দিগের সহিত তাহাদিগকে অনেক বিদেশী পণ্ডিত তুলনা করিয়াছেন। এথেনীয়গণ তাহাদের শেষ দশায় ম্যালেরিয়ার দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়াছিল এবং দাসশ্রেণী ও রোমক বর্ব্বরগণ দেশ ছাইয়া ফেলিয়া তাহাদিগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। তাহাদিগেরই মত, বাংলার যখন চারিদিকে অনুচ্চ হিন্দু ও অশিক্ষিত মুসলমান নূতন সম্পদ ও রাষ্ট্রবলে বলীয়ান্ হইয়া তাহাদিগের পুরাতন

অধিকার করায়ত্ত করিতে থাকিবে তখনই পুরাতন ভদ্রলোকশ্রেণী ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, অসংখ্য বিধি-নিষেধের দ্বারা শতধা খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া, দারিদ্র্যমোচন ও অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভাবনে অশক্ত হইয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে। এই ভীষণ অসাম্যমূলক সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় যাহাদিগের বীর্য্যবত্তা ও জীবনীশক্তি কম, শিক্ষা ও শোভনতার কৃত্রিম বর্ম্ম তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। সংখ্যায় যাহারা অধিক, কায়িক পরিশ্রম ও শিল্পকৌশলে যাহারা গরীয়ান্, রাষ্ট্রবলে যাহারা বলীয়ান্ ও আত্মম্ভরি, তাহারা ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য অনুশোচনা করিবে না, হইলই বা তাহারা বংশপরম্পরা হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী, হইলই বা ইহারা তাঁহাদিগেরই বংশধর যাঁহারা বাংলাদেশ হইতে সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহারা নব্য ন্যায় ও বিচিত্র মরমিয়া সাধনের অগ্রদূত, যাঁহাদিগের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশ্বচিন্তার একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং যাঁহারা এই আধুনিক কালেও ভারতের নবচিন্তা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গুরু ও নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছেন। এ সকল কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিমন্তের দল কি ভাবিয়া দেখিবে?

শিক্ষাসংস্কার এবং ভদ্রলোকের ভূমি-কর্ষণ ও কায়িক শ্রম স্বীকার

তাই বলিয়াছি উচ্চজাতির সমাজ সংস্কার বাংলার কৃষ্টির ধারা রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। নূতন রাষ্ট্রবিন্যাসে জমিসংক্রান্ত আইন-কানুন

অচিরেই পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। যে-কোন কৃষিপ্রধান, লোকবহুল দেশে এক অলস কর্ম্মবিমুখ শ্রেণী শুধু স্বত্বাধিকারের অজুহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বেই বাংলার যেসব জেলায় মুসলমান বা নমঃশূদ্রের প্রাধান্য, কৃষকশ্রেণী নির্ভীক ও পীড়ন-অসহিষ্ণু, সে-সব জেলায় জমিদার ও জমিদারের আমলাশ্রেণীর সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে।

শতকরা জমিদার ও আমলার সংখ্যা
অনুপাতে কৃষকের সংখ্যা

রংপুর	৩২৬৫
দিনাজপুর	২২৬৮
ত্রিপুরা	২১৭৪
ঢাকা	১৭৪৬
নোয়াখালী	১৫৪৪
যশোহর	৯৯৪
বর্দ্ধমান	৯৩৩
বাঁকুড়া	৪১৯

বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় নিরীহ প্রজার পোষ্য অনেক আ.খ্যা। জমিদার গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহাদিগেরই উপর খাজনা আদায়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। এই সব জেলায় কৃষিকার্য্যেও আদিম মুণ্ডা, ও সাঁওতাল জাতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি হেতু আদিম জাতির বাহুবল চাষবাসে একটা বড় রূপান্তর আনিবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় রূপান্তর

আসিবে ভূমির স্বত্বাধিকার বিষয়ে। ভাগবিলি, জোতস্বত্বের রেহান ও ভোগদখল এবং ভূমির লেনদেন বিষয়ে সর্ব্ব প্রথমেই সংস্কার অতি প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী ভাগচাষের আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে, বিনা মূলধনে বিনা তত্ত্বাবধানে, জোতস্বত্ব ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের জোতদার কৃষকও শ্রমবিমুখ, ভদ্রলোক সাজিয়াছেন। তিনিও জমি বিলি করেন, মজুর লাগান, ভাগে ফসল ভোগ করেন। পূর্ব্ব অঞ্চলে ভূমিস্বত্বের অংশীকরণও জমির ব্যবস্থায় কম অসুবিধা আনে নাই। ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ভূমিকর্ষণের দায়িত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত। এ দায়িত্ব বাংলার ভদ্রলোকশ্রেণী গ্রহণ করে নাই। বাংলার ভবিষ্যৎ আইন-কানুনে এ দায়িত্ব স্বীকার না করিলে যে-শ্রেণী এখন ভূম্যধিকারী, তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অথবা জনসমাজ-শাণিত 'আইন-খড়্গের এক কোপে বিনষ্ট হইতে হইবে। সমাজ-সংস্কৃতি না হইলে মাঠের কাজে, কারখানায়, দোকানে, আড়তে ভদ্রলোকশ্রেণী হটিয়া যাইবে। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে মারোয়ারী ও ভাটিয়ার আধিপত্যের মূল কারণ, বাঙ্গালার ভদ্রলোকের পরিশ্রমকাতরতা। তাই কলিকাতা নগরীর বিরাট সম্পদ বিদেশীরই করায়ত্ত। নব-নাগরিক সভ্যতা বিদেশীর রোশনাই,—"পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমির তুমি সে তিমিরে।" মূলকথা এই—যে কায়িক পরিশ্রম এতদিন বাঙ্গালী ভদ্রলোক অভদ্রোচিত জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার নিরর্থকতা ও বিফলতার যুগে তাহাকেই জীবনরক্ষার একমাত্র সহায় ও সম্বল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজনীতি নহে, মানবিকতাই হরিজন আন্দোলনের মূলশক্তি

শুধু নিজের ঘরে, পরিবারে ও গোষ্ঠীতে সংস্কৃতি হইলে চলিবে না। উচ্চজাতির সহিত প্রতিবেশী অনুচ্চজাতি ও মুসলমানের সামাজিক আদান-প্রদান, আচার-নিয়মেরও আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। মহাত্মা গান্ধী জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া যে হরিজন-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া যদি উহা সত্যসত্যই উদারতর নীতি ও মানবিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাজনীতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে, তবেই রক্ষা। যে সব জাতি এখন অস্পৃশ্য রহিয়াছে,--যেমন ডোম, হাড়ি, কেওড়া, লালবেগী, মেথর, ভুঁইমালি, চামার প্রভৃতি,—তাহাদিগকে বাসগৃহের অন্দরে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার দান করিতে হইবে। তাহাদিগের মধ্যে বাংলাদেশ জুড়িয়া একটা পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন জাগাইতে হইবে। সকল অনুচ্চ ও পতিত জাতির পাড়ায়-পাড়ায়,—যেখানে, এখন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলে জাতিচ্যুতির ভয় আছে, সেখানে,--নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। দেশ জুড়িয়া মদ্যপান নিবারণ, সার্ব্বজনীন পূজা, সার্ব্বজনীন জলাচরণ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মারফতে তাহাদিগের সংস্কার ও অখাদ্যনিবারণ, দীক্ষাদান—এই সকল উদ্দেশ্যে বাংলার উচ্চজাতীয়গণকে সকল কপটতা ত্যাগ করিয়া গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সহিত মূঢ়, মূক, অশুচি নারায়ণের নামে কাজে নামিতে হইবে।

বাংলাদেশ বহুশতাব্দী ধরিয়া পার্ব্বত্য, যাযাবর ও নীচ অনার্য্য-জাতির শিক্ষা ও সংস্কারের ভার লইয়াছে। কত অনার্য্যশ্রেণী ব্রহ্মণ্য

সভ্যতাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে এই সংস্কারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দুর সামাজিক স্তর-বিভাগের উচ্চ-নীচতা এই ধীর সংস্কার পদ্ধতির বিভিন্ন ক্রম বা পর্য্যায় নির্দ্দেশ করে। দেশ যখন স্বাধীনতা হারাইল, তখন হইতেই এই সহজ শিক্ষা ও সংস্কার-কার্য্য বাধা পাইল। তখন হইতেই যত প্রকার অস্বাভাবিক স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের সূচনা। নূতন শিক্ষা ও প্রজাতন্ত্রের দিনে হিন্দু-সভ্যতার এই প্রচ্ছন্ন প্রচারশক্তিকে পুনঃ প্রবুদ্ধ করিয়া দেশময় যে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অনুচ্চ বা পতিত জাতি আছে, তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে টানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রিক নির্ব্বাচন-প্রণালী যে নূতন ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, তাহা উদারতর নীতি ও অভিনব সমাজবিন্যাস ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে।

বিবাহ সংস্কার

ধর্ম্মগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত সর্ব্ববিধ সামাজিক বিচ্ছেদকে প্রশ্রয় না দিয়া সমগ্র বাংলাদেশে এমন একটা শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আনিতে হইবে যাহাতে মুসলমান, মাহিষ্য, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র বাংলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে না টানিয়া বরং তাহা যুগ-পরম্পরার্জ্জিত জাতির প্রগতিরই পুষ্টি সাধন করিতে পারে। হিন্দু-জাতির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রবর্ত্তন ও উচ্চ-নীচ জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ডীর বিস্তার, সর্ব্বপ্রকার কায়িক শ্রম ও শিল্পানুশীলনের অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন

ও পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ,—দূরদৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা শুধু হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আত্মরক্ষার সুনিশ্চিত পথ।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বিবাহ রেজিষ্ট্রি

বাঙ্গালী সমাজে কি হিন্দু কি মুসলমানের আর একটি আত্মরক্ষার পথ হইতেছে সরকারী দপ্তরে বিবাহ ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ রেজিষ্ট্রি করা। পূর্ব্বে রাষ্ট্র আমাদের দেশের সমাজ বিন্যাসে অধিক হাত দেয় নাই। আধুনিক শাসন-ব্যবস্থায় ধর্ম্মই ভোট দিবার অধিকার দিতেছে। বাঙ্গালী বলিয়া নয়, হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া, আমরা রাষ্ট্রিক অধিকার পাইয়াছি। এই পদ্ধতি জাতীয়তা বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু যখন ইহাকে অবলম্বন করিতেই হইয়াছে, তখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণকে একটা রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান বলিয়া মানিতেই হইবে। কোন ধর্ম্ম-পারিবর্ত্তন সরকারী দপ্তরে রেজিষ্ট্রি না হইলে মঞ্জুর হওয়া উচিত হইবে না। ইহাও আইন হওয়া উচিত যে অন্ততঃ ১৮ বৎসর পূর্ণ না হইলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কোন পুরুষ বা নারীর থাকিবে না। এমন কি, ঐ বয়সটি বাড়াইয়া ২১ বৎসর করিলেও অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন শিল্প-প্রণালী ও নাগরিক জীবন যেভাবে আমাদিগের পঞ্চায়েত শাসন, গোষ্ঠী ও জাতির প্রভাব ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ নষ্ট করিয়া দিতেছে সেক্ষেত্রে যৌন জীবন ও পারিবারিক জীবনের শুদ্ধি রক্ষা কল্পে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহে রেজিষ্ট্রির প্রচলন হইলে বহু

বিবাহ ও অবৈধ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইবে। পাট ও তুলা সম্বন্ধীয় নূতন শিল্প-প্রধান গ্রাম ও সহর সমুদায়ের যৌন জীবন এখন এতই পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এ সকল গ্রামে ও সহরে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে এত অধিক তারতম্য দেখা দিয়াছে যে, আইনানুমোদিত দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শীলতা রক্ষা করা সুকঠিন।

নারী-হরণের প্রতিরোধ

একই ধর্ম্মানুলম্বী পতি ও পত্নী হইলে নারীর ১৪ বৎসরে বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন আইনবিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু পতি বা পত্নী বিবাহের পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী থাকিলে ধর্ম্মান্তরগ্রহণ এবং বিবাহ সম্বন্ধের সম্মতির বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হওয়া উচিত। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অনেক বিভাগে বিবাহে সম্মতির বয়স ১৮। অন্তর্জ্জাতি-বিবাহেও সম্মতির বয়স ১৮ হওয়া উচিত। এখনকার আইনে নারীহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত কেবল পুরুষ খালাস পাইতে পারে, যদি হৃতা বা অত্যাচারিতা নারীর বয়স ১৬ বৎসর বা ততোধিক হয় এবং তাহার সম্মতির প্রমাণ হয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের মত, সম্মতির বয়স বাড়াইয়া অন্ততঃ ১৮ বৎসর করা উচিত এবং যদি প্রলুব্ধক বিবাহিত পুরুষ হয় তাহা হইলে তাহার ইতালির আইনের মত শাস্তিবিধান নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই উপায় অবলম্বন করিলে একদিকে যেমন নারী-রাখা প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহ সমাজে স্থান পাইবে না, অপরদিকে বাংলার সমাজের প্রধান কলঙ্ক নারী-নির্য্যাতনেরও অনেকটা প্রতিকার

হইবে। বাংলায় ক্রমবর্দ্ধমান নারীহরণের তালিকা সামাজিক রীতি-নীতির ব্যর্থতার নির্ম্মম উপহাস। দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনে রেজিষ্ট্রির প্রয়োজন হইলে নারীহরণ অনেক কমিবে। বিবাহের রেজিষ্ট্রির সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর স্বকীয় ধর্ম্ম ও নিজধর্ম্মগত আইন বজায় রাখিবার স্বাধীনতা থাকিবে। জাপানে ও কানাডায় এই প্রকার বিধিব্যবস্থা অনেকটা সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণের উপায় হইয়াছে। নারীহরণ সম্বন্ধে তালিকা পড়িলে জানা যায় যে, নির্য্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৩৭-৩৮ সালে হিন্দু নারীর নির্য্যাতনের মোট অভিযোগ সংখ্যা ছিল ১৪০, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের নারীর নির্য্যাতনের মোট সংখ্যা ছিল ৪১০। মুসলমান নারীহরণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং যে সকল জেলা মুসলমানপ্রধান তাহারা এই অপরাধে অধিকতর কলঙ্কিত। বিবাহে রেজিষ্ট্রির প্রচলন হইলে নারীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হরণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অথবা স্বগৃহে পৈশাচিক অত্যাচার অনেক কমিয়া যাওয়া সম্ভব। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে জর্জ সৈয়দ আমীর আলীর প্রস্তাবের কথা তুলিয়াছেন যে, দলবদ্ধভাবে যাহারা নারীধর্ষণ করে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত, নতুবা এই দুর্ব্বৃত্ততার উচ্ছেদ-সাধন করা বড়ই কঠিন। অষ্ট্রেলিয়াদেশে কিছু দিন পূর্ব্বে গুণ্ডারা দল বাঁধিয়া নারীদিগের উপর অত্যাচার করিত। ঐ দেশ আইন পরিবর্ত্তন করিয়া নারীধর্ষণের অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ড দিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই এইরূপ কুকর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া দিয়াছে। পুরাতন মুসলমান নীতিশাস্ত্রে এইরূপ নারীধর্ষক

ব্যভিচারীর দণ্ড ছিল লোষ্ট্র নিক্ষেপে প্রাণবধ। সুতরাং যে-ক্ষেত্রে মুসলমান নারীরাই অধিকতর নিপীড়িত সে-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের নারীর মর্য্যাদা ও পারিবারিক জীবনের শুচিতা, শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে নারীবিষয়ক অপরাধ সম্বন্ধে অতি কঠোর আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করিলে সবদিক রক্ষা হয়।

পারিবারিক শুচিতা ও নারীর মর্য্যাদা

বাংলার কোন-এক জেলায় যদি একটা নারী লাঞ্ছিত হয় এবং অপরাধী যদি খালাস পায় বা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পারিবারিক নীতির একটি গ্রন্থি অলক্ষিতে শিথিল বা ছিন্ন হয়, এবং সমগ্র সমাজেরই অকল্যাণ হয়। গত বৎসরে নারী-নির্য্যাতনের মোট ৪১০টি মোকর্দ্দমার মধ্যে শাস্তি হইয়াছে কেবল ১২৭ টাতে ; খালাস তাহা অপেক্ষা বেশী,—১৪৮ টাতে। বাকীগুলা এখনও বিচারাধীন বা অন্য কিছু। হিন্দু নারীদিগের অভিযোগ ছিল ১৪০ টা ; তাহাতে সাজা হয় ৫২ টাতে, আসামীরা খালাস পায় ৫৩ টাতে। এতগুলি অভিযুক্ত লোকের খালাস কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই হিতকর নহে। মুসলমানের শিক্ষা ও নীতি যতই এক বিবাহের পবিত্রতা ও সংযমের দিকে অগ্রসর হইবে, যতই মুসলমান-নারীর শিক্ষা ও প্রগতির সঙ্গে তাহার নৈতিক অধিকার পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই পারিবারিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের আদর্শের বৈষম্য কমিতে থাকিবে এবং তখন হিন্দু মুসলমান মিলিয়া সমাজ-রক্ষা ব্রতে এক প্রাণে উদ্যোগী হইতে পারিবে। বহুবিবাহ-বর্জ্জন ও দাম্পত্য-সম্বন্ধ রেজিষ্ট্রি-করণ ও নারী ধর্ষককে

প্রাণদণ্ড দান—উভয় সম্প্রদায়ের নারীর প্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ সহজ করিয়া দিবে। অন্যদিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ আইনানুমোদিত হইলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যার পরিমাণ লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে তাহারও নিরাকরণ হইবে। উভয়ের অবাধ লোকবৃদ্ধি বাটোয়ারা হিসাবে কিছু আপেক্ষিক রাষ্ট্রিক সুবিধা আনিতে পারিবে সত্য, কিন্তু তাহা সাময়িক হইবে। লোকবাহুল্য কি হিন্দু কি মুসলমানকে আর্থিক হিসাবে আরও হীন ও আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া বরং অচিরেই রাষ্ট্রিক অধিকার সঙ্কোচ করিয়া দিবে।

হিন্দু-মুসলমানের একই মাটি ও জল

বাংলার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে মুসলমানের প্রাধান্যকে ভয় করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক বৈষম্যকে বাড়াইতে দেওয়া বাঙ্গালীর আত্মঘাতের পথ। রাজনীতিজ্ঞের দূরদর্শিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ছয় শতাব্দীর নদীপথের গতি ও তজ্জনিত জাতীয় অধোগতিকে রাষ্ট্রিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা বাঙালী কি করিয়া লঙ্ঘন বা রোধ করিবে? বরং প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়কে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিবেচনার কাজ। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সামাজিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা, মহরম অথবা জন্মাষ্টমী পার্ব্বণে, এবং মুসলমানের সত্যপীর ও হিন্দুর বুড়ী মনসা ও শীতলার পূজা-অনুষ্ঠানে জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে যোগদান করিয়া সমান উদাসীনতার সহিত ইতিহাস তাহাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী পাশাপাশি স্থান দিয়াছে। এমন কি নামকরণে হিন্দু-মুসলমান প্রথা একযোগে গ্রহণ করিয়া দুই সম্প্রদায়ের

সহজ, আন্তরিক মিলন আনিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই এক মাটি ও জলে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে।

বিশ্ব-প্রকৃতি সমান স্নেহে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। ভবিষ্যৎও নিরপেক্ষভাবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ দিবে। মন ও শরীরের গঠন হিসাবে মুসলমান ও হিন্দুর কোন পার্থক্যই নাই। কারণ অনুচ্চ হিন্দুজাতি সমুদয় হইতেই বেশীর ভাগ মুসলমান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সমাজ-বিন্যাস হইতে পৃথক হইয়াছে। এই কারণে যাহাতে রাষ্ট্রিক প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের বিরোধ না বাড়ায়, তাহার জন্য স্বার্থানুসন্ধিৎসু মোল্লা বা পণ্ডিতের হস্তে সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার ভার না দিয়া বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে একটা উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবুদ্ধির অনুশীলন করিতে হইবে।

বিজয়ার সময় মুসলমান প্রবীণ হিন্দুর চরণধূলি লইবে, ঈদের সময় হিন্দু মুসলমানের পার্ব্বণে যোগদান করিয়া সকলকে প্রীতি-আলিঙ্গন করিবে। পরস্পরের আদপ-কায়দা, বিধি-নিষেধ পালন শুধু শিষ্টাচার-সম্মত নয়, ধর্ম্মের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ না ঘুচাইতে পারিলে, পূর্ব্ববঙ্গ এবং মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বিংশ শতাব্দীতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার ঘোর অন্তরায় হইবে।

অন্যদিকে যে অনুচ্চ মুসলমান ও অবনত হিন্দুশ্রেণী সমুদায় বাংলার চিন্তা ও সাধন, কৃষ্টি ও আচারকে অধোমুখী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে শুধু হিন্দু বা মুসলমান সমাজের নহে, সমগ্র বাংলারই গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে।

বাঙালী যুগনির্দ্দেষ্টা, নূতন অবদানের অগ্রদূত

পলি-পড়া উর্ব্বরা, তরল ভূমিতে বাঙালী জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালীর সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনশীল। বাংলার পূর্ব্ব-ইতিহাসের সাক্ষী ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির, প্রাসাদ কত উঠিয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে, পলি-পড়া ভূমিতে অথবা নদীগর্ভে তাহার চিহ্নমাত্রের নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ বাংলার সভ্যতাও অচল অটল নহে, গঙ্গার ঢেউয়ের মত তাহা নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যুগে যুগে চিন্তার নূতন ধারা, ধর্ম্মের নূতন আদর্শ, শিল্পকলার নূতন রীতি, সমাজের নূতন নিয়ম ও বিন্যাস গ্রহণ করিয়া বাঙালী চিরকালই ভারতের সভ্যতার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর দান ও অবদানের কথা কোন্ বাঙালীর অবিদিত আছে? বাঙালীর কি উচ্চ, কি নীচ জাতির রক্তে যে বিভিন্ন আর্য্য-অনার্য্যের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাও বাঙালীর প্রগতি ও বিপ্লববাদের সহায়। এমন মিশ্রিত জাতি ভারতবর্ষে আর কোথায়? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী ব্রাহ্মণ বেদবিরোধী বৌদ্ধভাব সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন পথে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর সার্ব্বজনীন সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম উচ্চনীচ হিন্দুজাতির সহিত মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়া নূতন সাম্যমূলক সমাজ-বিন্যাসের সূচনা করিয়াছিল। মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় শাক্ত ও সুফী, ঔপনিষদিক ও ঈশাহী সাধন সম্মিলনে বিশ্বজগতে যে এক নূতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসাধনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা জগতের

ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। রামমোহনের ধর্ম্ম ও জাতি মিলনের বিরাট কল্পনার তুলনায় বর্ত্তমান ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা কত হীন, কত জঘন্য, কত অ-বাঙালী। বাংলার যাহা লৌকিক ধর্ম্মসাধন, যাহার গুরু শত শত আউল-বাউল আজও কৃষকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও যে মানুষকে পরম পুরুষ বা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। বিশ্বের কোন ধর্ম্মে মরমীর অমন রহস্যময় আত্মবিশ্বাসের সাহস দেখা যায় নাই। বাঙালীর ভবিষ্যতের সমস্যা, এই একই প্রকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সমাজ-গঠনের সমস্যা। বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধায় বিমূঢ় না হইয়া, স্বল্প সময়ের ধর্ম্ম ও সমাজের দ্বন্দ্বে বিপর্য্যস্ত না হইয়া, বাঙালী যদি স্থিরচিত্তে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আপনার যুগপরম্পরালব্ধ সাধনের গুরু দায়িত্ব বরণ করিতে পারে, তবেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে, উচ্চ ও নীচ জাতির মিলনে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ও বর্দ্ধিষ্ণু পূর্ব্ববঙ্গের সম্মিলনে একটি অপূর্ব সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাতে হয়ত গৌড়-সপ্তগ্রাম-কলিকাতার নাগরিক সভ্যতার ঔজ্জল্য ও সমারোহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রম, সাহস ও হস্ত-কৌশলের সাহায্যে অধিকতর সতেজ, লোকবুদ্ধির সাহায্যে অধিকতর বলীয়ান্ এবং নূতন মৈত্রী স্থাপনের সাহায্যে অধিকতর গরীয়ান্ হইবে, সন্দেহ নাই।

বাঙালীর মানবিকতা

বাঙ্গালীর এই নূতন নির্নিমেষ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি চাই। নূতন বাংলা দেশ ও নূতন বাঙালীর সভ্যতা গড়িবার যুগে বাঙালী যদি অল্পদর্শী

হইয়া সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বড় করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার শতযুগের সাধনা ব্যর্থ হইবে এবং এই শতাব্দীর অবসানের পূর্ব্বেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা ভূমিতে বাঙালীজাতি শিক্ষায় ও দীক্ষায় সব রকমে অ-বাঙালী হইবে। বাংলার আগামী যুগ সমাজ-সংস্কৃতির যুগ। জাতি, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম সমন্বয়ের সূচনা না হইলে, একটা ব্যাপকতর জাতীয়তার অভাবে বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলন পদে-পদে ব্যর্থ ও বিপর্য্যস্ত হইবে। এমন কি রাষ্ট্রই তখন সমাজের শান্তি ও সাধনার ঘোর পরিপন্থী হইবে। অনুন্নতের সংখ্যা ও কর্ম্মপরায়ণতার সহিত উন্নতের বুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তির সংযোগ চাই। তাহা যদি সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার ফলে না আসে, তবে আমাদিগকে কবীর, রামানন্দ ও চৈতন্যের আন্দোলনের মত কোন ভবিষ্যৎ যুগ-প্রবর্ত্তনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির অভিশাপকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা অন্তরের সম্পদে মহত্তর বাঙালী সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে পারিব নূতন কোন নদীধারাকে অবলম্বন করিয়া নূতন সমুদ্রের মোহনায়। বাংলা দেশ ও তাহার দেবতা, দুইই যে "নিতুই নব"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিন্দু-মুসলমান

জাতীয়তা

জাতীয়তা জিনিষটা একদিনের তৈয়ারী নহে। ইতিহাস এক-একটা দেশকে কেন্দ্র করিয়া অনেক যত্নে ও অধ্যবসায়ে রাষ্ট্রিক ঐক্য বিধান করে। কোথাও ভাষাগত ঐক্য, কোথাও অতীত সভ্যতার গৌরব, কোথাও আপদ-বিপদে সকলের সমান অনুভূতি, সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রীয় জগতে সাধারণ অভাব-অভিযোগ, নানা প্রকার সমাজগ্রন্থি,—যুগে-যুগে বিচিত্র মানুষের দলকে এইরূপে এক-একটা কর্ম্মঠ জাতিতে কর্ম্মসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় জোট-বাঁধার ব্যাপারটা কিন্তু নিতান্ত আধুনিক। ফ্রান্সে যখন নেপোলিয়ান প্রজা-শক্তির মুখপাত্র হইয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন হইতেই জাতীয়তার পুষ্টি। অপর সকল দেশ বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদ ভুলিয়া জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করিল। ইহা ত মাত্র একশত বৎসরের কথা।

হিন্দু-মুসলমানও এদেশে ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এই ঐক্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়, কলেজ, খবরের কাগজ, রেলগাড়ীতে যাতায়াত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়

আন্দোলনে যোগদান,—হিন্দু-মুসলমানকে একই কর্ম্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করিয়াছে। একটা সঙ্কীর্ণ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহারা দেশের সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময়ে একটা ভীষণ অসদ্ভাব আসিয়া দেখা দিয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে, এই বিরোধে শুধু অশিক্ষিত নহে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেও যোগদান করিয়াছে। বিরোধের মূলে নানা কারণ রহিয়াছে। এগুলির সহিত দেশের সামাজিক ইতিহাস জড়িত। মুসলমান গরু খায়,—মুসলমানের গার্হস্থ্য জীবনে নানা অসঙ্গতি,—মুসলমানের পোষাক বিদেশী,—এই বৈচিত্র্য হিন্দুকে মুসলমান হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। ইহার সঙ্গে অতীতের স্মৃতি ও ইতিহাস মিশিয়া হিন্দু-মুসলমানের জয়-পরাজয়ে নানা অবিচার-অত্যাচারের বেদনা আজও জাগরূক রাখিয়াছে।

একটু ভাবিয়া দেখিলে অসদ্ভাবের ভিত্তি থাকে না। অনেক পার্ব্বত্য দেশবাসী হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। তাহারা গরু, শূকর খাইতে দ্বিধা বোধ করে না। মুসলমান বিধবার বিবাহ দেয়, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক হিন্দুর মধ্যে এই সকল প্রথা অপরিচিত নহে। দক্ষিণ প্রদেশে ভাগিনেয়কে কন্যাদান সৌভাগ্য সূচনা করে। আর ইতিহাস? ইতিহাস যেমন দুই সম্প্রদায়ের শত্রুতার সাক্ষী দেয়, সেরূপ সৌহার্দ্দ্যেরও পরিচয় দেয়। পাঠান ও মোগল রাজত্ব কালে অনেক বাদশাহ হিন্দুর সহিত সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধনের জন্য গোবধ হ্রাস বা নিবারণের নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইতিহাস আরও বলে যে, মোগল-সম্রাটের নায়কত্বে

যে বিরাট ভারতীয় একরাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, জিজিয়া কর যে অসদ্ভাব আনয়ন করিল তাহার প্রভাবে তাহা চুরমার হইয়া গেল। সম্প্রদায়গত বৈরীর আগুন না জ্বলিলে মোগল ও মারাঠা পরস্পরের দ্বন্দ্বে আপনাদের শক্তি ব্যয় না করিয়া একটা মহাজাতি-শাসনের ভার ভাগ করিয়া লইত। ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন বোধ হয়, বিদেশীর অনুপস্থিতিতে, নূতন রকম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিচয় দিত। প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমুদয়ের সমবায়ে একটা বিরাট ভারত-স্বরাজের সম্ভাবনা কয়েকজন গোঁড়া সম্রাটের অভিসন্ধি নিতান্ত ব্যর্থ করিয়া দিল।

বাংলার ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক ঐক্য

বাংলার ইতিহাসে অনেকবার হিন্দু ও মুসলমান একযোগে দেশ সেবায় ব্রতী হইয়াছিল। সামসুদ্দিন ইলাইস খাঁ যখন মোগলের আধিপত্য হইতে বাংলার স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তখন বহু হিন্দু-সেনাপতি ও সামন্ত তাঁহার সহায় হইয়াছিল। তাঁহার বেগম ফুলমতী বিবি হিন্দু ছিলেন এবং তিনি নুরজাহানের মত শাসনকার্য্যও অনেকটা চালাইতেন। আফগান রাজত্বের সময় দরবারে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইত এবং দলিল পত্রও বাংলা ভাষায় লিখিত হইত। বাদশাহেরা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিয়া সুপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে হিন্দুর পার্ব্বণ উৎসবও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। মোগল অভিযানের বিরুদ্ধে একযোগে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বদ্ধ-

পরিকর হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমান এক গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল। পুরাতন পল্লীগীতিতে এই সদ্ভাবের আমরা পরিচয় পাইয়াছি—তখন 'হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি—কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।' মুসলমান বাদশাহ হিন্দু ফকিরকে ভক্তি ও সমাদর করিতেন। হিন্দু প্রজা ও জমিদার, মুসলমান পীরের দরগাহে সিরণী দিতেন। নবাবেরা সাধারণতঃ প্রধান জায়গীরগুলিকে ধনবান্ হিন্দুদের নিকট ইজারা দিতেন। হিন্দু প্রধানগণ জমিদারী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। পাঠানেরা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকিত। সামসুদ্দিনের পর রাজা গণেশ নামে একজন জমিদার গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি এতই নিবিড় ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর মৃতদেহ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুরা চাহিয়াছিল উহা দাহ করিতে এবং মুসলমানেরা কবর দিতে চাহিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় নবাবী পদ লাভ করিলেন, তখনও তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন একজন হিন্দু,—দর্পনারায়ণ কাননগো। বাংলার স্বাধীন পাঠান বাদশাহ ও নবাবের অনেক মন্ত্রী ও দেওয়ান ছিলেন বরাবরই হিন্দু। ধর্ম্মের গোঁড়ামী অপেক্ষা প্রভুভক্তি ও দেশসেবা হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রিক যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। ভাগীরথী-তীরে পলাশী-বনভূমির নিকট যখন বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়, তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলার হিন্দু-সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল শেষ রক্ষা করিবার জন্য যে বীর্য্য এবং মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী বিস্মৃত হন

নাই। অপর দিকে হিন্দু প্রজা ও প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরাম, নন্দকুমার, এবং জগৎশেঠের সহিত সিরাজের মনোমালিন্য না হইলে 'কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ' মীরজাফরের ষড়যন্ত্র যে ব্যর্থ হইত তাহা নিঃসন্দেহ।

হিন্দু-মুসলমান এক জাতি

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জাতি হিসাবে বাঙ্গালী। এক-এক যুগে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত-সংমিশ্রণ বাংলা দেশে খুবই হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের মেলামেশা ও হিন্দু জমিদারের সহিত মুসলমান রাজকুমারীর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাতন গীতিকায় মুসলমান কবি ও গায়ক, ঠাকুর জগন্নাথ, সীতা সতী ও রঘুনাথ গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া গান আরম্ভ করিয়াছেন এবং মক্কা মদিনার সহিত কাশী ও গয়া স্থানকেও বন্দনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব যুগে হরিদাস মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনের পর হিন্দু-সমাজের নিকট পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অপর দিকে রূপ সনাতন ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার মুসলমানের মত ছিল। সনাতনের পরিচয় ছিল সাকর মল্লিক, এবং রূপের নাম ছিল দবির খাস। তখনকার দিনে সকল পণ্ডিতই সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গও আরবী ও পারসী জানিতেন এবং মুসলমান মৌলানাদিগের সহিত ধর্ম্মবিচার করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য ঠিক যে, অনেক ধর্ম্মোৎসাহী ও খামখেয়ালী

নবাব হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের মহাস্থান, ও রামপালের দেবমন্দির ও পাষাণমূর্ত্তি লুন্ঠিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নবদ্বীপেও খুব নির্য্যাতন চলিয়াছিল। অনেক সময় নদী বা দীঘির জলে দেববিগ্রহ ফেলিয়া দিয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া হিন্দু প্রজা ও জমিদারেরা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। তবুও যখনই যে-কোন মুসলমান বাদশাহ, নবাব ও ভৌমিক দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা হিন্দুর আচার, ধর্ম্ম ও রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং হিন্দুদিগের সহযোগেই যুদ্ধের সময় যুদ্ধ এবং শান্তির সময় শাসনকার্য্য চালাইতেন। অপরদিকে যখনই বিদেশীর বিরুদ্ধে সংহতি ও যুদ্ধের প্রয়োজন হইত, তখনই হিন্দু রাজা ও ভৌমিক হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করে নাই। সীতারাম রায় যখন মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার প্রধান সেনাপতিদিগের মধ্যে ছিল বক্তার খাঁ ও মোগল আমল বেগ। অপরদিকে মুর্শিদকুলির বিশ্বস্ত সহচর ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ ভূপতি রায় ও কেশরী রায়। সীতারাম তাঁহার রাজধানীর নাম দিয়াছিলেন মহম্মদপুর এবং কামানের নাম দিয়াছিলেন কালু খাঁ ও ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ। তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল পদ্মার উত্তর পার হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত এবং এই রাজ্যে যেমন তিনি হিন্দু বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক-দিগের সমাদর করিতেন, তেমনই মুসলমান প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য মৌলবীর দ্বারা বহুসংখ্যক মোক্তব খুলিয়াছিলেন। তখনকার দিনের পাঠশালায় আরবী, পারসী ও বাংলায় একযোগে শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা ছিল। একটি পাঠশালার বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে হিন্দুস্থান

হইতে একজন মৌলবী, যোগাদ্যা হইতে একজন পণ্ডিত ও ঢাকা হইতে একজন মুন্‌শি আনিয়া একশত ছাত্রের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাংলার নবাবী আমলে অনেক রাজা ও উচ্চপদস্থ হিন্দু খুব ভাল পারসী জানিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ হিন্দুকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদবীগুলি দিয়াছিলেন এবং হিন্দু জমিদার ও ধনিক তাঁহাকে মারাঠা দমনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার দেওয়ান ছিলেন রায়দুর্ল্লভ, এবং শেঠেরা তাঁহার খুব অনুগত ছিলেন। হিন্দুর পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর রাজকার্য্যে আলিবর্দ্দি হাত দিতেন না। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সদ্ভাব তখন কম ছিল না। আলিবর্দ্দির ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় সহমৎ ও সৌলৎ জঙ্গ এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফর, নগরের সম্ভ্রান্ত সকল হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া রং ও আবীর মাখিয়া দোলোৎসবে আনন্দে যোগ দিতেন। মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে এই উৎসব সাত দিন ধরিয়া চলিত। বর্ণনা আছে যে, যখন নবাব মীরজাফর মরণাপন্ন, তখন নন্দকুমারের পরামর্শ অনুসারে তিনি মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময় হিন্দু দেবীর উপর মুসলমান নবাবের একান্ত নির্ভরতা অনুধাবনযোগ্য। অপরদিকে কালীকিঙ্কর দত্ত ১৭৩২ সালের এক পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বৈষ্ণব ও সহজিয়া ধর্ম্ম ও সাধনের বিবাদের মীমাংসা-পত্রে যাঁহারা সই করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি মুসলমানের সই ছিল। হিন্দুর সাম্প্রদায়িক গোলমালে মুসলমানের মত ও সালিশী তখন সাদরে গৃহীত হইত। ইহাও কম গৌরবের বিষয় নহে।

হিন্দু-মুসলমানের দেবতা, আচার-ব্যবহার একই

মধ্যযুগে পূর্ব্ববঙ্গে যেমন অনেক বৌদ্ধেরা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অবহেলা ও নিপীড়নে ব্যথিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইংরাজ আমলে সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দু হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞা, ও মৌলানা ও মোল্লাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। জাতি ও রক্তধারায় হিন্দু ও মুসলমানে বিভিন্নতা নাই। এই জাতিগত ঐক্যই হিন্দু ও মুসলমানকে এক রাষ্ট্রে ও একই ইতিহাসে সম্মিলিত করিবে। বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের যেরূপ রক্ত-সংমিশ্রণ হইয়াছে, ভারতের কোথায়ও তাহা হয় নাই। সেরূপ বাংলার সাহিত্যে ও ধর্ম্ম-জীবনে হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার বাহিরে নাই। পল্লীগাথা লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত। আমরা বাংলায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঈশা খাঁ ও ফিরোজ খাঁ প্রভৃতি মুসলমান নবাব বাদশাহ সম্বন্ধে পল্লীগীতি পাই। দীনেশচন্দ্র সেন অনেক মুসলমান কবি লিখিত বাংলা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলায় আলওয়াল হিন্দী কাব্য পদ্মাবৎ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন (সপ্তদশ শতক) এবং এক শতাব্দী ধরিয়া চট্টগ্রামের মুসলমানেরা এই পুঁথি হাতে লিখিয়া সমাদর করিয়া পড়িত। আর একজন কবি হামিদুল্লা, বেহুলা-সুন্দরী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহাও মুসলমানের কম প্রিয় হয় নাই। অন্যদিকে বাংলা দেশ যে সকল হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগের পরিচয় ভারতের অন্য কোন অংশে পাওয়া যায় না। ১৮৭১ সালে আদমসুমারীর বিবরণে আমরা জানিতে পাই যে, অনেক বাঙ্গালী মুসলমানের নামে হিন্দু দেবতার নাম

ব্যবহৃত হইত। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া অনেক সময় একই পূজাতে যোগ দিত, অথচ দেবতার নাম হইত বিভিন্ন। আচার-ব্যবহার ও ভাষায়, হিন্দু-মুসলমান একই। শুধু সেখ শব্দটি নামের আগে দিয়া সে যে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদও কম প্রচলিত নাই। উত্তর ভারতে সত্যনারায়ণের কথা ও পূজা প্রচলিত। কিন্তু বাংলায় যে উপাখ্যান ও পূজা প্রচলিত উহা সত্যপীরের এবং উহাতে যোগ দেয় উচ্চ হিন্দুজাতির স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। মাণিকপীর ও কালুগাজীও এইরূপ হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা,—হিন্দু-মুসলমান ভদ্র ও অভদ্র নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে সিরণী দেয়। উচ্চ হিন্দু-সমাজে ব্যাধি ও বিপদের সময় মুসলমান ফকির ও পাঁচ পীরের দরগাহে সিরণী ও ঘোড়ার পুতুল অর্পণ খুব প্রচলিত। পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিরা নদীতে নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে "পাঁচ পীর বদর বদর" বলিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করে। দুইজন পীরের নাম হিন্দু হইতে উৎপত্তি ব্যঞ্জক,—রাম গাজি ও মাছান্দালি। মাছান্দ মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে পারেন।

এদিকে হিন্দুরা যেমন লাঠি খেলিয়া ও অসি যুদ্ধ করিয়া মহরম মিছিলে যোগ দেয়, তেমনই মুসলমানেরাও হিন্দুর দুর্গাপূজার দালানে প্রবেশ অধিকার ও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় না। গ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর নিকট মুসলমান নারীর মানত ও ভিক্ষা অবাধে অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কলেরা ও বসন্ত রোগের সময় শীতলা দেবীর মানত হিন্দু-মুসলমান জাতিনির্ব্বিশেষে অনেক জেলায় করিয়া থাকে। হিন্দুরা যাঁহাকে বলে ওলাই-চণ্ডী, মুসলমানেরা তাঁহার নাম দিয়াছে

ওলা-বিবি। মুর্শিদাবাদে ওলা-বিবিকেই হিন্দুরা মানত করে। ওলা-বিবির একটি মন্দির আছে হাওড়ায় ওলাবিবিতলা গলিতে; মুসলমান এখানে পূজক ও স্বত্বাধিকারী। সেইরূপ সুন্দরবনের জঙ্গলের দেবতাকে হিন্দুরা পূজা করে এবং নামকরণ করিয়াছে দক্ষিণ রায় ও রায় মণি; মুসলমানেরা বলে বন-বিবি। দক্ষিণ বঙ্গে, বিশেষতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে, হিন্দু ও মুসলমানেরা একযোগে মনসা, মকর, দক্ষিণ রায় (রায়মণির সহিত) ও পাঁচ পীরের পূজা ও মানত করে। মনসা ও মকরের পূজার সময় একজন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও পাঁচ পীরের সিরণীর সময় ফকীরের প্রয়োজন হয়। এই সমবেত অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানকেই আসল সার্ব্বজনীন পূজা বলা যাইতে পারে,—এখনকার নব-নাগরিক সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজাকে নহে। শিবের গাজনে মুসলমানেরাও দলে-দলে আসিয়া আনন্দে যোগ দেয়। এমন কি যেখানে দেবোত্তর ভূমি তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে তাহারাই গীত, উৎসব ও আতসবাজি পোড়াইবার বন্দোবস্ত করে। মনসা বা বিষহরি বিবির ও পূজা মুসলমান-দিগের মধ্যে কম প্রচলিত নহে। কয়েক জেলাতে মুসলমানেরা অশৌচ পালন করে, নবান্ন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি পর্ব্ব অনুষ্ঠান করে এবং বিল্ব ও তুলসী বৃক্ষের পূজাও করে। বাস্তবিক যেখানে পৃথক্ দেবতার আহ্বান করিতে হয় না এইরূপ উৎসব হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে একই। অনেক মুসলমান পরিবারে বিবাহের সময় গায়ে হলুদ এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার প্রচলিত। দেশের মনের পরিচয় পাওয়া যায় পল্লীকুটীরে। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের রীতিনীতি ও ধর্ম্মভাব অনেকটা সুসামঞ্জস্যের পথে চলিয়াছে।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কতটা হিন্দু-মুসলমান সাধনার সমন্বয় সম্ভব, তাহা স্থফী ধর্ম্ম ও সাধনা স্থন্দর পরিচয় দেয়। স্থফী বা মরমিয়া ফকিরের অনেক হিন্দু শিষ্য দেখা যায়, এবং ইহারা মুসলমান গুরুকে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকে। ভগবানিয়া কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাংলায় আছে তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই কিছু কিছু তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়াছে, —যেমন, মুসলমানেরা পেঁয়াজ ও মাংস খায় না,—এবং সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে। এরূপ কীর্ত্তনে বা যৌথ সাধনায় হিন্দুর সন্ধ্যাবিধি ও পূজাপার্ব্বণ এবং মুসলমানের নামাজ ও রমজান উপবাস অপেক্ষা রসানুভূতিই বড় হইয়াছে এবং ইহাই সামাজিক বিরোধকে অনেকটা অগ্রাহ্যও করিতে পারিয়াছে।

ধর্ম্ম বনাম দেশ

দেশ-দেশান্তরের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, ধর্ম্ম অথবা সমাজ অপেক্ষা দেশেরই অধিক জোর। শিশুকাল হইতে প্রাকৃতিক প্রভাবে মানুষের মন তৈয়ারী হয়; নদী, জল, মেঘ, রৌদ্র, আকাশ, বাতাস, মানুষের ভাব ও অনুভূতিকে একটা বিশিষ্ট ছাঁদ দেয়। সেই ছাঁদকে যখন মানুষ আবিষ্কার করে তখন সে খুব খুসী হয়, তখন সে আর ধর্ম্ম বা সমাজের ব্যবধানকে বড় করিয়া দেখে না। তাই ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা স্থদৃঢ় বন্ধন।

সাহিত্য বলে—

কোন্ দেশেতে তরুলতা
　　সকল দেশের চাইতে শ্যামল,
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
　　দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল!
বাবুই কোথা বাসা বোনে
　　চাতক বারি যাচে রে
সে আমাদের বাংলা দেশ
　　আমাদেরই বাংলা রে!

সুনীল আকাশ, শ্যামল বনশ্রী, পাখীর কাকলি, নদীতে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে। দেশের সকলের। তাই এই গুলাই মানুষকে এক জোটে বাঁধে। এমন কি, ইংরেজ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া তাহার ঋতুপর্য্যায় ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, রাত্রে সে পিয়ালা মুখে ধরে—

To our dear dark foster-mother
　　To the heathen songs they sung—
To the heathen speech we babbled
　　Ere we came to the white man's tongue.
To the cool of our deep verandas—
　　To the blaze of our bejewelled main.

আয়াদের গান, বারাণ্ডার ঠাণ্ডা ও রৌদ্রের মোহ, প্রবাসী ইংরাজও এড়াইতে পারে নাই।

দেশ যে চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণ-জালের মত মানুষকে পরস্পরের সহিত শত বন্ধনে বাঁধিতেছে, এ বন্ধন রোধ করিবে কাহার সাধ্য? সন্তান-দিগের মধ্যে বিরোধ সত্য কিন্তু নিজের গৃহের প্রতি মমতা কে ত্যাগ করিতে পারে? মৌলানাগণ সুদূর আরব দেশের মোহ ভারতীয় মুসলমানের মনে যতই জাগাক না কেন, জন্মভূমির শব্দ, দৃশ্য, স্পর্শ, কাল্পনিক মুসলমান-ভূমি অপেক্ষা তাহাকে অভিভূত করিবেই। খিলাফতের মহিমা তাহাও পরোক্ষ। বস্তুতন্ত্রহীন, ইতিহাসের নির্জ্জীব পুনরাবৃত্তিতে অভিভূত না হইয়া সে গাহিবে—

'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।'

কারণ, ভারতেই যে মুসলমানের জন্ম, তাহার শিক্ষা ও দীক্ষা। ভারতবর্ষেই ত মুসলমানের আত্মা যত কর্ম্মে অনবরতই আপনাকে চিনিতেছে। তাহার এই আত্ম-প্রকাশ কামাল পাশার দরবার অথবা মক্কার মসজিদে হওয়া অসম্ভব। দেশের সহিত মুসলমানের আনন্দ-যোগ পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই সে আগ্রার তাজমহল, গৌড়ের আদিনার মসজিদ তৈয়ার করিতে পারিয়াছিল। আজও মুসলমান হিন্দুস্থানী গানে আপনার সৃষ্টি-কৌশল প্রয়োগ করিতেছে, তাই দেশবাসীর নিকট গানে মুসলমানের এত গৌরব। মৌলানাগণ খিলাফতের দেশকে ভালবাসিতে উচ্চৈঃস্বরে পরামর্শ দিতে পারে সত্য, কিন্তু মুসলমানের সে ভালবাসা নিষ্ফল হইবে, তাহাতে মুসলমানের সামাজিকতা, মুসলমানের সৃষ্টিকার্য্য প্রশ্রয় পাইবে না, বাড়ীবে শুধু হিংসাদ্বেষ, বাড়িবে শুধু অধর্ম্ম। সমাজ ও স্বদেশ ছাড়িয়া যে ধর্ম্ম উঠে তাহা পর-ধর্ম্ম, তাহাতে আত্মার বন্ধন ছাড়া মুক্তি নাই।

সাহিত্যে ভাব-মিলন

মুসলমান তাহার সৃজনী শক্তির পরিচয় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও দিয়াছে। বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে সে একভাষা-ভাষী। বাঙালী মুসলমানেরও বাংলা ভাষাই মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া কূট রাজনীতি যে বিবাদ আনিল, সেই বিবাদ দূর করিতে হইবে। বাস্তবিক সাহিত্য ত কখনও ধর্ম্মভেদ মানে নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মাণিকচাঁদ রাজার গান, ময়নাবতীর গান, ভাটিয়াল গান, আরও কত প্রকার কথা সাহিত্যে অবাধে চলিতেছে। অধিকাংশ মুসলমান পূর্ব্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, কিন্তু আজও ডাক ও খনার বচন, অসংখ্য রূপকথা ও কাহিনী তাহাদেরও মুখে-মুখে প্রচলিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে মুসলমানকে বাদ দিবার উপায় নাই। মুসলমান যে শুধু লোকসাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে। নবীন বর্ত্তমান কালে দুই একজন মুসলমানের অনন্যসাধারণ প্রতিভা সাহিত্যকে আলোকিত করিয়াছে। এটা ঠিক, বাঙালী-মুসলমান সাহিত্যে অমর হইতে পারে,—ইংরাজী, আরবী, ফরাসী বা উর্দ্দু লেখার দ্বারা নহে,—বাংলা লেখার দ্বারা। অপর দিকে, সে মুসলমানের ভাব-সাধনা বাংলা-সাহিত্যে উপঢৌকন দিয়া নূতন রস-বস্তু সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। কাজী নজরুল ইসলাম এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে মুসলমান আত্মার সহজ ও সরল প্রকাশের পরিচয় পাই। তিনি আনিয়াছেন বাংলার কাব্য-কুঞ্জে পশ্চিম এশিয়ার ভীষণ জ্বালাময় পবন-

বেগ, মরুবাসী উষ্ট্রারোহীর দারুণ মর্ম্মন্তুদ পিপাসা। বাংলার সরস্বতীকে তিনি বেণু-বীণার সহিত শাণিত তববার ও বল্লম উপহার দিয়াছেন। মুসলমানী উপকরণে তিনি বাংলার গীতিকাব্যকে তীব্র, জোরালো করিয়া তুলিয়াছেন। "উপাসনার" পূজার সংখ্যায় আমি একবার তাঁহার আগমনী গান ছাপিয়াছিলাম। দেবী-বোধনের মূল তত্ত্ব ও ভাবোন্মাদটি তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পড়িয়া কোনো সদাচারী ব্রাহ্মণের মনে হয় নাই,ম্লেচ্ছের কণ্ঠে দেবীকে কেন ডাকিলাম,—সে ডাক এমন সহজ, স্বাধীন ও নির্ভীক হইয়াছিল। সাহিত্যের জাতি বা ধর্ম্মবিচার নাই। লেখা পড়িয়া নিষ্ঠাবান পাঠকের কপালের চন্দন-তিলক ম্লান হয় নাই, লেখকেরও তাহাতে আধ্যাত্মিক অকল্যাণ ঘটে নাই।

মুসলমান যদি বলে, আমরা কথিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিব, সে করুক। যদি সে-সাহিত্যের প্রাণ থাকে, সেই ভাষাই পুস্তকের ভাষা হইবে। কিন্তু এই বিষয় লইয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে অন্দোলন আনা অনুচিত। গ্রাম্যতা সব দেশে সব সাহিত্যে আছে। সাহিত্য যখন বিশ্ব-দরবারের রাজপথে বাহির হয় তখন সে গ্রাম্যতা ত্যাগ করিয়া, বিশেষ নিয়মবন্ধনে আপনাকে ভূষিত করিয়া বাহির হয়। প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার নানা গল্প ও উপন্যাসে বীরভূমি ভাষার আমদানী করিয়াছেন. কিন্তু তবুও তাঁহার রচনায় কেমন অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি! তাহা আমাদের সাহিত্যকে কম সম্পদে গৌরবান্বিত করে নাই। লিখিত ভাষার নিয়ম-কানুন মানিয়াই তিনি সাহিত্যে একটা বিশিষ্টতা দান করিতেছেন। মুসলমান-লেখক যদি চল্‌তি ভাষা সাহিত্যে পরিচলন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রে প্রতিভাশালী লেখক হইতে

হইবে। তাহা ছাড়া লিখিত বাংলাকে একবারে ত্যাগ করিয়া নিয়ম-কানুনের বাহিরে চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য কোন দেশে দেখা যায় নাই সাহিত্য দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্র রচনা করিয়াছে তাহাই আমাদিগকে অসদ্ভাব হইতে রক্ষা করিবে। কাজী নজরুল ইসলামের মত যদি আরও প্রতিভাশালী মুসলমান-লেখক দেখা দেন তাহা. হইলে কূট রাষ্ট্রনীতি যে এখন দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কৃত্রিম বেড়া তুলিতেছে তাহা ভাঙ্গিতে পারা যায়। সাহিত্যের ধর্ম্মই হইতেছে মিলন প্রতিষ্ঠা করা—যদি মুসলমান সত্যকার ভাববস্তু সাধনা করে, তবে তাহাকে সে বাংলা সাহিত্যের ভিতরই পাইবে। সাহিত্য যে আত্মপ্রকাশের প্রধান সম্বল। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের আত্মপ্রকাশ হইলে সেই সাহিত্যই তাহাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের বিচ্ছিন্নতা হইতে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় হইবে।

সামাজিক সৌহার্দ্দ্য

সাহিত্যের উদার প্রশস্ত মিলন-পথে দুই প্রতিবেশী গমনাগমন করিতে থাকিলে খাদ্য, আদব-কায়দা, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের যে প্রভেদ তাহা চোখে কম পড়িবে। রাজপথে বাহির হইয়া কেহ ভাতের খবর, ঠাকুর-ঘরের খোঁজ লয় না। ভাববিনিময় পরস্পরের এমন একটা প্রশস্ত মিলন-ক্ষেত্র তৈয়ার করে, যেখানে আমাদের আদান-প্রদানে খাদ্যাখাদ্য বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের বালাই নাই।

অপরদিকে ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার যেখানে কৃত্রিম বিচ্ছেদের বেড়া তুলিয়াছে সেগুলিকে ক্রমাগত খাটো করিয়া দেখাই যুক্তিসঙ্গত। যে-দেশে নানা ধর্ম্মের সমাবেশ, সেখানে রাষ্ট্র যদি ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও সকলের আদান-প্রদান অক্ষুণ্ণ রাখে তবেই রক্ষা। যতদিন কোন গোঁড়া লোকের উৎপাত না সুরু হয়, ততদিন ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রভেদ মানুষের সদ্ভাবের অন্তরায় হয় না। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে এই গোঁড়ামি কখনও প্রশ্রয় পায় নাই; তাই ধর্ম্ম ও আচারের বিভিন্নতা বিরোধ সৃষ্টি করিতে দেয় নাই; পল্লীসমাজে প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একটা সরল ও স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভাব এখনও বর্ত্তমান। পরস্পরের বৈষম্য স্বীকার ও সহ্য করিয়াই বাংলাদেশ হিন্দুয়ানী বা মুসলমানীর খর্ব্বতা ঘটিতে দেয় নাই।

এই ত গেল পল্লী-সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সৌহার্দ্দ্যের ইতিহাস। ইংরাজের আমলে নূতন শিক্ষার ফলে ধর্ম্মের ভাণ ও গোঁড়ামি আরও কমিয়াছে। দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষা তত অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। যতই নূতন শিক্ষার বিস্তার হইবে, ততই কলহপ্রিয়, অশিক্ষিত, গোঁড়া ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকের প্রভাব কমিবে, ইহাতে দুই সম্প্রদায়েরই আদান-প্রদান বাড়িবে। মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ড পঞ্চায়েত প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানে একযোগে যতই সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইবে, ততই স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয়, এ দিকেও মুসলমান এখন পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে। শিক্ষাপ্রচার, স্বাস্থ্যরক্ষা, নানাবিধ লোক-সেবা প্রভৃতি কল্যাণকর অনুষ্ঠানে যতই মুসলমান যোগ

দিবে ততই তাহার একটা উদারতর সামাজিক শীলতা আসিবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন সমগ্র সমাজকে নিবিড়ভাবে আন্দোলিত করে, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে যেন সাড়াই দেয় না। অথচ মুসলমান প্রতিবেশিগণকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর এত আগ্রহ, উৎসাহ।

এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য এমন সব নেতা তৈয়ার করিতেছে যাহারা সম্প্রদায়ের নহে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্মুখে রাখিয়াছে। দেশ-নায়কগণ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াই বড় হইয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্ম মানুয়ের সহিত মানুষকে মিলাইয়াছে,—মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ ঘটায় নাই। দেশবন্ধুর মত অমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব-হীন জনপ্রিয় দেশনায়ক খুব কম দেশেই জন্ম গ্রহণ করে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকে আপনার বিরাট ও পীড়িত হৃদয় দান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমা এইখানে যে, তিনি একই সঙ্গে উকিল ও ব্যবসায়ী, ছাত্র ও সাহিত্যামোদী, সমাজ-সংস্কারক ও পুরাতনপন্থী, শ্রমজীবী ও জমিদারের সহিত সহজভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানগণ রাষ্ট্রনীতির আসরে নামিয়াও ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। পাশ্চাত্যের উদারতর সামাজিক স্বাধীনতা ও ধর্ম্মদ্বিধাহীন বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহারা তাহাদের সংকীর্ণতা ভুলিলেন না, আজও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণেরই মত তাঁহারা সম্প্রদায়গত ভাব ও ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব কল্পনায় ভরপূর। যদি নেতাগণই উন্মার্গগামী হন, জনসাধারণ ত হইবেই!

ধর্ম্মভেদে রাষ্ট্রীয় সুবিধা

শাসন-সংস্কার নূতন উপসর্গ আনিল। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান একজোটে কাজ করিতে শিখিতেছিল; কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের পৃথক ভোট দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার মূলে কুঠারঘাত করা হইল,—বর্ত্তমান যুগে ভোটই সর্ব্বপ্রধান সামাজিক শক্তি। ভোট যখন পৃথক করিয়া সম্প্রদায় অনুসারে দিতে হয় তখন ত রাষ্ট্র খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইবে। মুসলমান যে দেশের প্রতি আন্তরিক মমত্ব বোধ করিতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ,—শাসন-সংস্কার তাহার ধর্ম্মের নামে দেশের পরিবর্ত্তে সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছে।

শাসনেও একটা ঘোর অহিতকর পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়াছে। মোহনবাগান ম্যাচে যদি অপদার্থ দুই তিনজন প্লেয়ারকে নামানো হয়, তবে দর্শকমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করে, কিন্তু প্রেসিডেন্সী বা মেডিকাল কলেজে অপদার্থ তৃতীয় শ্রেণীর ছেলে ধর্ম্মের আবদারে প্রবেশাধিকার পায়। উচ্চ চাকুরী লাভের জন্য পরীক্ষাই একমাত্র প্রবেশ-দ্বার, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান অনুসারেই বাছাই হইল। যোগ্যতর হিন্দু থাকিতেও মুসলমানই মনোনীত হইল। লোকে হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে আপনাদের রোগ-প্রতিকারের ভার দেয় না। কিন্তু আমরা আনাড়ী কর্ম্মচারীর হাতে দেশের শাসনভার দিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীর হাতে শুধু তদ্ধর্ম্মাবলম্বীর নহে, অন্য সম্প্রদায়েরও কল্যাণ নির্ভর করে এবং সকল সম্প্রদায় মিলিয়াই তাহার মাহিয়ানার

অর্থ যোগায়। যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করিয়া যেখানে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বা শ্রেণীর দাবীতে মানুষ অক্ষমতা সত্ত্বেও উচ্চাধিকার পায় সেখানে সমাজ বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়। বিষের উত্তাপ ক্রমশঃ সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইতে থাকে। শেষে বিষ মস্তিষ্কে উঠিয়া হিতাহিত জ্ঞানের লোপ সাধন করে। স্বাধিকার-প্রমত্ত লোকগুলারও ইহাতে কম নৈতিক অবনতি হয় না। যে-সম্প্রদায় বিনা আয়াসে ভাগ্যবস্তু লাভ করে তাহারও একটা বিষম শিথিলতা, কর্ম্মবিমুখতা দেখা যায়।

মিলনের ভিত্তি

রাষ্ট্রিক জগতে পৃথক ভোট, পৃথক সুবিধা দূর করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সামাজিক জীবনে সমাজ, খাদ্য ও আচার-ব্যবহারের সংস্কারের দ্বারা মেলামেশার অন্তরায় দূর করিতে হইবে। আদান-প্রদানের দ্বারা যাহাতে বৈষম্য বিরোধে না পরিণত হয়, ইহার জন্য নানা দিক হইতে হিন্দু-সমাজের রীতিনীতি পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। আর্থিক জীবনে দুই প্রতিবেশীর সমবায় অটুট রহিয়াছে। ধর্ম্ম অপেক্ষা জীবিকার দাবী যে অনেক বড়। মুসলমান রায়ত ও হিন্দু জমিদার, হিন্দু মালিক ও মুসলমান শিল্পী যে পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি। একজনের পেট না ভরিলে অপরের ভরিবে না। এখানে ধর্ম্মভেদের কোনো ভাবনা নাই।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতে হইবে সার্ব্বজনীন শিক্ষার উপর। লোক অশিক্ষিত বলিয়াই বিদ্বেষের আগুন মসজিদ্ হইতে মন্দিরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। ধর্ম্মের নামে হত্যা ও ধর্ম্মালয় ধ্বংস হয়। ঝাণ্ডা তুলিয়া গুণ্ডারা সব হইল নেতা। বেয়াদবীর নাম হয় সৎসাহস। অসংখ্য নূতন ইংরাজী স্কুল, নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে, সামাজিক শীলতা শিখাইতে হইবে, তবে দেশ প্রতিবেশীর কলহ হইতে বাঁচিবে। এ কলহের যদি আশু প্রতিরোধ না হয় তাহা হইলে বাংলার উন্নতি পঞ্চাশ বৎসর স্থগিদ থাকিবে। শিক্ষা-ব্যবহারে দলাদলি, জমি-সংক্রান্ত আইন সংশোধনে দলাদলি, শাসন-সংস্কারে দলাদলি, রাজকর্ম্মচারী নিয়োগে দলাদলি, সবই বাংলার ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পঞ্জাব বা যুক্ত-প্রদেশের মত দেশের সাহিত্য হীনবল নহে। উত্তর-ভারতে সাহিত্যের ভিতর দিয়াও ভাব-বিনিময়ে সুবিধা নাই। বাংলা দেশে তাহা আছে। বাংলার শতকরা ৯৯ জন মুসলমানের বাংলা-সাহিত্যই শিক্ষার বাহন। লোকশিক্ষাই একমাত্র উপায়। সাহিত্যই একমাত্র সম্বল। উপায় চিনিয়া, সম্বল লইয়া পল্লীতে-পল্লীতে অসংখ্য কর্ম্মী যদি ধর্ম্মকে বাদ দিয়া নূতন সঙ্ঘ গড়িতে থাকে, নিঃশঙ্কভাবে দেশ-ধর্ম্মকে একমাত্র ধর্ম্ম মানিয়া যদি মন্দির ও মসজিদের পরিবর্ত্তে তাহাদের ধর্ম্মালয়কে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষার কেন্দ্ররূপে দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে শেখায়, তবেই রক্ষা! বাংলায় এমন কঠিন সমস্যা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। দেশনায়কগণের নিকট ইহা অপেক্ষা গুরুতর আহ্বান পূর্ব্বে আসে নাই।

সংখ্যা বনাম সম্পদ

লোকবৃদ্ধি বনাম কৃষির সঙ্কোচ

বাংলা দেশ ও সমাজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে যে অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে ধাবিত, তাহা আজ বাঙ্গালী-মস্তিষ্ককে আলোড়ন করে না। বাংলার অন্তর আজ সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জরিত, বাংলার বীর্য্য ত্রিশ বৎসরের নিপীড়নে নিস্তেজ, বাঙালীর মনোময়তা সাহিত্যে একটা বিরাট জাগ্রত জনচৈতন্য না জাগাইয়া অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়পরতাকে আজ আশ্রয় করিতেছে। হিন্দু-মন্ত্রী বড় পদ পাইবে, না মুসলমান-মন্ত্রী বড় পদ পাইবে, হিন্দুরা চাকুরী বেশী পাইল, না মুসলমান বেশী পাইল,—এই চিন্তাই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির বিপর্য্যয় ও মানুষের ঔদাসীন্য ও হঠকারিতার জন্য বাংলা তাহার অতীতের ধন-সম্পদ আজ হারাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর প্রাচীন সভ্যতা উত্তরে ও পূর্ব্বে এমন রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে যে, তাহা বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে যমুনা ও পদ্মাবক্ষ রঞ্জিত করিয়া অমাবস্যার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার লোকসংখ্যা অন্যূন এক কোটী ছিল। এখন তাহা বাড়িয়া ৫ কোটীর কিছু অধিক হইয়াছে। ১৯২১

হইতে ১৯৩১,—এই দশ বৎসরে বাংলার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ৩০ লক্ষ। কিন্তু সেই অনুপাতে বাংলার কর্ষিত ভূমি বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সালে গড়পড়তা বাংলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ২৩,৫২৭২০০ একর। গত পাঁচ বৎসরের কর্ষিত ভূমির গড়পড়তা পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৩,৫১৪,৪৪০। কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলায় অন্নকষ্টও দেখা গিয়াছে। এই বৎসর যে দুর্ভিক্ষ, অনশন ও অন্নাভাবে শিশুর ক্রয়-বিক্রয় দেখা গিয়াছিল, তাহা ইংরাজ-আমলে অভূতপূর্ব্ব।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল,—যেখান হইতে ১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মের সময় দুর্ভিক্ষের উত্তপ্ত লেলিহান রসনা সুদূর-প্রধাবিত হইয়া বাঙালী-মাত্রকেই ত্রস্ত করিয়াছিল,—সেখানে গত শতাব্দীর বনানী নাশের ফলে বৃষ্টিপাত কমিয়াছে ও অসম হইয়াছে। বাঁকুড়ার নর্ম্মাল বৃষ্টিপাত বৎসরে ৫২ ইঞ্চি; কোন বৎসরে ৮৮ ইঞ্চি, কোন বৎসরে মাত্র ৪০ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে। জমিদারেরা সরোবর, পুষ্করিণী রক্ষা করেন নাই। একদিকে জল-সেচের সুবিধা নাই, অপর দিকে চাষ-বাসের ধারা শুষ্ক দেশের মতন না হইয়া বাংলার অন্য অঞ্চলের মতই মরশুম বারির উপর নির্ভরশীল।

দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে নদ-নদীর গতি হ্রাস ও মৃত্যু কৃষির ঘোর অধঃপতনের কারণ হইয়াছে। পল্লীর ও আবহাওয়ার দ্রুত অধোগতি, কৃষি-সম্পদের এত দ্রুত নাশ জগতের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব্ব।

প্রথমে ষোড়শ শতাব্দীতে কুশী নদীর পশ্চিম প্রবাহ ও পদ্মার

পূর্ব্ব অভিযান। তাহার পর ১৭৭০ সালে উপর্য্যুপরি কয়েকবার বন্যার পর দামোদরের দক্ষিণ প্রবাহ। তখন হইতে ভাগীরথী, ভৈরব ও নবগঙ্গার অধোগতি। এক শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ ভাগীরথীর শাখা-প্রশাখা ও নদীয়ার নদীগুলির অধোগতি হেতু এমন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে যে, খুব সম্ভব অন্ততঃ মধ্য বঙ্গের পক্ষে প্রতিকার অসম্ভব ;—জলা জঙ্গল ও মশক প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ, সীতারাম ও ভারতচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচিহ্নকে একবারে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। গঙ্গানদী এখন যমুনার প্রবাহ-বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্ব অঞ্চলে আপনাকে দ্রুত পরিবর্ত্তন করিতেছে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নদী-প্রবাহের অধোগতি হেতু পদ্মা এখন পূর্ব্ববঙ্গকে নূতন করিয়া ভাঙ্গিবে গড়িবে। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, কীর্ত্তিনাশা ও নয়া-ভাঙ্গিণীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি আবার নূতন খাত ও প্রবাহ এই শতাব্দীতে কত গ্রাম ও সহর গ্রাস করিবে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের জলপথগুলির বিরোধ হেতু পূর্ব্ববঙ্গে বন্যাপ্লাবনের আশঙ্কা বাড়িতেই থাকিবে। বড় নদী. তাহার শাখা-প্রশাখা ও জল নিকাশের পথগুলি মিলিয়া একটা সাম্য রক্ষা করে। কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়াছে এখন ব'-প্রদেশের পশ্চিম ও মধ্য অংশে। তাহার ফলে এক অঞ্চলে জমির উর্ব্বরতা-হানি, কৃষির অবনতি, দুর্ভিক্ষ ও স্বাস্থ্যনাশ, অপর অঞ্চলে কৃষি-সমৃদ্ধি, নদী-প্লাবন ও ভাঙ্গন। মরা-নদীর অঞ্চলে কৃষি, লোকসংখ্যা ও স্বাস্থ্যের দ্রুত অধোগতি ও ভরানদীর অঞ্চলে সম্পদ-বৃদ্ধি এই তালিকাটিতে পরিস্ফুট হইবে,—

মরা নদীর অঞ্চল	কর্ষিত ভূমির হ্রাস-বৃদ্ধি শতকরা (১৯০১।১৯৩১)	জ্বরের প্রকোপের মান (১৯৩০)	লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি শতকরা (১৯০১।১৯৩১)
বর্দ্ধমান	—৪০	৫৩.৪	+৩.৭
নদীয়া	—৭	৫৬.৫	+৮.১
মুর্শিদাবাদ	—১৪	৪১.৭	+২২.৯
যশোহর	—৩১	৪৮.২	-- ৭.২
হুগলী	—৪৫	৪৬.৬	+৬.২
ভরা নদীর অঞ্চল—			
ঢাকা	+৫৭	৯.৭	+২৮.৯
মৈমনসিংহ্	+১৯	১১.০	+২৮.৫
ফরিদপুর	+১৩	২৬.৬	+২১.৮
বাখরগঞ্জ	+২১	৮.৩	+২৭.১
ত্রিপুরা	+১১	৭.২	+৩৭.৭
নোয়াখালি	+১৫	১০.৫	+৪২.৯

গত ত্রিশ বৎসরে বর্দ্ধমান ও হুগলীতে কর্ষিত ভূমির প্রায় অর্দ্ধেক পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ রহিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যের সঙ্গে কৃষির অবনতির একটা নিবিড় সম্বন্ধও রহিয়াছে।

বাংলা দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন ধ্বংসোন্মুখ। ১৮৯১

হইতে ১৯৩১—এই চল্লিশ বংসরে হুগলী জেলায় কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে শতকরা ৬০, বর্দ্ধমান জেলায় ৫০, এবং যশোহর জেলায় ৩২। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ ও মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই সকল প্রদেশের কৃষি সমুন্নত ছিল, গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী ছিল, নদনদী ও তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি বহমান ছিল। যশোহর জেলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ নদ-নদীর ধ্বংস হেতু গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সিকি কমিয়া গিয়াছে।

বাংলার তিন ভাগের দুই ভাগে জঙ্গল ও জলাভূমি আজ কৃষকের চাষ ও মানুষের বসবাসকে আক্রমণ করিতেছে।

বাংলাদেশের মোট ৮৬,৬১৮ গুলি গ্রামের মধ্যে ৬০,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত। বৎসরে বৎসরে ২·৫ লক্ষ হইতে ৩·৫ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে এক কোটী লোক অনশনে এবং অন্ততঃ মোট তিন্ কোটী ম্যালেরিয়া রোগে না মরিত বাংলার লোকসংখ্যা আজ হইত ৯·১ কোটী। বাংলায় ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রকোপের সঙ্গে কৃষকের দারিদ্র্য ও অনাহারের যে সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ম্যালেরিয়া প্রাচীন এথেন্সের যেমন ধ্বংস-সাধনের কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ এই মহামারী,—ষোড়শ শতাব্দীতে পদ্মার পূর্ব্ব অভিযানের ফলে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে যে নদীর গতি-বিপর্য্যয় দেখা গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে,—আজ বাঙালীর সভ্যতাকে লাঞ্ছিত ও পরাস্ত করিতেছে।

জাতি ও সম্প্রদায়ের অসম প্রজনন

ঘটনাচক্র এমন হইয়াছে যে, একদা যেখানে সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং উন্নত হিন্দুজাতির বসবাস অধিক ছিল, বাংলার সেই প্রদেশগুলি এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও ক্ষয়িষ্ণু; আর সেই সব অঞ্চলই এখন স্বাস্থ্যপদ ও বর্দ্ধিষ্ণু, যেখানে মুসলমান ও অনুন্নত জাতি সংখ্যায় অধিক।

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ বাংলার মরা নদীর অঞ্চল, ক্ষয়িষ্ণু অংশ, এইখানেই হিন্দুর সংখ্যাধিক্য,—বর্দ্ধিষ্ণু উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে নহে:

হিন্দুর সংখ্যা (সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে):—

	শতকরা
বর্দ্ধমান বিভাগ	৮২
প্রেসিডেন্সি "	৫১
রাজসাহী "	৩৩
ঢাকা "	২৪
চট্টগ্রাম "	২২

আশ্চর্য্য এই যে, গত চল্লিশ বৎসরে খাদ্য, বসবাস ও বিবাহ-পদ্ধতির তারতম্য হেতু যে সব ক্ষয়িষ্ণু জেলায় হিন্দুর লোক-অনুপাত কমিতেছে, মুসলমান সেখানেও ক্রমবর্দ্ধনশীল; অথচ সম্পদশীল, বর্দ্ধিষ্ণু জেলায় হিন্দুর লোক-অনুপাত কমিতেছে বই বাড়িতেছে না। চারিটি জেলা হইতে ইহা দেখান হইল:—

মোট লোক-সংখ্যার প্রতি হাজার

হিন্দু

	১৮৯১	১৯০১	'১১	'২১	'৩১
নদীয়া	৪১৯	৪০৬	৩৯৭	৩৩১	৩৭৫
যশোহর	৩৯০	৩৮৭	৩৮০	৩৮১	৩৭৯
বাখরগঞ্জ	৩১৬	৩১১	২৯৬	২৮৭	২৭৬
মৈমনসিংহ	৩০১	২৭৪	২৫৭	২৪৩	২২৯

মোট লোক-সংখ্যার প্রতি হাজার

মুসলমান

	১৮৯১	১৯০১	'১১	'২১	'৩১
নদীয়া	৫৭৬	৫৮৯	৫৯৫	৬১২	৬১৮
যশোহর	৬০৯	৬১২	৬১৯	৬১৮	৬২০
বাখরগঞ্জ	৬৭৯	৬৮৩	৬৯৭	৭০৬	৭১৬
মৈমনসিংহ	৬৯০	৭১৪	৭৩৪	৭৪৯	৭৬৬

বাংলার সব অঞ্চলেই মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুজাতি উচ্চ জাতি অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমানেরা অনুচ্চ হিন্দু-জাতি হইতে উদ্ভূত। উন্নতিশীল কৃষি ও স্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ার জন্য মুসলমানের লোক-সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে আজ বিস্ময়কর অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। গড়ে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বাংলাদেশে দ্বিগুণের বেশী বাড়িয়াছে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে। পূর্ব্ব বঙ্গে যেখানে প্রায় বারো আনা মুসলমান, সেখানে মুসলমানের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ও হিন্দূর বৃদ্ধিহ্রাস একটা কঠিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জমিদার

ও মহাজন অধিকাংশই হিন্দু; প্রজা, খাতক ও কৃষাণ মুসলমান। স্বার্থ ও আর্থিক অধিকারের বিরোধকে সহজেই ধর্ম্মের গোঁড়ামি ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া গ্রামে-গ্রামে অশান্তির আগুন জ্বালাইতে পারে। হিন্দু-পরিবারে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই, মুসলমান পরিবারে অধিকাংশ বিধবাই পুনরায় পাণিগ্রহণ করে। ইহাতেও একটা পারিবারিক-নীতির সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। লোকবল অধিক হইলে যেখানে বিরোধ ঘটে সেখানে ধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্মবুদ্ধি হটকারিতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসে। সমগ্র বাংলাদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা ও বৃদ্ধির অনুপাত নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হইল—

সমগ্র লোক-সংখ্যা হিসাবে শতকরা

	হিন্দু	মুসলমান
বাংলা	৪৩	৫৪
পূর্ব্ববঙ্গে	২৭	৭১

হিন্দুর সংখ্যা হিসাবে নীচ হিন্দুজাতি

	শতকরা
বাংলা	৩৭
পূর্ব্ববঙ্গ	৪০

পঞ্চাশ বৎসরে (১৮৮১—১৯৩১) বৃদ্ধির হিসাবে শতকরা

	হিন্দু	মুসলমান
বাংলা	২৩	৫১
পূর্ব্ববঙ্গ	৩৯	৮৭

অনুচ্চজাতির বহুজনন

শুধু ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন নহে, সামাজিক অবস্থা ও বিধি-নিষেধ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকসংখ্যা পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন অনুপাতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার উচ্চ জাতি সমুদয়ের মধ্যে স্ত্রী-জাতির আপেক্ষিক সংখ্যা কম, অনুচ্চজাতি ও মুসলমানের মধ্যে বেশী।

হাজার পুরুষ প্রতি স্ত্রীর সংখ্যা

উচ্চজাতি—	
ব্রাহ্মণ	৮৪৭
কায়স্থ	৯০১
অনুচ্চ জাতি—	
বাউরী	১০১০
নমঃশূদ্র	৯৬৪
মাহিষ্য	৯৫২
ডোম	৯৬৫
মুসলমান জোলা	৯১৬

বাঙালীর উচ্চ জাতির মধ্যে স্ত্রী-সংখ্যা হ্রাসের কারণ সঠিক বলা যায় না। যাহারা অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় বহু যুগ ধরিয়া জীবন সংগ্রামে ঐ সকল পরিবারই সফলতা লাভ ও পুষ্টি সাধন করে। কন্যার অনাদর ও মাতৃমৃত্যুও স্ত্রী-সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। ম্যালেরিয়ার অত্যাচার, নীচজাতি অপেক্ষা উচ্চজাতি এবং পুরুষ

অপেক্ষা স্ত্রী জাতির উপর অধিকতর নির্ম্মম। অন্য আরো কারণ থাকা সম্ভব। যাহা হউক নিম্ন জাতির মধ্যে জন্ম হইতেই স্ত্রী জাতির সংখ্যা অধিক।

উপরন্তু উচ্চজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের গণ্ডী ক্ষুদ্র করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া সব উচ্চ বা উচ্চাভিমুখী জাতিই বিধবা-বিবাহ নিষেধ করে।

ফলে এই দাঁড়ায় যে নানা কারণ সমবায়ে, স্ত্রী-সংখ্যা হ্রাস, বিবাহ-গণ্ডীর ক্ষুদ্রতা, বিধবার সংখ্যাধিক্য, বিবাহের বিলম্ব, স্ত্রী পুরুষের বয়সের তারতম্য, যৌতুক দান-প্রথা, কন্যার অনাদর প্রভৃতি কারণে অনেক উচ্চ শ্রেণী আত্মবিলোপ করিতেছে।

যেখানে বিবাহের জন্য স্ত্রীকে ক্রয় করিতে হয়, সেখানে বিবাহিত নরনারীর বয়সের তারতম্য জন্য সন্তানোৎপাদনে ব্যাঘাত ও ব্যভিচার ঘটে। অপর দিকে কন্যাপক্ষের যৌতুকদান প্রথা, বাঙালীর উচ্চ হিন্দু পরিবারে ঋণগ্রহণ ও বৃদ্ধি, ও কন্যার নিদারুণ অনাদর ও ব্যথার কারণ হইয়াও, আজও এত স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জনের পরও সমূলে উৎপাটিত হয় নাই।

এই দুই প্রথাই বিবাহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নির্দ্দেশের জন্য বাঁচিতে পারিয়াছে। দুই-ই জাতি-পুষ্টির পরিপন্থী, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপন্থী উচ্চ ও মধ্যম জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ-নিষেধ। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা বিধবা-বিবাহ অবলম্বন করিয়া দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্নের তালিকাটি হইতে মুসলমানদিগের বিধবার সংখ্যা অল্প দেখা যাইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি হাজার (সকল বয়সের)

	হিন্দুপুরুষ	হিন্দুস্ত্রী	মুসলমানপুরুষ	মুসলমানস্ত্রী
বিবাহিত	৪৬৭	৪৭২	৫০৭	৫৪৪
বিপত্নীক বা বিধবা	৪৫	২১৮	১৮	১২৩
অবিবাহিত	৪৮৮	৩১০	৪৭৫	৩৩৩

পাঁচজন হিন্দু রমণীর মধ্যে একজন বিধবা, ইহাতে জাতিক্ষয় ত ঘটিবেই। কয়েক জাতি মধ্যে একই সঙ্গে শিশু-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ নিষেধ প্রচলিত। ইহাতে জাতির জননীর সংখ্যার অনুপাত আরও অধিক কমে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার নিঃস্বতায়, পরাধীনতায় ও নির্য্যাতনে কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা। বর্ত্তমান যুগে বিষয়টি সামাজিক, জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চ জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত না হইলে জাতিধ্বংস সুকর হইবে, তখন সমাজের স্কন্ধারোহণ করিয়া উৎকট সামাজিক বিধিনিষেধ গড়িবার কে থাকিবেন ?

হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমানের প্রায় দ্বিগুণ। ইহাতে যেমন হিন্দুর ক্ষয় তেমনি মুসলমানের বৃদ্ধি। শিশু-বৃদ্ধি মুসলমানের কত বেশী তাহা নিম্নের তালিকাটি পড়িলে বুঝা যাইবে।

	প্রতি হাজার হিন্দু		প্রতি হাজার হিন্দু	
বয়স	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০—৫	১৩৩	১৪৯	১৬১	১৭৭
৫—১০	১২৪	১২০	১৪৭	১৪১

একদিকে অতীব লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি আহারের আয়োজন ছাপাইয়া

যেমন জল-স্থলের অবনতির সূচনা করে, তেমনি লোকসংখ্যা এখন উন্নত স্তর হইতে না বাড়িয়া অশিক্ষিত ও অনুন্নত শ্রেণী হইতে ক্রম বর্দ্ধমান। ইহা সমাজের অধোগতিই নির্দ্দেশ করে। বাংলার এখনকার সবচেয়ে বড় সমস্যা কু-প্রজনন। শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে কেবলমাত্র কায়স্থই খুব বর্দ্ধিষ্ণু। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে যেখানে হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু সেখানে মুসলমান তাড়াতাড়ি হিন্দুর পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বিধবা-বিবাহে ও বহু বিবাহের ফলে মুসলমান গত পঞ্চাশ বৎসরে মোট লোকসংখ্যার মধ্যে হাজার করা ৬৪৫ হইতে বাড়িয়া ৭১০ হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পরে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতি দশজন লোকের মধ্যে একজন হইবে শিক্ষিত হিন্দু জাতি, ছয় জন হইবে মুসলমান, বাকী তিন জন হইবে অশিক্ষিত জাতি,—একজন মাহিষ্য, একজন নমঃশূদ্র, আর একজন রাজ-বংশী বা অপর কোন জাতি।

নিম্নের তালিকাটিতে এই সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য বুঝা যাইবে।

	মোট সংখ্যা (০০০ বাদ দিয়া)	শতকরা শিক্ষাপ্রাপ্ত (সাত বা ততোধিক বয়সের)	১৯০১ হইতে ১৯৩১ এই ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার শতকরা
ব্রাহ্মণ	১,৪৪৭	৬৪	২৪·১
কায়স্থ	১,৫৫৮	৫৭	৫৮·৩

	মোট সংখ্যা (০০০ বাদ দিয়া)	শতকরা শিক্ষাপ্রাপ্ত (সাত বা ততোধিক বয়সের)	১৯০১ হইতে ১৯৩১ এই ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার শতকরা
মাহিষ্য	২,৩৮১	৩২	২১˙৯
নমঃশূদ্র	২,০৯৪	১৪˙৫	১৩˙৩
রাজ-বংশী	১,৮০৬	৯˙০	৪˙৮
জোলা	২৭০	১৩˙৩	৩৯˙৫
		৫ বা ততোধিক বয়সের	
মুসলমান	২৭,৪১৯	১১˙৬	২৪˙৭
হিন্দু	২২,২১১	২৫˙৯	১১˙৩

যে-কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার চল্লিশের কম, তাহাকে সেন্সাসে ও সমাজতত্ত্ব হিসাবে অনুচ্চ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বাংলায় বৈদ্যরা সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত,—তাহাদিগের শিক্ষার হার ৭৭।

মুসলমানেরা নমঃশূদ্র অপেক্ষাও অল্পশিক্ষিত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা মুসলমান অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচগুণ বেশী শিক্ষিত। নিম্নলিখিত ছয়টি জেলায় নিম্ন-জাতিসমুদয় উচ্চ-হিন্দু-সংখ্যার অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক,—বর্দ্ধমান (৫৯˙৬) ; বীরভূম (৬৭), বাখরগঞ্জ (৫২), ফরিদপুর (৬০˙২), খুলনা (৬৫˙৪)।

সামাজিক বিপ্লব

সামাজিক বিভিন্ন স্তরের লোকসংখ্যা পরিবর্ত্তনের বৈষম্য বাংলায় একটা ঘোর সামাজিক অশান্তি ও বিপ্লব আনিতেছে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা হ্রাস না হইলে সব সম্প্রদায়েরই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সুদূর-পরাহত হইবে, কিন্তু লোক-হ্রাস বা জন্মশাসনের কথা বলিলেই বিরোধী সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রিক অধিকারের কথা উঠিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সহজ সমাধান আজ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে আর্থিক সুব্যবস্থা আনাই প্রধানতম কর্ত্তব্য। তাহাই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা পূরণের প্রধান সহায় হইবে। বাংলার আর্থিক সুবিন্যাসের দ্বারাই রাষ্ট্রিক অশান্তি ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর হইতে পারে। বাংলার রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের সেই দূরদৃষ্টি চাই, যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে বাড়িতে না দিয়া উচ্চ ও অনুচ্চ হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন, যথাসম্ভব কল্যাণকর আর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা (Economic planning) উদ্ভাবন করিতে পারেন। মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া তাঁহারা রাষ্ট্রিক অধিকারের নামে মিথ্যা ঈর্ষা ও কলহের বোঝা বাড়াইয়া সম্প্রদায় ও দেশকে একটা অলীক বস্তুর পশ্চাতে পরিচালনা করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের বাস্তব-জীবনোপযোগী একটা আর্থিক পরিকল্পনার উদারতা ও কর্ম্ম-কুশলতা চাই। দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদিগের জননায়কগণের রাষ্ট্র-বিন্যাসে ও সভ্য-নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক-নীতি অনুসরণের ফলে,

সাধারণের উপকারপ্রদ আর্থিক লোকমত গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না, পারিবেও না। কি মুসলমান, কি হিন্দু আপনার নির্ব্বাচকের গণ্ডীর সীমানার মধ্যে অতিরিক্ত সাহসিক প্রজাস্বত্ব-সংস্কার এমনভাবে প্রচার করিতেছেন যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের যাহাই হউক না কেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধনিক বা জমিদারের না ক্ষতি হয়। ইহার ফলে পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে বঞ্চিতের দলবল-জনসাধারণ বলিয়াই যেমন তাহাদের একটা অভাব ও অধিকারের ঐক্য স্থাপনের সুযোগ আছে, এদেশের নির্ব্বাচন-প্রথা সে সুযোগ দেওয়া দূরে থাক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া একান্নবর্ত্তী প্রজা-সমাজকে দ্বি-খণ্ডিত করিতেছে। রাষ্ট্রিক নেতার ব্যাপকতর-দৃষ্টির এই বিরোধকে প্রশ্রয় না দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সাধারণ আর্থিক কল্যাণক্ষেত্রে এক সূত্রে বাঁধিতে হইবে।

বহুজননের কুফল; জীবনীশক্তির ক্ষয়

শুধু তাহাই নহে; বাংলার কৃষ্টিকেও একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। নিম্নস্তরের লোক যে-কোন সম্প্রদায়েরই হউক, অধিকতর অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার যে ব্যত্যয় ঘটিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। আশঙ্কা হয় যে, বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে অনতি-বিলম্বে বাংলা সাহিত্যের ভাবান্তর ঘটিতে পারে। তুর্কীতে বহু-বিবাহ রোধ করা হইয়াছে। পার্শিয়াতেও মুসলমান-ধর্ম্ম বহু-বিবাহের প্রশ্রয় দেয় নাই। যেখানে সমগ্র জনসাধারণের আর্থিক জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হইতে চলিয়াছে, সেখানে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর চাকুরী লাভের

অজুহাতে লোকসংখ্যা সমস্যাটিকে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিচার করা অপরিণাম-দর্শিতার পরিচয়।

মুসলমান কৃষকের কল্যাণের জন্য বহুবিবাহ-আইন দ্বারা তুর্কীর মতই এ-দেশে বহুবিবাহ নিষেধ করা মুসলমান নেতারই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিশুর প্রবল বন্যা আর না বাড়াইয়া যাহাতে অধিক সংখ্যক শিশু বাঁচিতে পারে, ও মধ্য বয়সে ও বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানের সংখ্যা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের অনুরূপ বাড়ে, তাহার প্রতি মুসলমান সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন উচ্চ ও অনুচ্চ জাতি ও সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তির তারতম্য স্পষ্ট হইবে।

প্রতি হাজার পুরুষের সংখ্যা, বয়স অনুসারে

	০।৬	৭।১৩	১৪।১৬	১৭।২৩	২৪।৪৩	৪৪। ততোধিক
শিক্ষিত জাতি—						
১। ব্রাহ্মণ	১৬৩	১৫৬	৬৮	১৪৩	৩০৮	১৬২
২। কায়স্থ	১৭২	১৬৬	৭০	১৩৫	২৮৯	২৬৮
৩। বৈদ্য	১৭৩	১৭২	৮৫	১৪১	২৬১	১৬৮
মধ্য শিক্ষিত জাতি—						
১। মাহিষ্য	১৭৪	১৬৯	৬৯	১৩২	৩০১	১৫৫
অশিক্ষিত জাতি ও সম্প্রদায়—						
১। নমঃশূদ্র	১৮০	১৭৭	৬৫	১২৬	২৮৬	১৬৬
২। ডোম	১৬৮	১৫৯	৬০	১১৭	৩৪৪	১৫২
৩। জেলে-কৈবর্ত্ত	১৮৩	১৬০	৭১	১২০	২৯৩	১৬৮
৪। জোলা	১৯২	১৮৮	৬১	১১৪	৩০৪	১৩৭

অশিক্ষার মত মুসলমানের এই জীবনীশক্তির মান্দ্য সমগ্র বাঙালী জাতিকে কি দুর্ব্বল করিতেছে না? লোকসংখ্যা হ্রাসের পরিকল্পনা মৌলানা ও মৌলবীরা না দিলে, যে-পরিমাণে মুসলমান হীনবীর্য্য হইতে থাকিবে, জাতিও সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

যে-কোন জাতি বা সম্প্রদায় শুধু সংখ্যাধিক্যকে তাহার উন্নতির মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অচিরেই মোহ দূর হইবে। নমঃশূদ্র, ডোম বা জেলে-কৈবর্ত্ত অপেক্ষাও মুসলমানের মধ্যে হাজার-করা মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম। সংখ্যা বাড়িলে জীবনের ক্ষয়ও সেই পরিমাণে বাড়ে।

লোকবৃদ্ধি বনাম সম্পদহানি

বাংলা দেশে এখন এইটাই অত্যন্ত ভাবিবার বিষয় যে, কি উপায়ে লোকবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে লোকশক্তির ও সম্পদের বৃদ্ধি হয়। হিন্দুও বাঙ্গালী, মুসলমানও বাঙ্গালী, উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিও বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর সম্পদ বাড়িবে,—হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়, ববং সঙ্কোচে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকসংখ্যা ও কৃষি সম্পদের তুলনা-মূলক বিবরণ পরপৃষ্ঠার তালিকাতে দেওয়া হইল। সকল প্রদেশ অপেক্ষা যেমন বাংলা দেশে জন-প্রতি খাদ্য-শস্য-ভূমির পরিমাণ কম, তেমনই অপরদিকে বর্ত্তমান ব্যবসা-মান্দ্যে বাংলার ফসলের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে, অথচ ১৯২১—৩১ মধ্যে বাংলায় লোকবৃদ্ধি বড় কম হয় নাই।

ধান ও পাটের মূল্য গত দশ বৎসরে বাংলায় কি পরিমাণে কমিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	ধান		পাট	
	—মণ প্রতি—			
	টাকা	আনা	টাকা	আনা
১৯২৬-২৭	৭	৩	৮	৪
১৯২৭-২৮	৭	৮	৮	৪
১৯২৮-২৯	৬	১০	৯	০
১৯২৯-৩০	৬	০	৮	০
১৯৩০-৩১	৪	১	৩	৯
১৯৩১-৩২	৩	৫	৪	৪
১৯৩২-৩৩	২	১০	৩	৮
১৯৩৩ ৩৪	৩	০	৩	৮
১৯৩৪-৩৫	৩	৪	৩	৮
১৯৩৫-৩৬	৩	৮	৪	১৩

বাংলার প্রধান ফসল ধান ও পাট। ইহাদিগের মূল্য হ্রাসের জন্য বাংলায় শতকরা ৬১.১ কৃষি-সম্পদের হানি হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ হইতে কিছু মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব অনুপাতে বৃদ্ধি কমই। অথচ লোকবৃদ্ধির হার না কমাতে এবং শিল্প ব্যবসায়ের যথোচিত উন্নতির অভাবে ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার অন্নাভাব ও বেকার বাড়িতেছে।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	জনপ্রতি খাদ্য-শস্য ভূমির পরিমাণ (একার) ১৯২১	১৯৩১	শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি	১৯২১-৩১ লোকবৃদ্ধি বা হ্রাস শতকরা	লোকবৃদ্ধি অনুসারে ক্রম	১৯২৮-২৯ হইতে ১৯৩২-৩৩ এ উৎপন্ন প্রধান শস্যের মোট সম্পদের ঘাটতি	কৃষি সম্পদহানি অনুসারে ক্রম
পাঞ্জাব	২০৮	১'২	১'০৩	—১৪	+ ১৪	১	৩৬'৮	৬
যুক্ত প্রদেশ	৪৪২	১'৩	১'৩	সমান	+ ৬'৭	৭	৩৫'২	৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৭৯	১'৩	১'৫	+১৬'৬	+১০'৩	৩	৫৮'২	২
বাংলা	৬১৬	২'৮	২'১	— ৫৮'৩	+ ৮'৩	৬	৬১'১	১
মধ্য প্রদেশ এবং বেরার	১৩৭	'৯	০'৭	— ১৬'৬	+১২'৬	২	৪৮'৫	৪
বোম্বাই	১৭৪	'৯	০'৯	সমান	— ১'৮	৮	৩০'৪	৮
মাদ্রাজ	৩২৯	১'৪	১'৬	+১৬'৬	+ ৮'৫	৫	৪৫'০	৫
ব্রহ্মদেশ	৬৩	১'০১	১'০১	সমান	+১১'১	৪	৩৫'৫	৩
ভারতবর্ষ	১৯৫	'৫৮	'৬৯	+ ৯'২	+১০'৫	—	৪৭'৫	—

অনশন ও আহার্য্যের মাপকাঠি

উক্ত কারণে ব্যবসা-মান্দ্য-হেতু বাংলায় যেরূপ ব্যাপকভাবে অনশন ও দুরবস্থা দেখা গিয়াছে, সেরূপ অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের ১৯৩৬ সালে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীষ্মের সময় এই কয়েকটি জেলায় যেখানে গভর্ণমেণ্ট দিন মজুরদের কাজ দিবার জন্য রাস্তা তৈয়ারী ও পুষ্করিণী খনন করাইতেছিল, সেখানে গিয়া আমি একজন ডাক্তারের সাহায্যে অনেক মজুরের স্বল্প ও অপুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা ও ওজন লইয়াছিলাম। অনেক বাউরি ও সাঁওতাল মজুর তেঁতুল, অশ্বত্থ ও অন্যান্য গাছের পাতা খাইতেছিল,—বাবলা, অশ্বত্থ ও বটের ফল, চালের কুঁড়ো, কাঁঠালের ভোঁতা এমন কি মাছের আঁশ পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। দুই এক স্থানে ভদ্রপরিবারের মেয়েদিগকেও কাজ করিতে ও ভিক্ষা লইতে দেখা গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় সচরাচর যে-সব খাদ্যাভাব-জনিত ব্যাধি আসে, যেমন,—পা-ফোলা, চোখে ঠোঁটে ও পায়ে ঘা, আমাশয়, স্ত্রীলোকের ঋতুরোধ প্রভৃতি,—সে সকলই চোখে পড়িয়াছিল।

উত্তরভারতের তুলনায় বাঙ্গালীর আবশ্যকীয় খাদ্যের পরিমাণ কম। পাঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের লোকদিগের প্রয়োজনীয় ৩ হাজার ক্যালরী, বাঙ্গালীর ২,৪০০ হইলেও চলে। পরপৃষ্ঠায় লিখিত তালিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শরীরবিজ্ঞান-অনুমোদিত আহার্য্যের মাত্রা ও দ্রব্য-বিভাগ দেওয়া হইল :—

	ক্যালরী	প্রোটিন	মোট ক্যালরী হিসাবে আদান শতকরা	মেদ	শতকরা	কারবো-হাইড্রেট	শতকরা
		গ্রাম		গ্রাম		গ্রাম	
উত্তরভারত (আটা ডাল খাদক)	৩,০০০	৮৫	১১'৬	৬০	১৮'৬	৬০৫	৮২'৬৮
বাংলা এবং দক্ষিণভারত (ভাত ডাল খাদক)	২,৪০০	৭৫	১২'৮১	৫০	১৯'৩৭	৪৭২	৮০'৬৩
ম্যাক্‌কারিসনের মাপকাঠি	৩,৫০০	১০০	১১'৭১	৯০	২৫'৪৫	৪৫০	৫২'৭১

বাঙালীর খাদ্যের দোষ

বাঙ্গালীদের খাদ্যের দোষ হইতেছে,—উহাতে প্রোটিনের ভাগ কম এবং করবোহাইড্রেটের ভাগ বেশী। তাহা ছাড়া উহাতে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতব পদার্থ এবং ভিটামিন 'এ' ও 'বি'র অনটনও ঘটে। অধিকাংশ কৃষক-পরিবার গ্রীষ্ম হইতে বর্ষা পর্য্যন্ত একবেলা শাক বা নুন-ভাত খাইয়া থাকে, এমন কি ভাতের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে শাঁখালু খায়। অন্নসংস্থান থাকিলেও ভাত অধিক এবং ডাল অত্যন্ত কম খায় বলিয়া খাদ্যের অসমতা ঘটে। দুগ্ধ, ফল ও ব্যঞ্জনের বালাই-ই নাই। ইহার ফলে বাঙ্গালীরা আমাশয় ও পেটের অসুখ, বেরিবেরি, উদরী প্রভৃতি হইতে বেশী ভোগে। অনেক পল্লীগ্রামে শিশুদিগের মধ্যে দেহ-বিকাশের অতি বিলম্ব ঘটে এবং তাহাদের চক্ষুরোগও দেখা

যায়। কৃষকের ঘরে বালিকা জননীর ক্যালসিয়ম ও ভিটামিন-এর অনটন ঘটে। গর্ভস্রাব ও অকাল প্রসব বাংলাদেশে খুব বেশী। শিশুমৃত্যুও এই কারণে খুব অধিক। এই ত গেল সাধারণ বৎসরের দুরবস্থা। অন্নকষ্টের সময় এই সকল অপুষ্টিজনিত ব্যাধি খুব বাড়িয়া যায়।

দুর্ভিক্ষের সময় গৃহীত খাদ্যসমূহের বিশ্লেষণে বাংলায় যে পরিমাণে অনশন ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাপ দেওয়া হইল। (চিত্র দেখ)

ভবিষ্যৎ লোকবৃদ্ধি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আধুনিক যুগে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। বাংলার অবাধ, অপরিমিত লোকবৃদ্ধি ও কর্ষিত ভূমির অকুলান, অন্নকষ্টের কারণ। দুর্বৎসরে অন্নকষ্ট দুর্ভিক্ষের হাহাকারে পরিণত হয়। বহু যুগের বনানীর নাশ ও অসমতল ভূমিতে ত্বরিত জলপ্রবাহের ফলে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ক্রমশঃ শুষ্ক প্রান্তরে পরিণত হইতেছে। এই অঞ্চলই বাংলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্নকষ্টে পীড়িত। কিন্তু সমস্ত প্রদেশে এখন শস্য ও শস্যভূমির অকুলান, অথচ লোকবৃদ্ধির কোন জেলাতেই বিরাম নাই।

১৯৩১ সালের লোক-গণনায় অন্য দশক অপেক্ষা যে অনুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়সের শ্রেণী (০ হইতে ১০) বাংলায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে নিশ্চিত মনে হয় যে, ১৯৩১-৪১ সালে লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়া যাইবে। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে লোকবৃদ্ধির পরিমাণ দেখান হইল :—

বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে হ্রাসবৃদ্ধির হার

	সকল বয়সের	০—১০	১০—১৫	১৫—৪০	৪০—৬০	৬০ ও ততোধিক
১৮৮১-১৮৯১	+৭·৫	+৯·৬	+১১·৫	+ ৭·৯	+৩·২	+ ১·৬
১৮৯১-১৯০১	+৭·৭	+৬·৮	+১৫·১	+ ৯·৪	+৬·৭	+ ১·২
১৯০১-১৯১১	+৮·০	+৯·৩	+ ৫·৮	+১০·১	+৩·৬	+ ০·৯
১৯১১-১৯২১	+২·৮	− ১·২	+ ৮·৩	+ ৫·৩	+২·৫	− ৫·৯
১৯২১-১৯৩১	+৭·৩	+৮·৮	+১০·৭	+ ৮·৯	+৩·৫	−১৪·৬

শিশু-মৃত্যু ও পরমায়ুহ্রাস

এই লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাইতেছি অতিরিক্ত শিশুমৃত্যু, এবং মোট লোকসংখ্যা হিসাবে মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধের সংখ্যান্যূনতা। শিশুরা বাঁচিলেও তাহাদিগের সংখ্যাহেতু স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা অতি দুরূহ হইতেছে। ১০—১৫ বয়সের লোক ১০·৭ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ বৃদ্ধেরা (বয়স ৬০ ও ততোধিক) কমিয়াছে শতকরা ১৪·৬। এই কারণে বেকার ও কর্ষিত জমির উপর অতিরিক্ত ভার ও অন্ন-সমস্যা এত কঠিন হইয়াছে যে তাহা বিচিত্র নয়। এই দশকে য৩ লক্ষ লোক খাদ্যের জন্য মুখব্যাদান এবং কাজ জোগানের জন্য হস্ত উত্তোলন করিতে থাকিবে তাহাদের ব্যর্থতা ততই নিদারুণ হইতে থাকিবে। এদিকে জীবনীশক্তির ক্ষয় বাড়িবে বই কমিবে না। বাংলায় গত ৫০ বৎসরে গড়পড়তা ব্যক্তির আয়ু সমানই রহিয়াছে, বরং স্ত্রীলোকের কমিয়াছে। পরপৃষ্ঠার তালিকায় তাহা বুঝা যাইবে।

জন্মের সময় পরমায়ু-সম্ভাবনা ; ভারতবর্ষ, বাংলা ও ইংলণ্ড

	১৮৮১		১৮৯১		১৯০১	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
ভারতবর্ষ	২৩˙৬৭	২৫˙৫৮	২৪˙৫৯	২৫˙৫৪	২৩˙৬৩	২৩˙৯৬
বাংলা	২৪˙৫০	২৬˙৫১	২২˙৭৮	২৩˙৭৩	২১˙৫৭	২২˙৫১
ইংলণ্ড	—	—	—	—	৪৪˙০৭	৪৭˙৭০

	১৯১১		১৯২১		১৯৩১	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
ভারতবর্ষ	২২˙৫৯	২৩˙৩১	—	—	২৬˙৯১	২৬˙৫৬
বাংলা	২১˙৪৭	২১˙৫৮	—	—	২৪˙৯১	২৪˙৮০
ইংলণ্ড	৪৬˙০৪	৫০˙০২	৫৫˙৬২	৫৯˙৫৮	—	—

সমাজে বৃদ্ধ ও মধ্যবয়স্ক লোকের সংখ্যার অনুপাত কমিলে মানুষের ব্যবহারের রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বাংলায় সে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুতে বাঙ্গালী যে জীবন-সংগ্রামে হটিয়া যাইতেছে, সে-নিদর্শনও নিদারুণ। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালীর পরমায়ু এবং মোট লোকসংখ্যা হিসাবে বৃদ্ধের (৫০ ও ততোধিক) সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিয়ৎ পরিমাণে জলীয় আবহাওয়া, বাল্যবিবাহ ও ম্যালেরিয়া ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু একটি প্রধান কারণ অতীব লোকবৃদ্ধির জন্য জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধি। উদাসীন প্রকৃতি খড়্গাঘাতের জন্য বাছাই করিয়া ল'ন শিশুকে ও বৃদ্ধকে। বাংলাদেশে শিশু-মৃত্যু ও বৃদ্ধ-মৃত্যুর আধিক্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা,—মুখ্যভাবে আর্থিক

রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা যেমন হিন্দুকে তেমনই মুসলমানকে এবং তেমনই সমগ্র বাংলা দেশকে ক্রমশঃ দরিদ্র ও হীনবল করিতে থাকিবে। এদিকে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে যতই কৃষক-শ্রেণী অনশনক্লিষ্ট ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বেকার ও বিত্তহীন হইতে থাকিবে ততই সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কলহ ও সংঘর্ষ আরও বাড়িতে থাকিবে। পল্লীগ্রামে কৃষকের পরিধানে বস্ত্র ও উদরে অন্ন নাই; সহরে শিক্ষিত যুবকের চাকুরী নাই। তাই অতি সহজেই সহুরে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব মাঠ-ঘাট অতিক্রম করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা মুখ্যভাবে আর্থিক, গৌণভাবে রাষ্ট্রিক। মুসলমান ও অনুচ্চ জাতির চাষী ও কৃষাণ যদি মাঠে আবশ্যকীয় জমি এবং ঘরে উপযুক্ত আহার্য্য পায় তবে তাহারা ধর্ম্মের অজুহাত তুলিয়া রাষ্ট্রের নিকট অন্যায্য দাবী করিবে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান কৃষকের নিকট, ভোট, ব্যবস্থা পরিষদ্ বা মন্ত্রীত্ব—অবাস্তব, অলীক। যাহাতে সকল জাতি ও সম্প্রদায় লোকবৃদ্ধি করিয়া সংঘর্ষ না বাড়ায়, বরং কৃষি ও জীবন-যাত্রার উপর বংশবৃদ্ধির অনিষ্টকর প্রভাব বুঝে,—এইরূপ লোকশিক্ষা এখন দেওয়া চাই। যতদিন পর্য্যন্ত বাংলার প্রত্যেক নরনারী অবাধ বংশবৃদ্ধির ঘোর অনিষ্টকর ফল না বুঝিবে ততদিন দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে না, সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও উন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও অতিরিক্ত শিশু-মৃত্যু ও মাতৃ-মৃত্যু আমাদের সমাজের অপরিসীম পরিবার-বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যে-সমাজ নারীকে জননী বলিয়াই জানে, সেই সমাজে শিশুর অনাহার

ও মৃত্যু জননীকে যদি শত আঘাত ও ধিক্কার দেয়, তবে সে-সমাজ কি মাতৃত্বের উপযুক্ত সম্মান দিয়াছে ?

প্রাচীন ও নূতন পারিবারিক নীতি

ইংরাজী আমলে শান্তি ও শৃঙ্খলা যে বাংলার লোকবৃদ্ধির একমাত্র কারণ, তাহা নহে। চীন, জাপানের মত এদেশেও ছিল পূর্ব্বকালে ক্ষুদ্র পরিবারের আদর্শ। নানা প্রকার আচার-ব্যবহার ও বিধিনিষেধ দাম্পত্যজীবন ও প্রজননকে ঘিরিয়া রাখিত। সেবা ও সংযমের আদর্শ, গৃহস্থের যৌনজীবনে অনুষ্ঠিত বহু আচার ও নিষেধ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস —সবই অবাধ বংশবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিত। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কন্যার অনাদর, এমন কি হত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং শ্রমিক ও কৃষকের পক্ষে যৌনজীবনের সুযোগের অভাবও অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির প্রতিকূল হইয়াছে। কবে ও কোন্ সমাজ-বিবর্ত্তনের মধ্যে বাল্যবিবাহ এদেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইল তাহা আলোচনা না করিয়া এই কথা বলিলেই হইবে যে, বাল্যবিবাহ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ, আর বাল্যবিবাহ রোধ না করিতে পারিলে লোকবৃদ্ধি রোধ করা সুকঠিত। যে-দেশে নারী ১২ কিংবা ১৩ বৎসরে জননী হয়, এবং যে-সমাজে গৃহস্থালীর কাজ, মাঠ বা গোয়াল ঘরের কাজ নারীকে বিশ্রামের অবসর দেয় না, সেখানে যেমন সন্তান-উৎপাদন দ্রুত চলিতে থাকে, তেমনই নারীর স্বাস্থ্য বহু সন্তান ধারণ ও দ্রুত উৎপাদনের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

লোকবৃদ্ধি ও জীবন-যাত্রার দৈন্য

শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উন্নতি, নূতন বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রবর্ত্তন অথবা শিল্প-প্রসার দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শ বা মান যদি উচ্চতর হইতে থাকে, তবে জন্মহারও হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু সবদিকেই অতিরিক্ত লোকসংখ্যাই জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করিতে দিতেছে না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইলে, বিশেষতঃ নারীশিক্ষার বিস্তার হইলে, প্রজনন একটা প্রকৃতির খেলা না হইয়া গুরুদায়িত্বপূর্ণ একটা সামাজিক দান ভাবে পরিণত হইতে পারে,—ইহা আদর্শবাদের কথা। মহাত্মাগান্ধী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রবৃত্তিকে দমন লোকসংখ্যা সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। কিন্তু যাহা সমাজের উচ্চতম স্তরে খাটে তাহাকে জনসাধারণের ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। জনসাধারণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংযমের প্রচারকে লোকবৃদ্ধি-সমস্যার সমাধান মনে করা অলীক স্বপ্নমাত্র। ইহা লজ্জার কথা নহে; কারণ, কোন দেশেরই জনসাধারণ বশিষ্ঠ ও বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই।

শিশুর প্রবল সর্ব্বগ্রাসী বন্যা

লোকবৃদ্ধিহেতু দেশে এখন শিক্ষার বিস্তারও অসম্ভব হইয়াছে। কারণ, যত শিক্ষার আয়োজন করিতে পারা যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অশিক্ষিতজনের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকে। বাংলার লোকবৃদ্ধির সমস্যা শুধু দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাবের সমস্যা নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্যের

উন্নতিবিধান, সংস্কৃতির বিস্তার সবই সুদূরপরাহত হইতেছে। অপরদিকে লোকবৃদ্ধিহেতু কৃষক-পরিবারের কর্ষিত ভূমি যতই বহুধা খণ্ডিত হইয়া তাহার আহার্য্য সঙ্কুলানের অনুপযোগী হইতেছে, ততই তাহার মিতব্যয়িতাও কমিতেছে। মিতব্যয়িতা কমার জন্য দরিদ্রের গৃহে আসে শিশুর প্রবল সর্ব্বগ্রাসী বন্যা। ইহার জন্য উন্নত কৃষি-প্রণালী প্রচলন সুকঠিন। কারণ অতি ক্ষুদ্র জমিতে চাষ কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনই যোগাইতে পারে না। কৃষাণের সংখ্যাধিক্যের জন্য মজুরী কম বলিয়া শ্রমলাঘরের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনও কৃষক বা জমিদার অনুভব করে না। যেমন পল্লী-অঞ্চলে, তেমনই বৃহৎ শিল্প বা ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিতে, জনবৃদ্ধি বৈষয়িক ও সামাজিক চলাতে উন্নতি প্রতিরোধ করিতেছে। সহরে-সহরে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়িয়া মজুরীর হার বৃদ্ধি, শ্রমিকের বাসস্থান নির্ম্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যবিধ সামাজিক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানেরও বিঘ্ন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি যে প্রজাস্বত্বের সংস্কার না হইলে কৃষকের মিতব্যয়িতা ও জীবনের উচ্চতর আদর্শলাভ অসম্ভব, অতিরিক্ত, বিক্ষিপ্ত, জমি ও ভিটা বঞ্চিত কৃষাণশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংখ্যা আজ তাহারও প্রতিরোধ করিতেছে।

জন্ম শাসনে বৃহত্তর সামাজিক আদর্শ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এমন একটা অজানা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে, যাহা জনসাধারণ অচিরে ও সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। বাংলার স্থানে-স্থানে কৃষকদিগের মধ্যে জন্ম-শাসন অবিদিত নয়। পাছে পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জমি অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয় ও

একান্নবর্ত্তী পারিবারিক জীবনের ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য পল্লীঅঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক অথচ সহজ ও কার্য্যকরী জন্ম-শাসন যে প্রচলিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সহজ-কার্য্যকরী ও অল্পমূল্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-প্রণালী প্রচারে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু অনেক কমিয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে জীবন যে মূল্যহীন—এই দৃঢ় সংস্কার না ভাঙ্গিলে সমাজের কল্যাণ নাই। ঐ সংস্কার ভাঙ্গিতে হইলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা সন্তানধারণের পর্য্যায় ও অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল, আরও অনেকটা পরিবারের বৈষয়িক অবস্থা অনুযায়ী বাড়াইয়া দিলে তবে শিশুরও মঙ্গল, জননীরও মঙ্গল। এদেশে বাল্যবিবাহ্ প্রচলিত বলিয়া চীন, জাপান অপেক্ষা এদেশে জন্ম-শাসন আরও প্রয়োজনীয়, যেন নারী অন্ততঃ ২০ অথবা ২২ বৎসরের পূর্ব্বে এবং পুরুষ ২১ অথবা ২৩ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তান উৎপাদন না করে। মহাত্মাগান্ধী যে প্রবৃত্তি দমনের কথা বলিয়াছেন শুধু তাহার উপর নির্ভর না করিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে খানিকটা বৃহত্তর পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলে জনসাধারণের পক্ষে যে উচ্চতর জীবনযাত্রার আদর্শ বা মান অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, তাহা মানিতেই হইবে।

জন্ম-শাসন ও উচ্চশ্রেণীর সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি

সমাজের বিশেষ স্তরে বিশেষ নৈতিক অবস্থায় জন্ম-শাসন কুফলপ্রদ, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কেবল সমাজের উচ্চতর সোপানেই

যদি জন্ম-শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, অথচ অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণ অবাধ বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে জাতির কৃষ্টির অধোগতি অনিবার্য্য। বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমাজের উচ্চস্তরে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আজ আপেক্ষিকভাবে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু, যদি শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সব নূতন রীতিনীতির মতই সমগ্র সমাজে অচিরেই ছড়াইয়া পড়ে তবেই জাতির উদ্দেশ্য সফল হইবে। শিক্ষা বা জীবন-যাত্রার আদর্শের মত পারিবারিক জীবনে যথেচ্ছাচার ও অপব্যয় দমনের এই সুব্যবস্থা উচ্চশ্রেণী হইতেই নিম্নশ্রেণীতে প্রচার লাভ করিবে। বাংলার উচ্চশ্রেণীর নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা জাতির আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। এ দেশের নৈতিক আবহাওয়ায় তথাকথিত বিদেশী ব্যবস্থাটা যে অনেকটা রূপান্তরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম জাতিচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কোন-কোন অপ্রকৃতিস্থ সমাজস্তরে জন্ম-শাসন জাতিক্ষয়ের কারণ হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রশ্রয় দিয়াছে। তাই বলিয়া এ-দেশে তাহাই ঘটিবে ইহা অনুমান করা যায় না। কারণ যুগপরম্পরাবর্জ্জিত বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্ম্মানুশীলন জননকে ইন্দ্রিয়ভোগ বলিয়া গ্রহণ করে নাই, যৌনজীবনকে বৃহতের সম্মুখে রাখিয়াছে, ব্যাপকতর সামাজিক দৃষ্টিতে সন্তানধারণকে পঞ্চঋণের একটি ঋণশোধের ব্যবস্থা বলিয়া বিধান দিয়াছে, সূক্ষ্মতর মর্ম্মদৃষ্টিতে কামনার সঙ্গে বিরাট প্রসূতির অনন্ত সৃজনের যোগ রাখিয়াছে। এরূপ আবহাওয়ায় মনু বা মাল্‌থাস কথিত নৈতিক

জীবন ও সংযমের উপরই জন্ম-শাসনের ভার থাকে। তবুও যেখানে সংযম, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, সেখানে জন্ম-শাসন ব্যবস্থাটাই উপযোগী। কারণ ইহার অভাবে যে প্রাণ বহুধা বিচ্ছুরিত প্রক্ষিপ্ত হইয়া কামনার উপর দণ্ডায়মানা ছিন্নমস্তার মত আপনাকে আপনারই খড়্গদ্বারা হত্যা করে।

ক্ষুদ্র পরিবারমূলক নীতি

আসলকথা, জনসাধারণের পরিবারবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা ও নীতি জাগাইয়া তোলা। এই নীতির প্রধান সূত্র এই, প্রকৃতির সহজ অনিময়ে পরিবার বৃদ্ধি হইতে চলিলে মানুষ তাহার যুগজন্মার্জ্জিত কৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে না, মাতৃত্বের অবমাননা করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘোরতর দ্বন্দ্বের প্রশ্রয় দেয় এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও অলঙ্ঘ্য শাস্তি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে বরণ করিয়া আপনাকে দীনতম, হীনতম করিতে থাকে। একটা সুনিয়ন্ত্রিত, ক্ষুদ্র পরিবারের নূতন আদর্শ জনসাধারণ গ্রহণ না করিলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য ও মহামারী লইয়া দেশকে অনবরত ঘর করিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাপ নহে। অবাধ জন্মবৃদ্ধি করিয়া দারিদ্র্য ও মহামারী আনাই ব্যক্তির ও জাতির ভীষণ পাপ। ব্যক্তিগত নীতি হিসাবে নয়, বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্যে একটা সামাজিক অল্পজনন ও সুপ্রজনন নীতি গ্রহণ করা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর গুরু দায়িত্ব। জন্ম-শাসন ব্যবস্থাটা কৃত্রিম, কিন্তু ধাত্রীবিদ্যা ও সব চিকিৎসাই কৃত্রিম। কৃত্রিমতার কারণে উহার উপরেই শুধু নির্ভর করিলে চলিবে না। একটা ক্ষুদ্র পরিবারমূলক নীতির আদর্শ

গ্রহণ করিলেই, কি উচ্চ সমাজে, কি নিম্ন সমাজে জন্ম-শাসনের কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা দোষ থাকিবে না। ঐ ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই জন্ম-শাসনের উপকারিতা নিবিড়ভাবে জড়িত। ক্ষুদ্র পরিবার আদর্শ; বহু বিবাহ ও বহু সন্তান গুণরাশিনাশী। শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে আইনের দ্বারা, বহু-বিবাহ ও গার্হস্থ্য নীতি ও জন্ম-শাসনের দ্বারা বহু জনন প্রতিরোধ করিলে তবেই দেশের কৃষি ও জীবন যাত্রার আদর্শ উন্নতি লাভ করিবে,—কি পল্লীগ্রামে, কি সহরে, শ্রমের মর্য্যাদা বাড়িবে এবং যে-জীবনের বাহুল্য এখন চারিদিক হইতে শুধু নাশ ও অধো-গতিরই পরিচয় দিতেছে তাহা নূতন তেজে বলীয়ান, নূতন গুণে ও ও কর্ম্মানুশীলনে গৌরবান্বিত হইবে।

হিন্দুজাতির আত্মঘাত

একদিকে বহু বিবাহ ও বহু জননের বিরুদ্ধে যেমন সামাজিক বুদ্ধি ও বিচার প্রয়োগ করিতে হইবে তেমনই স্বাস্থ্য ও সুপ্রজননের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উচ্চ ও অনুচ্চ জাতিদিগের মধ্যে বহু বৎসরের সঞ্চিত জাতিগত সামাজিক ব্যবধান, শুচি ও অশুচিতার, খাদ্য ও অখাদ্যের মিথ্যা বিচার বর্জ্জন করিতে হইবে।

বাঙালী হিন্দুদিগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীজাতির সংখ্যান্যূনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু বিবাহের গণ্ডী, শ্রেণী ও কুল নির্দ্দিষ্ট করিয়া নহে, বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও যৌতুকদান প্রথা গ্রহণ করিয়া আমরা আজ স্ত্রীজাতিদ্রোহী, আত্মঘাতী।

বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের মধ্যে বিবাহের গণ্ডী এত ক্ষুদ্র হইয়াছে যে, তাহাদিগের মধ্যে এই কারণে বহু পরিবারে জননশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে।

নূতন দেবীবর ঘটক আসিয়া এখনকার গোত্র, শ্রেণী, মেল ও ঘর বন্ধন ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া নূতন করিয়া সমাজ না বাঁধিলে যে আমরা বাঁচিব না, সমাজতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী আমরা কবে শুনিব? পশ্চিম হইতে গঙ্গাতট দিয়া পূর্ব্ব অভিযান কালে যখন জঙ্গল ও জলাভূমির বুনো ও মৎস্যজীবী জাতি সমুদায়ের সঙ্গে তথাকথিত আর্য্যদিগের সংমিশ্রণের ভয় ছিল, পরবর্ত্তী যুগে যখন সমাজকে মহাযান বৌদ্ধ, বীরাচারী তান্ত্রিক ও সহজিয়া-প্রবর্ত্তিত ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদীপ্ত বাদশাহ-নবাব-প্রচলিত মুসলমান যুগে যখন দুষ্ট-সংস্রব, কদাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেছিল, যখন দেশ-বিদেশে যাতায়াত কঠিন ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল, তখন রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাদেশিক বিভাগ এবং শ্রেণী, মেল বা অন্য প্রকার কূল-বন্ধনের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল। মুঘল যুগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালোপের পর সমাজ তাহার জীবনীশক্তি হারাইয়া যখন কর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিল, তখন স্থানদোষ, কুলদোষ, সম্বন্ধদোষ প্রভৃতি ভয়াবহ হইল। শ্রেণী, কুল ও মেল লোহার বন্ধনে ক্রমশঃ সমাজকে বাঁধিয়া দিল। যে-কৌলিন্য পূর্ব্বে গুণ ও শীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা বংশানুক্রমিক হইল, এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের দ্বারা তাহার মর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি বিচারিত হইতে লাগিল। সমগ্র সমাজে একটা ধ্রুব বিশ্বাস-ধর্ম্মের মত লোকমত

এখনও পরিচালিত করিতেছে যে, নিম্নের ঘরে নামিয়া বিবাহ বংশে কলঙ্কের দাগ আনিয়া দেয়।

মৃত অতীতের জীর্ণ-কঙ্কাল এই বন্ধন ও বিশ্বাসগুলি আজ বাঙালী জাতির আত্ম-হত্যার কারণ হইয়াছে। নৃ-তত্ত্ববিদেরা বাংলার উচ্চ ও অস্পৃশ্য জাতির দৈহিক গঠনের বিশেষ তারতম্য মাপিয়া পায় নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহ-কল্পে যাবতীয় প্রাদেশিক অথবা অন্যপ্রকার শ্রেণী বা কুলবিভাগ বর্জ্জন এবং প্রত্যেক উচ্চ ও মধ্যম জাতির পক্ষে অন্তর্জ্জাতি বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ-প্রচলন জাতি-পুষ্টির প্রধান উপায়। মুসলমান হিন্দুর প্রতিবেশী ও আত্মীয়। তাহার সঙ্গে অসদ্ভাব হিন্দুসমাজের কম শক্তি-হ্রাসের কারণ নহে। উচ্চ জাতির কুসংস্কার নিতান্ত আধুনিক। তাহাই এখন হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সংশ্রবের অন্তরায় হইয়াছে। ইহা বর্জ্জন করিতেই হইবে। পল্লী-অঞ্চলে অনেক মুসলমান পরিবারে হিন্দুর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি অনুসৃত হয়। একশত বৎসরের মধ্যে যাহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদিগের মধ্যে মোল্লা-প্রবর্ত্তিত গোঁড়ামি প্রবেশ করে নাই, তাহারা এখনও শোকে-বিপদে হিন্দু দেবদেবীর প্রসাদ চাহে, দুর্গাপূজা ও জন্মাষ্টমীতে সার্ব্বজনীন আনন্দে যোগদান করে, মারীভয়ে শীতলা ও ওলা দেবীর শরণাপন্ন হয়, কৃষি-সম্পদ ঘরে তুলিবার সময় নবান্ন ভোজন করে, এমন কি বিবাহ বন্ধনের সময়ও হিন্দু লোকাচারের কিছু অংশ গ্রহণ করে। একদিকে স্পর্শ ও সংস্রব দোষ ঘুচাইতে পারিলে যেমন মুসলমানের গোঁড়ামি ও বল প্রয়োগ কমিবে অন্যদিকে হিন্দু-সমাজে যুগাভ্যস্ত ঔদার্য্য জাতিকে নূতন শক্তি ও সামর্থ্য দান করিবে।

সামাজিক সৌহার্দ্দ্য ও সংস্রব

একটি নিখিল-বঙ্গীয় সামাজিক কনফারেন্স আহ্বান করিয়া এই লৌকিক ও সামাজিক বিষম সমস্যাগুলির বিচার অবিলম্বে প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালী বর্ণ-সঙ্কর জাতি। যে-সকল যুগে বাংলার দ্বারগুলি বলপ্রদ নূতন রক্তপ্রবেশের জন্য মুক্ত ছিল, সেই-সেই যুগে কি রাষ্ট্রের ইতিহাসে শৌর্য্য-বীর্য্যের অক্ষয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, কি দেশে-দেশান্তরের কাষ্ঠে-মর্ম্মরে চারুশিল্পকলার অলৌকিক বাণী খোদিত করিয়া, কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অধ্যাত্মসাধনের নূতন ভক্তির কল্পতরু রোপণ করিয়া, বাঙালী অতীব উন্নতি দেখাইয়াছে। বাংলার এক অভিনব ধর্ম্ম, এক নূতন লৌকিক ললিত কলা ও সঙ্গীত-আভিজাত্য গৌরবকে যুগে-যুগে পদাঘাত করিয়াছে। মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই—ইহা শ্রীচৈতন্যের জাতিভেদ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচ নির্দ্দেশ। "সবার উপরে মানুষ বড় তাহার উপরে নাই" ইহাই বাংলার কৃষ্টির মর্ম্মবাণী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য-যুগের পরও বীরভদ্র খড়দহে একান্ত পরিত্যক্ত আড়াই হাজার বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীদিগকে বৈষ্ণব পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। রামকেলিতেও এইরূপ একটি অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। জাতি-নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্য ও পরবর্ত্তী যুগের শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র প্রভৃতির উদার লৌকিক ব্যবহার ও একত্রে আহার-বিহার জনসাধারণকে যেমন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, অপর দিকে তাহাদিগকে বিশালতর ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-জীবনে দীক্ষিত করিয়াছিল। বাংলাদেশে আসল

মনোময় রূপটির পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নশ্রেণীর সরল উদার সংস্কার-ভীতিহীন সমাজ-নীতি ও মরমিয়া (Mystic) ধর্ম্মানুশীলনের ভিতর। তাহাদিগের মধ্যে দরবেশীরা হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একত্রে গোঁসাইজীর নাম করে, মুসলমান ফকির বা মুসলমান সহজিয়া গুরুর নিকট দলে-দলে হিন্দু শিষ্যেরা ভক্তি নিবেদন করে। বাউল, সহজিয়া, বৈষ্ণব দলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্ব জাতির একটা অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। এখনও পর্য্যন্ত বাংলার জনসাধারণই একটা সহজ ও সরল অপরোক্ষ অনুভূতি, একটা সার্ব্বজনীন দেহতত্ত্ব ও একটা অদ্বিতীয় 'মনের মানুষের' প্রতি ভক্তি সজীব রাখিয়া বাঙালীর কৃষ্টির মানবিকতার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার জন্ম হইয়াছে যে সেই চির-কলতান উদার গঙ্গাবক্ষে সুনির্ম্মল আকাশের নীলিমার তলে, দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শষ্প শীর্ষে ঢেউয়ের শিহরণে। নব-নাগরিক সভ্যতার বহুদূরে বাংলার কৃষ্টির লীলা-নিকেতন পল্লী-ভবনে, সযত্ন-সঞ্চিত এই জাতীয় মনোময় রূপটিকে উদ্ঘাটন করিয়া আবার রক্ত সংমিশ্রণের দ্বারা নূতন করিয়া জাতি ও সমাজ পত্তন করিতে হইবে। জাতি-বিদ্বেষ দূর করিয়া, উদার বিবাহ-রীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান, উন্নত ও অবনত জাতির মধ্যে সামাজিক ভেদ বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনে সার্ব্বজনীনতা যেমন ক্ষয় হইতে জাতি রক্ষা করে তেমনি তাহা গোড়ামি ও আনুষ্ঠানিকতা হইতে ধর্ম্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কৃষকের উর্ব্বরা শস্যভূমি ও কুটির-শিল্পের প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশি হইতে জাতিকে নূতন তেজ সংগ্রহ করিতে হইবে, তবেই জাতি রক্ষা পাইবে। কত তুষার পর্ব্বত, কত মরুভূমি, কত উপত্যকার প্রস্তর

মৃত্তিকা বালুকা মিশিয়া বাংলার এই পলিমাটি গড়িয়াছে। বাঙালী জাতিও তেমনি উত্তর ভারতের ও পূর্ব্ব ভারতের কত না জাতি ও অনুজাতির রক্ত ধারণ করিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর, কোমল সিকতাভূমিতে আপনার সভ্যতা গড়িয়াছে। এমন কি কখনও হইতে পারে যে, আমরা এই বৈজ্ঞানিক যুগে সব জানিয়াও নূতন রক্ত সংমিশ্রণের দ্বারা নূতন সুপ্রজনন-রীতি গ্রহণের দ্বারা আমাদের জৈবিক ধারা রক্ষা করিতে চাহিব না? বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার ইহা অপেক্ষা কি বেশী হইতে পারে!

প্রগতির ত্রিবিধ পরিকল্পনা

প্রকৃতির বিপর্য্যয়, নদ-নদীর গতি হ্রাস ও প্লাবন বৃদ্ধি, হিন্দু ও মুসলমানের হিংসা বিদ্বেষ, উন্নত ও অবনত হিন্দুর নিষ্ঠুর অমানুষিক ব্যবধান এক যুগের সমস্যা নহে; ইহা বহু যুগের স্তূপীকৃত ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাধি। ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে দূরদর্শী ভবিষ্য পরিকল্পনা চাই। এই পরিকল্পনা আমার মনে হয়, তিন দিক হইতে আবশ্যক, —নদী-সংস্কার, পল্লী-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার। (ক) নদী-সংস্কার বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, উত্তর বঙ্গ অথবা বিহার অঞ্চলে গঙ্গায় অথবা ময়ুরাক্ষী, দামোদর, দ্বারকেশ্বরে বা তিস্তায় বাঁধ বাঁধিয়া তাহার সাহায্যে খাত (Canal) কাটিয়া জল-সেচের ব্যবস্থা করা; খাতের জল-প্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক-শক্তি উদ্ভাবন করিয়া গ্রামের কুটিরে কুটিরে তাহা পৌছাইয়া দিয়া শিল্পের পুনরুদ্ধার করা; জীবিত নদী হইতে খাত কাটিয়া আনিয়া মরা নদীকে বাঁচাইয়া তুলা ও কৃষির

উপকারে জল-প্লাবন নিয়ন্ত্রিত করা (Bonification)। (খ) পল্লী-সংস্কার, নদী-শাসন ও সংস্কারের উপরেই অধিক নির্ভর করে। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন ও জল নিকাশের দ্বারাই বাংলার কৃষি-সম্পদ বা স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্ভব। ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে যৌথ-ঋণদান ও শস্য বিক্রয় আপনি উন্নতি লাভ করিবে। বর্গাদার, আধিয়ার দিন-মজুর বা অন্য কোন প্রজাস্বত্ব-বিহীন কৃষকের রক্ষা কল্পে জমি-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনেরও সংস্কার আবশ্যক। বাংলাদেশে এই যুগে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা ঠিক, কিন্তু জমি ও জমি হইতে উৎপন্ন সম্পদ শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে বিভক্ত হয় নাই। বিত্তহীন বেকার, মধ্যবিত্ত ও ভূমিহীন কৃষকশ্রেণীও দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বঙ্গদেশে চাষের জমিও ভাগবাটোয়ারার জন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা গড়পড়তায় ক্ষুদ্রতম। যে হলধারী ভাগহিসাবেই হউক বা দিন-মজুর ভাবেই হউক কোন জমিতে তিন বৎসরের অধিক চাষ করিয়াছে, তাহাকে জমির উত্তরাধিকার ও প্রজাস্বত্ব দিয়া, উত্তরাধিকারের আইন পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষির অনুপযোগী অল্পায়তন জমির ভাগ বন্ধ করিয়া দিয়া এই সকল সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজনীয়। (গ) সমাজ সংস্কারের গোড়ার কথা হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চ ও অনুচ্চ জাতির মধ্যে সামাজিক সংস্রব ও সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি; অন্তর্জ্জাতি বিবাহ প্রচলন; উচ্চ জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও মুসলমানের বহু বিবাহরীতি বর্জ্জন; বহু প্রজননের পরিবর্ত্তে সুপ্রজনন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ; যে সকল জাতির মধ্যে স্ত্রী-জাতির আপেক্ষিক সংখ্যান্যূনতা দেখা গিয়াছে তাহাদের বিবাহগণ্ডীর পরিসরতা বৃদ্ধি ও বিবাহ-রীতির আমূল সংস্কার। নদী সংস্কার না

হইলে যেমন পল্লী সংস্কার অসম্ভব, তেমনি সমাজের অসম্ভব দাবী ও বিধি নিষেধ, কু-শিক্ষা ও কু-আচার আজ নিম্নস্তরের জাতি ও সম্প্রদায়ের বংশবৃদ্ধি ও উচ্চ জাতি ও সম্প্রদায়ের বংশহানির কারণ হইয়া জাতিকে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত করিতেছে। অথচ সমাজ বা বিবাহ-সংস্কারের একটু কথা উঠিলেই আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখক ও সম্পাদক গর্জ্জিয়া উঠেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার আরক্ত নয়নের মত অন্ধ গোঁড়ামির কি শোচনায় শেষ অভিব্যক্তি!

নদী ও রক্ত সংমিশ্রণ

গাঙ্গেয়ভূমির ব'প্রদেশবাসী আমাদের জলই হইতেছে আসল সম্পদ। বাংলার বৃষ্টিপাত বিহারের দেড়গুণ, যুক্তপ্রদেশের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। বাংলার অনেক অঞ্চলে মাটির উর্ব্বরতা জমির মূল্য নির্দ্ধারিত করে না, উহা নির্দ্ধারণ করে নদীর পঙ্কিল জলাভিষেক। জল-সঞ্চারী বাঙালীর প্রধান খাদ্য-শস্য জলে হয়, জলে বাঁচে, দ্রুতবর্দ্ধমান প্লাবন-রেখার তালে-তালে তাহার শীর্ষ তুলিতে থাকে। বাংলাদেশের যে-অঞ্চল বর্ষারম্ভে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মার প্লাবনে নিমজ্জিত হয়, সেখানেই কয়েক মাস পরেই দিগন্তবিস্তৃত আমনধানপংক্তি কৃষকের ও বণিকের মন হরণ করে। নদীর জল ব'প্রদেশে সীমানা মানে না; আর সেই জলই অসামান্য কৃষি-সম্পদের কারণ হইয়া লোকপালন ও বৃদ্ধি করিতে থাকে। বাংলাদেশের যে-সব জেলায় আমন ধানের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইতে দশ ভাগের নয় ভাগ, সেই জেলাগুলিই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকবহুল। ব'প্রদেশে নদী যে শুধু জল ও স্থলের

প্রভেদ ঘুচায় তাহা নহে, উপত্যকা ও নদীর মালভূমি হইতে আগত, বিক্ষিপ্ত ও বিতাড়িত জাতি সমুদায় ব'প্রদেশে আসিয়াই বিপুল বর্দ্ধিত ও সংমিশ্রিত হয়। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, কৃষক ও ধীবর, বুনো বা বৈশ্যের রক্ত তখন পুঁথি অথবা লোক-প্রবাদ ছাড়া আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাঙালীর রক্ত ও মাংস, কৃষি ও সম্পদ সব দিয়াছে বাংলার জল। বাঙালী পারদর্শিতা দেখাইয়াছে জলে, শস্য-রোপণে, নৌবাণিজ্যে, জল-যুদ্ধে। জলের দ্বারাই বাঙালী সেনাপতি মানসিংহ ও মিরজুমলাকে অক্রমণ করিয়াছিল। ইংরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন হইয়াছিল পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, রণতরী সাহায্যে সাগরদ্বীপ হইতে বাণ্ডাল পর্য্যন্ত হুগলী নদীর অধিকার লাভ করিয়া। বাংলার বন্দর তাম্রলিপ্ত, সাতগাঁ, সোণারগাঁ, চট্টগ্রাম যুগে-যুগে সাত সাগরের ধনে ও কৃষ্টিতে বাঙালীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। যুগে-যুগে বাঙালী বণিক, শিল্পী, শিক্ষক ও পর্য্যটক অর্ণবপোতে বাংলার কৃষি ও শিল্প লইয়া শ্যাম, কাম্বোজ, দ্বীপময় ভারত, সুদূর চীন পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। এক হাজার বৎসরের বন্দর (খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম হইতে দশম খৃষ্টাব্দ) তাম্রলিপ্তি এখন হলদী-রূপনারায়ণের বালুকা-স্তূপের মধ্যে প্রোথিত। মধ্যযুগের প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রাম এখন জঙ্গলাবৃত। কলিকাতাও হয়ত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ভাগীরথী-মোহানার অবনতি ও পশ্চিম বঙ্গের সম্পদ ও স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু বন্দর ভঙ্গুর হইলেও নদী সমুদ্র বাংলাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি ও রক্ত সংমিশ্রণের সুযোগ দিয়াছে।

বাংলার চঞ্চলা শ্যামা ভাগ্যলক্ষ্মী নদীপথবাহিনী। কখনও তিনি রূপনারায়ণ, ভৈরব ও সরস্বতী, কখন বা ভাগীরথী, আত্রেয়ী ও করোতোয়ার বিশালবক্ষে তাঁহার ভাসমান বিপণী সজ্জিত করিয়া বিদেশী বণিকের উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও বা হুগলী, পদ্মা ও মেঘনার বক্ষে রণতরী সাজাইয়া রক্তাঙ্কিত নদীজলে রাজমুণ্ড ও মুকুটমালা লইয়া তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ যুগের হিমালয়ের শিলা ও গাঙ্গেয় ভূমির মৃত্তিকা যেমন তাঁহার অস্থি পঞ্জর গঠন করিয়াছে তেমনি তাঁহার শিরায়-শিরায় রক্ত আনিয়া দিয়াছে বহু যুগের বহু নদী পথে ধাবিত বহুজলস্রোত। তাই ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের যেমন চিরকাল গাঙ্গেয় সমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধকে অবজ্ঞা কবিয়াছেন, কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সাধারণের সুগম্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কখনও বা বীরাচার বা সহজিয়া সাধনের দীক্ষা দিয়াছেন, তেমনি যুগে-যুগে শিক্ষা দিয়াছেন একটা অপূর্ব্ব সমদর্শী পতিত-পাবন নীতির। আজ আমাদিগকে উদারতার সমাজ-গঠনী প্রতিভা লইয়া নূতন জাতি-নাশা ভক্তি ও প্রেমের অপরাজিতায় কৃষ্ণবর্ণ জাতির কৃষ্ণবরণী দেবীকে আরাধনা করিতে হইবে। বাংলার সমাজ ও কৃষ্টির মৃত্যু সেই দিন,—যেদিন নদ নদীতে কৃষ্ণলহরী আর খেলিবে না, শস্য ও বনভূমিতে আষাঢ়ের কৃষ্ণ মেঘের ছায়া আর পড়িবে না; শুধু তাই নহে, যখন বাংলার একই আকাশে বাতাসে পালিত কৃষ্ণবর্ণ জাতি ও সম্প্রদায়, দেশ ও ধর্ম্ম ভুলিয়া পরস্পরকে ঘৃণা ও অবমাননা করিবে, সামাজিক আচারে-ব্যবহারে পরস্পরকে হিংসা ও আঘাত করিবে সেদিনও বাঙ্গালার বড় দুর্দ্দিন। কৃষ্ণবরণী বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী

আমাদিগকে যুগ-পরম্পরা-প্রদর্শিত ঔদার্য্য, সমদর্শিত ও সৎসাহস দিয়া এই মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন।

অদূর ভবিষ্যতে বাংলার চঞ্চলা লক্ষ্মী ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পশ্চিম বঙ্গ ও তাহার মহানগরী কলিকাতায় বিশালসৌধ ও বিপণী পরিত্যাগ করিয়া বালার্ককিরণোজ্জ্বল বিপুলতোয় সাহাবাজপুর বা সন্দ্বীপ নদীতটে তাঁহার সিংহাসন বসাইতেছেন। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অগাধ জলরাশির কল্লোল, বরিশালের কামান-গর্জ্জন তাঁহাকে সেখানে অভিষেকমন্ত্র শুনাইতেছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের নূতন সম্পদ, বীর্য্য ও যৌবন আজ তাঁহার রত্নবেদী সজ্জিত করিতেছে। আজ বাঙালী জাতি তাহার শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে, রাষ্ট্র-ধর্ম্মে নূতন ঔদার্য্য ও সার্ব্বজনীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আবাহন করুক। বিরূপা হইলে যে তিনি মৃত্যুর তাণ্ডব-নৃত্যের তালে-তালে রাষ্ট্র ও সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কোন অতল সমুদ্র-তলে বাংলার অতীত শোভা ও সম্পদ লইয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা

দারিদ্র্যের পরিমাপ

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের এই প্রভেদ যে, বিজ্ঞান বহু ও বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করিয়া মূল সূত্র ও সাধারণ নিয়ম বাহির করে এবং তথ্য সমুদায়ের আলোচনার মাপকাঠির সাহায্যে বিশিষ্ট শক্তির বিচার ও গতিনির্দ্ধারণ করে। এ কথা অর্থ-বিজ্ঞানেও খাটে। বরং অর্থ-বিজ্ঞান সমাজবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া আর্থিক অভাব ও শক্তির আলোচনা মানুষের সুখদুঃখের রঙে বিচিত্র ও অন্তরঙ্গ সামগ্রী হইয়া উঠে, মানুষের আদর্শের রেখাপাতে গভীর মর্ম্মস্পর্শী হয়।

ভারতবর্ষ যে অভাবগ্রস্থ তাহা সকলেই জানে বা অনুভব করে। বৈষয়িক বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে এই অভাব বা দুর্দ্দশার পরিমাপ করা, তাহার ফলাফল অন্তর্জগতের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জগতের মানদণ্ডে পরখ করা, এবং অভাব বা দুর্দ্দশা মোচনের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা।

পরিমাপ করিতে যাইলেই সংখ্যার আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং বৈষয়িক বিজ্ঞান পদার্থ-বিজ্ঞানের মতই যে দ্বিধা বা সন্দেহ হইতে বিমুক্ত ও বস্তুতান্ত্রিক হইতেছে তাহা সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে।

দিকে অর্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ই হইতেছে মানুষের অভাবের সঙ্গে, তাহার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে, অশন বসন প্রভৃতি বা ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণের হ্রাসবৃদ্ধি নির্দ্ধারণ।

লোকবাহুল্যের মাপকাঠি

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য সবদেশেই সব কালেই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষের অভাব অনটনের আলোচনা করিতে গেলেই গত শতাব্দীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিবিস্তারের অনুপাতের আলোচনা গোড়াতেই করিতে হয়। আকবরের মৃত্যুর সময় ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ছিল আন্দাজ দশ কোটী। গত তিন শতাব্দীতে লোকসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	লোক সংখ্যা কোটী লক্ষ	লোকবৃদ্ধির হার
১৬০০	১০— ০	—
১৭৫০	১৩— ০	—
১৮৫০	১৫— ০	—
১৮৭২	২০—৬০	—
১৮৮১	২৫—৪০	১·৫
১৮৯১	২৮—৭০	৯·৬
১৯০১	২৯—৪০	১·৪
১৯১১	৩১—৫০	৬·৪
১৯২১	৩১—৯০	১·২
১৯৩১	৩৫—৩০	১০·৬
১৯৩৫	৩৭—৭০	৬·৮

জেনেভাতে এক বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে অধ্যাপক ইষ্ট নির্দ্ধারণ

করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য অন্ততঃ আড়াই একর জমির প্রয়োজন। প্রাচ্য জগতে উত্তাপ ও সিক্ততা হেতু মানুষের আহার্য্য কম এবং মরসুম বৃষ্টির প্রভাবে জমি অনেক অঞ্চলেই একাধিক বার পর্য্যন্ত ফসল উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের কৃষির আলোচনা করিয়া আমরা একটা সাধারণ মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারি যে প্রত্যেক পরিবারে অন্ততঃ ৫ একর জমির প্রয়োজন। চীনদেশেও ৫।৬ একরের কমে কৃষক পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে না। ভারতবর্ষে পরিবারের গড়পড়তা পরিজনের সংখ্যা ৪˙২ এবং চীনে ৫˙৪ জন। ইহা হইতে আমরা এই নির্দ্দেশ করিতে পারি যে অন্ততঃ জন পিছু ১ একর চাষের জমির প্রয়োজন এবং চীন ও ভারতবর্ষের লোকবাহুল্যের সূচক সংখ্যা হইবে, ১ একর জমিতে প্রতি প্রদেশের লোক পিছু আবাদী জমির দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই।

প্রাচ্য জগতের লোকবাহুল্য

দেশ	লোকসংখ্যা		আবাদী-জমি		লোকবাহুল্যের	লোকবাহুল্যের
	কোটি	লক্ষ	মোট (১০০০,০০০)	জন-প্রতি	(ইষ্ট)সূচক সংখ্যা	সূচক সংখ্যা (পরিবর্ত্তিত)
জাপান	৬	৬৩	২৩˙৯	০˙৩৬	৬˙৯৪	২˙৮
চীন	৪৫	০	২০৮	০˙৪৪	৫˙১	২˙৩
ভারতবর্ষ	৩৭	৫০	২৯৮˙১	০˙৭৮	২˙৮	১˙৩
সোভিয়েট রুশিয়া	১৬	৫৭	৭০০˙০	৪˙২	০˙৫৯	০˙২৪
আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য	১২	৫০	৪১৩˙২	৩˙৩	০˙৭৭	০˙৩০
কানাডা	১	৩	৩০০˙০	২৮˙৯	০˙০৮	০˙০৩

নিরন্নের সংখ্যা

আবাদী জমির ন্যূনতা হইতে লোক-বাহুল্যের একটা সোজাসুজি ধারণা হইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতে উহার বিচার আরও সুস্পষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে, যে, দেশে ক্রমশঃ চাষের জমি ও মোট খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও লোকসংখ্যা ও খাদ্য জোগানের নির্ঘণ্টের বিয়োগ-সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। ইহা দেশের খাদ্য জোগানের অবনতিরই সূচনা করে। বিশেষতঃ গত ৪ বৎসর হইতে লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগেকার বৎসর হইতে ১৯ লক্ষ ও ৭ লক্ষ টন কমিয়াছে। ১৯৩৪ সালেও ৮ লক্ষ টন উৎপাদন কম হইয়াছে। গম উৎপাদন ১৯৩২ সালে কমিয়াছে, কিন্তু এই কয় বৎসর কিছু বাড়িতেছে। বাংলাদেশে সুবৎসরেও আমাদের দেড লক্ষ টন ধানের পরিমাণ কম্‌তি হয়, তাহা বর্ম্মা হইতে আসে।

এক দিকে যাবতীয় খাদ্যশস্য, দুধ মাছ প্রভৃতি ধরিয়া খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ধরিয়া এবং বীজশস্য ও অপচয়ের হিসাব করিয়া এবং অপরদিকে জনপ্রতি অবশ্য প্রয়োজনীয় আহার্য্যের হিসাব করিয়া আমি নিম্নলিখিত তথ্যে উপনীত হইয়াছি,—

(ক) ১৯৩১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫·৩ কোটী।

(খ) ১৯৩১ সালে খাদ্যের যোগান অনুসারে ভারতবর্ষের লোক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা ২৯·১ কোটী।

(গ) ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব ৪২০০ কোটী ক্যালরী।

(ঘ) ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩৭·৭ কোটী।

(ঙ) ভারতবর্ষের এখনকার খাদ্যাভাব ৪১১০ কোটী ক্যালরী।

(চ) যদি অন্য সকলে যথাযথ আহার্য্য পায় তাহা হইলে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা ৪·৮ কোটী।

খুব সম্ভবতঃ ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪০ কোটী। এই বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটীরও অধিক হইবে।

কৃষির অবনতি ও অবস্থা

এ দিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু চাষের জমি এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে ও কৃষকের পরনির্ভরতা এত বাড়িয়াছে যে শস্য পরিমাণের হার বাড়ান সুকঠিন। কেবলমাত্র গম ও ধানের প্রতি একর উৎপাদনের হার (পাউণ্ড হিসাবে) তুলনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি ঃ—

	ভারতবর্ষ	চীন	পৃথিবীর উৎপাদনের মান
ধান	৯৮৮	২,৪৩৩	১৪৪০
গম	৮১১	৯৮৯	৮৪০

অথচ এটা ঠিক, যে রকম আমাদের দেশে জনবাহুল্য, জনশিক্ষা ও জমির ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে শিল্পোন্নতি অপেক্ষা চাষের সুব্যবস্থার উপরই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অধিক নির্ভর করিতে হইবে। বসুন্ধরা আজ জনভারাক্রান্ত, কিন্তু মৃত্তিকা হইতেই ভারতবর্ষকে

লোকপালনের জন্য আহার্য্য, নিত্য ব্যবহার ও বিলাসের উপকরণ গ্রহণ করিতেই হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণের একটি ধারণা ছিল যে, শিল্পোন্নতিই আমাদের একমাত্র কল্যাণের পন্থা। পৃথিবীময় আর্থিক সঙ্কট ও শস্যের অল্পমূল্যতার দিনে ভারতবর্ষ আজ বুঝিয়াছে যে, যদি আমাদের কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে জমি অনেক পরিমাণে রপ্তানি বা ব্যবসায়ের শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, কিম্বা দেশীয় শিল্পের কাঁচামাল জোগান দিয়া শিল্পপ্রসারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। ইহাতে কৃষি ক্ষেত্রে যে বিষম লোকবাহুল্য ঘটিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, জাপানের ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি একর পিছু বাংলা দেশ অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ ও ইতালীতে ৬ গুণ। যদি আমরা ধান চাষের উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়াইতে পারি তাহা হইলে আরও কতক পরিমাণে বাংলায় আখ, সরিষা, তিসি, তিল ও চীনা বাদামের চাষ বাড়ে। ইহাতে এক দিকে যেমন খাদ্যের সঙ্কুলান হয় অপর দিকে কাঁচামালের সাহায্যে গ্রামে-গ্রামে ছোট-খাট শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন অর্থাগম ও কৃষির গুরুভার মোচনের উপায় হয়।

বাংলা-দেশে চাষের অবনতির কথা আমি অনেকবার উত্থাপন করিয়াছি। নদনদীর গতিহ্রাস ও মৃত্যুহেতু বাংলা-দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন ধ্বংসোন্মুখ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণে এই কয়টি জেলায় চাষের অধোগতি হইয়াছে।

আবাদীজমির পরিমাণ হ্রাস

(শতকরা)

হুগলী	৪৫
বর্দ্ধমান	৪০
যশোহর	৩১
মুর্শিদাবাদ	১৪
নদীয়া	৭

এইরূপ আরও অন্য জেলায় যেমন কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিতেছে, তেমনই জঙ্গল বা জলাভূমি, ক্ষেত, পথঘাট ও বসবাস পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বাংলা দেশে যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও অসমতল, সেখানে আউস ধানের পরিমাণ বেশী। আউস ধান যেখানে বেশী সেখানে লোকসংখ্যাও কম। আউস ধান বাংলার ব'-প্রদেশের অধোগতিই সূচনা করে। যদিও মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সব জেলাতেই আউস ধান বাড়িতেছে, কিন্তু বীরভূম, বর্দ্ধমান ও যশোহর জেলায় এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, এসব জেলায় আউসও খুব বেশী পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্যের এই পরিমাণহ্রাস কৃষকের দুর্গতির পরিচায়ক। বাংলাব অনেক জেলাতেই পুষ্করিণী মজিয়া যাওয়ায় ও বাঁধগুলি রক্ষিত না হওয়ায় রবিশস্য অধিক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে রবিশস্যের চাষ কয়েকটি জেলায় নিম্নলিখিতভাবে কমিয়াছে ঃ—

মুর্শিদাবাদ ১৮২,২০০ একর; নদীয়া ১৪,১০০ একর; বর্দ্ধমান ২১,১০০ একর; যশোহর ১৫,৬০০ একর। বাঙ্গালী মানুষ হয়

তেলে-জলে, কিন্তু কিছুকাল হইতে বাংলা-দেশে সরিষা, তিসি প্রভৃতির চাষ বিশেষ কমিয়া যাইতেছে। সরিষার তেল বাঙ্গালীখাদ্যে স্নেহ উপাদান, মেদের প্রধান উপকরণ, তাহা ছাড়া জলীয় আবহাওয়ায় তেল-ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশ, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে সরিষা ও অন্যান্য তৈল-বীজ আমদানি করিতেছে। ১৯২৪ সালে বাংলা-দেশে ১০ লক্ষ একর তৈলবীজ-শস্যের চাষ ছিল, ১৯৩৪ সালের পরিমাণ একই রহিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন জেলায় তৈল-শস্যের যে অবনতি হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

মুর্শিদাবাদ ১৯,৪০০ একর ; নদীয়া ৩,৭০০ একর ; বর্দ্ধমান ৪,৫০০ একর ; যশোহর ৫,৫০০ একর।

প্রোটিনবহুল ফসলের পর্য্যায়

বাংলা-দেশে যে-সব জেলায় এমন পাট-চাষ কমান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, সেখানে সরিষা ও রেড়ীর চাষ ও শণ ও মাসকলাই বাড়াইলে পাটের অভাব পূরণ হইবে। পাটের জমিতে যে-উর্ব্বরতার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী, শণ ও মাসকলাই উৎপাদনে তাহার অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। বাংলাদেশে পাটের চাষ অনেক অর্থ আনিলেও চাষের রীতি-নীতি ও পর্য্যায়কে এমন পরিবর্ত্তিত করিয়াছে যে, ইহাতে ঘোর অনিষ্টও ঘটিয়াছে। পাট-চাষ কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে রবিশস্যের চাষ অবলম্বন করিলে,—বিশেষতঃ যে-সব ডাল ও শুঁটি বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রোটিনের প্রধান পরিপোষক এবং যে-তৈলবীজ মেদের পরিপোষক

তাহার চাষ ক্রমশঃ বাড়াইতে পারিলে,—বাঙ্গালী-কৃষকের খাদ্য, শরীর-বিজ্ঞানের অনুসারে কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে।

যে-কোন জনবহুল দেশে ফসল উৎপাদনের পর্য্যায় এমন হওয়া চাই যে, জমি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রোটিন পাওয়া যাইতে পারে। চীনদেশের অনেক জায়গায় প্রায় ১৬টি ফসল কৃষকেরা উৎপাদন করে। গম, যব, ডাল, সরিষা, শুঁটির সঙ্গে ধান, সোয়াবীন, শাঁখআলু, ভুট্টা ও নানা প্রকার শাকসব্জী মিলিয়া ১০/১২ বা ১৫টি ফসল তাহারা জমি হইতে গ্রহণ করে। আহার্য্যে চাউলের প্রাচুয্য কমাইয়া উত্তর ভারত হইতে সস্তা গম এবং চীবাক আমদানি করা উচিত। চীনে যেমন চাউলের পরিপূরক হিসাবে সোয়াবীন ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ চাউলের পরিপূরক একটা কিছু বাহির হওয়া প্রয়োজন। প্রোটিনধারক মুগ, ছোলা, কলাই, অরহর প্রভৃতি এবং কচু, ওল, মূলা, পেঁয়াজ ও নানা প্রকার শাকের দিকে ঝোঁক দিলে দরিদ্র কৃষকের খাদ্যেও পলীয়ের (প্রোটিনের) ভাগ বাড়ে এবং অম্লতাও কমে। যেমন-যেমন লোক-সংখ্যা বাড়ে তেমনই জমি হইতে খাদ্যেরও সংস্থান করিয়া লইতে হয়; বাংলা-দেশে আমরা বিপরীত পথে চলিতেছি।

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে আমাদের লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৩০ লক্ষ; অথচ বাংলার কর্ষিত জমির পরিমাণ বরং কমিয়াছে, বাড়ে নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সালে গড়পড়তা বাংলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ২৩,৫২৭,২০০ একর। ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ২৩,৫১৪,৪৪০ একরে। ১৯৩৫ সালে তাহা আরও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩,৩৫৭,১০০ একরে। পূর্ব্ববঙ্গে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ

এখন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ এত দ্রুত অধোগতির পথে চলিতেছে যে, ইহার ফলে সমগ্র বাংলা-দেশে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এই বার বৎসর ধরিয়া কমিতেছে। শুধু কর্ষিত ভূমির হ্রাস প্রতিরোধ করা নয়, যাহাতে কর্ষিত ভূমি হইতে আরও ২/৪টি ফসল পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশের খাদ্যসঙ্কট আরও নিদারুণ, ভীষণ হইবে।

এ সম্বন্ধে চীন দেশের কৃষির ব্যবস্থা হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। চীনে যেমন গম ও যবের সঙ্গে নানাপ্রকার ডাল, শুঁটি ও শাকসব্জী উৎপন্ন হয়, তেমনই উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে কৃষি-নির্ভরশীল লোকসংখ্যা খুব অধিক সেখানেও বিচিত্র ফসলের পর্য্যায় লক্ষিত হয়। ত্রিপুরা জেলায় পর্য্যটনের সময় আমি এই প্রকার ফসলের পর্য্যায় লক্ষ্য করিয়াছিলাম,—

মাস	ফসল
চৈত্র হইতে ভাদ্র	পাট অথবা আউস, অথবা আউস-আমন।
আশ্বিন হইতে মাঘ	মাস কলাই, অথবা মুগ, অথবা চীনা, মুসুরি, খেঁসারি। অথবা তিল বা তিসি; শাঁখ আলু।
ফাল্গুন	লাঙ্গল দেওয়া ও জমি তৈয়ারী করা।

বাংলায় এখন পাট কমাইয়া আখ, তূলা, শণ, সরিষা, নানাপ্রকার ডাল প্রভৃতির চাষ বাড়াইতে হইবে। ফসলের পর্য্যায় এমন হওয়া উচিত যাহাতে সম্বৎসরে মানুষ ও গরু সমান কাজ পাইতে পারে, কোন

সময় বেকার না থাকে, যাহাতে দেহের পরিপোষক পলীয় (প্রোটিন) ও মেদ-বহুল খাদ্য জমি হইতেই আসে এবং যাহাতে চাউল এবং পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে শিল্পোৎপাদনের জন্য আক ও অন্যান্য কৃষিজাত মালমশলা উৎপন্ন করিয়া তাহার পরিপূরণ হইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষি ও কৃষকের রক্ষাবিধান হইবে, অপরদিকে পল্লী-অঞ্চলে চিনির কারখানা এবং নানাপ্রকার কৃষিজাত মালমশলার সাহায্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠাও সুকর হইবে। কৃষি ও শিল্পে এই যোগাযোগ না হইলে বর্ত্তমান লোকবৃদ্ধিজনিত দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা ঘুচিবে না। অপরদিকে কৃষির এবং ফসলের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে এই যোগাযোগ আনায়নও অসম্ভব। বাংলা দেশে খাদ্যশস্য এবং অন্য শস্য উৎপাদনের একটা বৈজ্ঞানিক পর্য্যায় নির্দ্ধারণের যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে সেরূপ অন্য প্রদেশে হয় নাই। কৃষি-বিজ্ঞানবিদ্, অর্থ-বিজ্ঞানবিদ্ ও শরীর-বিজ্ঞানবিদের সহযোগিতার উপর দেশে খাদ্য এবং অন্য ফসলের নূতন ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যায় নিরূপণ ও প্রচার নির্ভর করিতেছে। সব ডালের মধ্যে চীনা সয়াশুঁটি সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। আমাদের ডালের মধ্যে মুসুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পলীয় আছে।

আউন্স প্রতি পলীয়

গ্রাম

মুসুর	২৩.০	অরহর	১৪.৩
বিরি কলাই	২২.৩	মাছ	৪.৭৫
মুগ	১৮.৭	মাংস	৩.৭৫
সন্দেশ	৫.৪০		

সয়া-শুঁটিতে মাংস ও ডিমের দ্বিগুণ পলীয় আছে এবং তিন রকম ভিটামিন 'এ', 'বি', 'ডি', পাওয়া যায়। ইহা মেদ স্থষ্টির সহায়তাও করে খুব বেশী, স্থতরাং চীনদেশের মত বাংলায়ও সয়াশুঁটির ব্যবহার চাউল-প্রধান আহার্য্যের দোষ সংশোধন করিতে পারে। আলু, মূলা, পেঁয়াজ, শালগম, কচু, ওল প্রভৃতিতে ধাতব পদার্থ এবং ক্ষার আছে। ক্ষার থাকাতে বাঙ্গালীর অম্বলের ধাতে বিশেষ উপকার হইবে। শাঁখ-আলু পূর্ব্ববঙ্গে খুব ব্যবহৃত হইতেছে, এমন কি ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, ভবিষ্যতে শাঁখ-আলু দিয়া মানুষের ভাতের অভাব দূরীভূত হইতে পারে। যে-বাঙ্গালী কৃষকের জমির পরিমাণ অতি সামান্য, তাহাকে এমন কৃষি শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে কয়েকটি মাত্র ফসলের পর্য্যায় দ্বারা সে তাহার এখনকার পলীয় ও মেদের অনটন পূরণ করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এখনকার কৃষিকার্য্যের বাধ্যমূলক নিষ্ক্রিয়তা অথবা আলস্য দূর করিতে পারে।

নদী সংস্কার ও জলসেচ

বাংলার কৃষির অবনতি এত দ্রুত ও অনিবার্য্য গতিতে চলিয়াছে যে, একটা ব্যাপকভাবে জলসরবরাহ ও কৃষিসংস্কার উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই। মোটামুটি জলসরবরাহ ও কৃষি সংস্কারের পন্থাগুলি আমি এখানে ইঙ্গিত করিতেছি। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের কৃষিরক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নদীরক্ষা ও সংস্কার। যেখানে যে-নদী জীবিত ও বহমান সেখান হইতে খাত কাটিয়া আনিয়া মরা নদীকে বাঁচাইতে হইবে ও কৃষির উপকার ও ম্যালেরিয়া নিবারণের

জন্য নিয়ন্ত্রিত জলপ্লাবন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যেখানে দামোদরের মত বাঁধ দেশকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তৃত অঞ্চলের যথাযথ প্লাবন ও জলনিকাশের অন্তরায় হইয়াছে, সেখানে এইরূপ বাঁধে শ্লুইস দরজা আটকাইয়া কৃষির উন্নতিকল্পে প্লাবনের শাসন ও পরিচালন করিতে হইবে।

বাঙ্গালীকে এই সব অঞ্চলে একটু যাযাবার হইতে শিখিতে হইবে। টিনের ঘর তৈয়ার করিয়া, প্রয়োজনমত যাহাতে কৃষক ভিটামাটীকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া প্লাবনের সময় দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে এরূপ শিক্ষা ও রীতি তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। দামোদর, পদ্মা, তিস্তা বা যমুনা, যে-সব নদী বাংলায় বন্যা আনিয়া দেশকে বিধ্বস্ত করে, সেই-সেই নদীগুলির স্রোতে বালু-কঙ্কালসার অন্য নদীগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু জেলার মধ্যে এইরূপে খাল কাটিয়া মরা গাঙ্গে বান ডাকাইতে হইবে। খাত কাটিয়া ভরা বিপুলস্রোত নদী হইতে জল আনিয়া জীর্ণ নদীর পুনরুদ্ধারের কথা বাংলায় একশত বৎসরের পুরাতন কথা।

১৮৩৬ সালে নদীয়ার নদীবিভাগের সুপারিন্টেনডেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, যদি শান্তিপুর হইতে মাঙ্গরা পর্য্যন্ত একটি খাত খনন করিয়া ভাগীরথীর সঙ্গে নবগঙ্গার যোগ সাধন করা হয়, তবেই দেশ রক্ষা হয়। তেমনই ১৮৪৪ সালে সৈন্যবিভাগ হইতে পরামর্শ আসিয়াছিল যে, রাজমহল হইকে বর্দ্ধমান জেলার কালনা পর্য্যন্ত খাল টানিয়া না

আনিলে পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি রক্ষা করা অসম্ভব। প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ উইলকক্সও এইরূপ নানাপ্রকার পরিকল্পনা দিয়া বাংলার পূর্ত্তবিভাগকে সম্প্রতি চঞ্চল, এমন কি উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ দরিদ্র। তাই উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও তিস্তার অতিরিক্ত জলপ্লাবন যদি ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের মধ্যে বিতরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নদীর ভাঙ্গনেরও প্রতিরোধ হইবে। অপরদিকে যে পরিমাণ পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের নদীগুলির অধোগতি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আরও নূতন কীর্ত্তিনাশা নদী উঠিয়া পূর্ব্ব অঞ্চলকে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে থাকিবে। নদীপ্রবাহের উত্তর পথে বাঁধ বাঁধিয়া বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করিয়া সেখান হইতে জলসেচ বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও তিস্তা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর বা দ্বারকেশ্বরে বাঁধ বাঁধিয়া, হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া, খাল কাটিয়া জলসেচের বিপুল আয়োজন করিতে পারা যায়। এই সকল খাতের জলপ্রপাতের সাহায্যে যুক্ত-প্রদেশের মত বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভাবন করিয়া দূরে যে-অঞ্চলে খাত পৌছাইতে পারে না, সেখানে নলকূপ বসাইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা কঠিন নয়। অযোধ্যায় পর্ব্বতের সানুদেশে অসমতলের অপেক্ষা না করিয়া যেভাবে সমতল পথে ধাবিত বিপুল গঙ্গাস্রোতের অবলম্বনে তৈলের ইঞ্জিন বসাইয়া জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, তাহা হইতে বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারগণের অনেক শিখিবার আছে।

কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

সকলেই প্রশ্ন করিবেন অদূরে যুক্ত-প্রদেশে এত বিরাট নিত্য নূতন জলসেচনের পদ্ধতির ও বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামে-গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে, বাংলা দেশে কিছুই হইতেছে না কেন? বাংলার রাজনৈতিকগণ ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না, বরং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব দেশের কল্যাণকর আর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থার প্রধান বিঘ্ন হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, কোটি কোটি টাকা কৃষির উন্নতি ও প্রজার কল্যাণের জন্য ব্যয় তখনই সম্ভব ও সার্থক যখন লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন কৃষকের দেওয়া জমির খাজনা ও শুল্ক সাধারণ তহবিল আবার পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ আয়োজন তখন লাভজনক হইয়া রাষ্ট্রের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগের খাতে অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিতে পারে। বাংলার কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার জন্য ইহা সম্ভবপর একেবারেই নয়। কারণ, রাষ্ট্রের সাহায্যে নদীর সংস্কার, জমির উন্নতি ও কৃষির সুব্যবস্থা হইলে, সমাজের মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-শ্রেণী অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিয়া তাহার বেশী ফল ভোগ করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জমির খাজনা আয়শুল্কের দ্বিগুণ, কিন্তু বাংলা দেশে কায়েমী বন্দোবস্ত হেতু উহা তাহার অর্দ্ধেক মাত্র। আরও অন্য কারণ এখানে আলোচনা না করিয়া, শুধু বাংলার কৃষি-সংস্কারের জন্যই কায়েমী বন্দোবস্তের একটা আমূল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। যদি সাধারণ রাষ্ট্রের তহবিল তাহার যথাযথ লভ্য হইতে বঞ্চিত হয়, তবে নদীসংস্কার ও কৃষির উন্নতির জন্য যে বিপুল অর্থব্যয়ের এখন প্রয়োজন তাহা পাওয়া সম্ভব হইবে না। যেমন

পল্লীগ্রাম ও কৃষক সাধারণের অর্থে পালিত ও সমৃদ্ধ হইবে, তেমনই সেই সমৃদ্ধি রাষ্ট্রকেও শক্তিমান করা চাই। যদি এরূপ আদান-প্রদান পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে জমিদারশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঘটিতে না দেয়, বরং লভ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ইহাতে রাষ্ট্রেরও অকল্যাণ, প্রজারও অনিষ্ট। ভাগীরথী নদী কায়েমী বন্দোবস্তের কাল হইতে বাংলাকে বহু বৎসর ধরিয়া যে জলকল্লোল শুনাইয়াছে, তাহাতে মিশিয়াছে কত কৃষকের করুণ আর্ত্তনাদ এবং ধনীর তীব্র শ্লেষ ও ভৎর্সনা। আজ বাংলা-দেশে রাজকর-বিষয়ে তহবিলের আয়-ব্যয়ের নূতন রীতি গ্রহণ করিতে হইবে। রাজস্ব অপেক্ষাকৃত ক্রম-বর্দ্ধনশীল না হইলে কোন দেশই প্রজার উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

কৃষকের পোষ্য

জমির কায়েমী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরও কয়েকটি অনিষ্টকর রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার আশু প্রতিকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জমিদার ও প্রজার মাঝে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, এবং জোতদার, প্রজার নীচে চুকানিদার, দরচুকানিদার, দরন্দর চুকানিদার, তস্য-চুকানিদার, তেলে-তস্য চুকানিদার, এইরূপে কত প্রকার অদ্ভুত জীব মইয়ের ধাপের মত নীচ হইতে উপরে উঠিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি দাঁড়াইয়া আছেন জমিদার মহাশয়। ইহার ফলে, প্রতি কৃষককে শুধু যে আপনার পরিবারবর্গকে পালন করিতে হয় তাহা নয়—বাংলায় পরিবারের পরিজনের সংখ্যা গড়পড়তায় ৫½ জন—সঙ্গে সঙ্গে আরও ২/১টি জমিদারজাতীয় জীবকেও—পোষণ করিতে হয়। যে-যে জেলায় জমিদারশ্রেণীর লোক বেশী তাহা নীচে দেখান হইল :—

	একজন খাজনা-আদায়ী প্রতি খাজনা-দাতার সংখ্যা
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৪
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৬
ঢাকা জেলা	২১
বরিশাল জেলা	২৩
ফরিদপুর ”	২৩
নোয়াখালি জেলা	৩৪
ময়মনসিংহ ”	৪৮
ত্রিপুরা ”	৪৮
রাজসাহী বিভাগ	৫৮

আর একটি তালিকার দ্বারা অন্যভাবে দুই শ্রেণীর লোকসংখ্যার তুলনা করা হইল :—

জিলা	কৃষকের সংখ্যা, ১০ জন জমিদার ও তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রতি
বাঁকুড়া	৪২
হাওড়া	৭৩
বর্দ্ধমান	৯৩
যশোহর	৯৯
ফরিদপুর	৯৬
চট্টগ্রাম	৮১
২৪পরগণা	১,১৩

জেলা	কৃষকের সংখ্যা, ১০ জন জমিদার ও তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রতি
হুগলী	১,২১
নদীয়া	১,১১
মুর্শিদাবাদ	১,৫১
ঢাকা	১,৭৫
রংপুর	২,২৭
মেদিনীপুর	২,৬৬

বাঁকুড়া, হাওড়া, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার প্রতি কৃষককে তাহার শ্রম হইতে অন্ততঃ ৭জন লোককে পরিপালন করিতে হয়। বাংলা-দেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা, সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু; তাহারই ভার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ভূমিহীন শ্রেণীর আধিক্য

বাংলা দেশের চাষী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

	সংখ্যা
স্বত্ববিশিষ্ট	৫,৩১৭,৯৭৩
প্রজা	৮৭৩,০৯৪
মজুর	২,৮৭৪,৮০৪

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে প্রথম দুই শ্রেণীর সংখ্যা ৯২ লক্ষ হইতে কমিয়া ৬০ লক্ষ হইয়াছে, ইহাতে এক-তৃতীয়াংশের বেশী (শতকরা ৩৫) হ্রাস হইয়াছে, অথচ মজুর, মুনিষ, আধিয়ার, বর্গাদার, ভাগচাষীর সংখ্যা

বাড়িয়াছে ১,৮০৫,৫০২ হইতে ২,৭১৮,৯৩৯,—অর্দ্ধেকের বেশী বৃদ্ধি। কৃষির দুর্দ্দশার ইহা অপেক্ষা কি শোচনীয় নিদর্শন আর হইতে পারে! দারিদ্র্য-পীড়িত ঋণভারগ্রস্ত বাংলার জোতদার ও চুকানিদার আপনার শেষ সম্বল ক্ষুদ্রায়তন জমিটুকু পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া নিজেরই জমিতে দীন, ভাগীদার, বর্গাদার বা মজুরে রূপান্তরিত হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। খাজনা বা মহাজনের সুদ দিবার সামর্থ্য হারাইয়াই সে আজ মজুর শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর দিকে এই সুযোগে জমিতে সহর হইতে আর এক শ্রেণী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। এই দশ বৎসরে বাংলা-দেশে প্রজাস্বত্বভোগী অথচ কৃষিবিমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংখ্যায় বাড়িয়াছে ৩৯০,৫৬২ হইতে ৬৩৩,৮৩৪,—শতকরা ৬০ বৃদ্ধি।

বিশেষ করিয়া আর একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে প্রজাস্বত্বের লেনদেনের অধিকার কৃষির কল্যাণপ্রদ হইতেছে কি না। যদি জমি ক্রমশঃ মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়ে,—বিশেষতঃ কৃষির এই দুর্দ্দিনের যুগে,—তাহা হইলে কৃষির অবনতি ও পল্লীগ্রামের অশান্তি অনিবার্য্য। প্রায় ২৯ লক্ষ ভূমিহীন বা ভূমি হইতে বিতাড়িত মজুর বাংলায় আজ বর্ত্তমান। ইহা কোন দেশের পক্ষেই সমাজের শান্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক নয়। ১৯২৮ সালের সংস্কার আইনের ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে-কোন হলধারী, ভাগহিসাবেই হউক বা দিনমজুর হিসাবেই হউক, একাধিকক্রমে বার বৎসরের অধিক জমি চাষ করিতেছে, তাহাকে জমির উত্তরাধিকার ও প্রজাস্বত্ব না দিতে পারিলে নিঃস্ব মজুর-শ্রেণীর বৃদ্ধি ভবিষ্যতে ঘোর অকল্যাণ ঘটাইবে।

কায়েমী জমীর বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্বসংস্কার লইয়া যে কয়েকটি মাত্র কথা বলিলাম তাহা সমাজ-তন্ত্রবাদের কথা নয়। পৃথিবীতে সব কৃষিপ্রধান দেশই এই রকম উপায়ে প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। বিলাতে, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লাণ্ডে জমি-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের সংস্কারও এই রীতিরই ইঙ্গিত করিবে।

গোবংশবৃদ্ধি

বাংলা-দেশে লোকবৃদ্ধির কথা আগেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে চাষের জমি ভাগবাটোয়ারা জন্য গড়পড়তায় ক্ষুদ্রতম। জোত যে শুধু খণ্ডিত হইয়াছে তাহা নয়, টুকর-টুকরা জমি বসন্ত কালের শুক্‌না পাতার মত মাঠের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। বাংলা-দেশে জনপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা সবচেয়ে কম। অপর দিকে বাংলাদেশে আবার গোজাতির সংখ্যা সকল প্রদেশের অপেক্ষা বেশী। মানুষ খাদ্যের অকুলানে গোপালন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অসমর্থ হইলেও বাংলা গোবংশ বৃদ্ধিতে অগ্রণী হইয়াছে।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যা	১০০ একর আবাদী জমিপ্রতি গোসংখ্যা	জন পিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	লোক বাহুল্যের নির্ঘণ্ট
বাংলা	৬৪৬	১০৮	·৪৭	২·১
বিহার-উড়িষ্যা	৪৫৪	৮৯	·৬৩	১·৫৮
যুক্ত-প্রদেশ	৪৫৬	৮৮	·৭৪	১·৩৫
মান্দ্রাজ	৩২৮	৬৬	·৭৪	১·৩৫

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যা	১০০ একর আবাদী মপ্রতি গোসংখ্যা	জন পিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	লোক বাহু-ল্যের নির্ঘণ্ট
পাঞ্জাব	২৩৮	৫৪	১·১২	০·৮৯
মধ্য প্রদেশ	১৫৫	৫১	১·৫৮	০·৬৩
বোম্বাই	১৭৭	৩৬	১·৬১	০·৬২

বাংলার গরু ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের তুলনায় খর্ব্বাকৃতি, হীনবল ও নিকৃষ্ট। অথচ সংখ্যায় তাহারা তিন কোটি চৌদ্দ লক্ষ। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর। তাহার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ একর জমি গরুর খাদ্য-ফসল উৎপাদন করে। যদি বংলা-দেশে সমস্ত খড়ের পরিমাণ ধরা যায় ও মনে করা যায় গরুর খাদ্য ছাড়া খড়ের অপর কোন ব্যবহার নাই, তাহা হইলে প্রত্যেক গরু পিছু মাত্র ২ সের করিয়া খড় পাওয়া যাইবে, অথচ ৫ সেরের কমে গরুর চলে না। বাংলাদেশে চাষের ক্ষেত লোকবাহুল্যের জন্য শুধু যে পথ ঘাট আক্রমণ করিয়াছে তাহা নয়, জলা ও নদীর শুষ্ক বক্ষেও নামিয়া যাইতেছে। সুতরাং গরুর খাদ্যাভাব ঘটিবেই।

এক একর জমিতে কতগুলি পশু চরে তাহা দেখিলে খাদ্যাভাব কত নিদারুণ তাহা বুঝা যায়।

জেলা	প্রতি একরে কতগুলি পশু চরে
ফরিদপুর	৬৯
নোয়াখালি	৫৫

জেলা	প্রতি একরে কতগুলি পশু চরে
হাবড়া	৪৫
বগুড়া	৪০
ত্রিপুরা } রংপুর }	৩৫
২৪পরগণা	৩০

বাংলা-দেশ জমি চাষের জন্য বৎসর-বৎসর উত্তর ভারত হইতে আধ কোটি টাকার বলদ ক্রয় করে;—এতই এখানে গোজাতির অবনতি ঘটিয়াছে। বলদের অভাবে অনেক সময় গাই গরুর দ্বারা লাঙ্গল টানান হয়।

খাদ্যাভাবে গরু যত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল হয় চাষী তাহাদের সংখ্যা ততই বাড়াইতে থাকে; লাঙ্গল ও গাড়ী টানা তাহাদের দ্বারা ত করাইতে হইবেই। কিন্তু যে পরিমাণে গাই-বলদ ছোট ও ক্ষীণবল হয় সে পরিমাণে তাহাদের আহার্য্য কমে না। এই উপায়ে শুধু বাংলাদেশের কেন যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের চাষী, যাহাদের মোটে তিন একর হইতে পাঁচ একর পরিমাণ জোতের সম্বল, তাহারা গাই-বলদের সংখ্যা অজস্র বাড়াইয়া চলিয়াছে। পাঞ্জাবের মুসলমান বলদ বাঁধিয়া রাখে, অকেজো অথবা অতিবৃদ্ধ গাই বলদ প্রয়োজনমত বিক্রয় করিয়া দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য লোকবহুল প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও লোকাচার গোপালন সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি খেলিতে দেয় না, অথচ শ্রাদ্ধের সময় যখন ষাঁড় উৎসর্গ করিতে হয়

তখন সবচেয়ে সস্তা ও নিকৃষ্ট ষাঁড় বাছিয়া লওয়া হয়, ইহার বিপক্ষে তখন হিন্দু ধর্ম্মও নির্ব্বাক্ ! ফলে ঐ অঞ্চলের গোজাতির দ্রুত অবনতি অনিবার্য্য হয়।

অব্যবহার্য্য, অতিরিক্ত গো-মহিষের সংখ্যা দুই কোটি

বাংলা-দেশ গরুপালন সম্বন্ধে কি বিপরীত বুদ্ধি ও ব্যবস্থা দেখাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ দিব। নদীর মৃত্যু ও জল সরবরাহের ব্যাঘাতের জন্য হুগলী, বর্দ্ধমান ও যশোহর জেলায় কৃষির অবনতির চূড়ান্ত দেখা গিয়াছে। গত ৩০ বৎসরে হুগলী জেলায় কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে শতকরা ৪৫, বর্দ্ধমানে কমিয়াছে শতকরা ৪০ ও যশোহরে কমিয়াছে শতকরা ৩১। এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক জমি যদি কোন জেলায় পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ থাকে ও ম্যালেরিয়া রোগে যদি লোক অনবরত ভুগে (হুগলী জেলার জ্বরের প্রকোপের মান ৪৬·৬; বর্দ্ধমানের ৫৩·৪; ও যশোহরের ৪৮·২) তাহা হইলে ত দারিদ্র্য ও অনশন বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল এই দশ বৎসরে—হুগলী জেলায় গোমহিষের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৪৭২,২৬৫ হইতে ৫২০,০২৮; বর্দ্ধমান জেলায় ৯১৮,১০৬ হইতে ৯৭৯,৮৫২; এবং যশোহর জেলায় ৮৪৪,৯৮৫ হইতে ১,০৭৫,৪৬২। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কয়েকটি গ্রামে যাইয়া অকেজো ও অতিরিক্ত গরুর সংখ্যা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলাম।

	আলিগ্রাম	আউসগ্রাম
চাষের বলদ	১৪৪	১৫০
অকেজো গরু, ষাঁড়	৩	২
গাই	৪৩	৪০

এতগুলি গরু থাকা সত্ত্বেও গ্রামে দুধের পরিমাণ মাত্র এক মণ ছিল।

বাংলা-দেশে ১০০ একর আবাদী জমি প্রতি গোমহিষের সংখ্যা ১০৮, কিন্তু ইজিপ্টে এই হিসাবে গোমহিষের সংখ্যা ২৫ ; চীনের .৫ এবং জাপানের মাত্র ৬। গোমহিষের সংখ্যা বাংলায় সব প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও বাঙ্গালী কৃষক খুব কম পরিমাণেই দুধ ঘি খাইতে পায় ও বৎসরের পর বৎসর বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রজননের জন্য বাংলায় ষাঁড় আমদানি করে। নীলনদের তটভূমির কৃষিকে মাপকাঠি ধরিলে বাংলাদেশে তিনভাগের দুই ভাগ গোমহিষ না থাকিলেও কৃষিকার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়, ৩ কোটি ১৪ লক্ষ গোমহিষের মধ্যে অন্ততঃ ২ কোটি গোমহিষ বাংলাদেশে অতিরিক্ত ; তাহাদিগের পালন অনর্থক কৃষকের দারিদ্র্য, ঋণভার ও অনশন বাড়াইতেছে।

গোজাতির অবনতির প্রতিকার

বড় লাটসাহেবের গোজাতির উন্নতিসাধন কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না যদি কৃষকগণ গোজাতির সংখ্যা অযথা ও অনর্থক বৃদ্ধি করিতে থাকে, ভাল ও মন্দ গরুর প্রভেদ না করে এবং দুইয়েরই পক্ষে ভীষণ

খাদ্যসঙ্কট প্রতিকার করা দূরে থাক আরও নিদারুণ করিতে থাকে।

পাঞ্জাব প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যে (১৯৩২—১৯৩৩) ৪৮২,০০০ পশুর বংশবৃদ্ধি নিবারণ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে আইন করিয়া অকেজো ও নিকৃষ্ট পশু বৃদ্ধি নিবারণ না করিতে পারিলে কৃষকের ঋণভার কমিবে না, গুরুভারাক্রান্ত ভূমি অনুর্ব্বর হইতে থাকিবে এবং কৃষকও দুধ ও ঘি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। গরু ও কৃষক দুইয়ে মিলিয়া এখন জমি হইতে যত ফসল, যত শাক, যত ঘাস—যত রস টানিতে পারে তত টানিতেছে, কিন্তু এই অসম নিরর্থক চেষ্টায় কাহারও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। বাংলার লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ, তাহার মধ্যে, ধরা যাইতে পারে, প্রায় ৭০লক্ষ লোক, শরীরবিজ্ঞানের অনুমোদিত খাদ্যের মাপকাঠি অনুসারে উপযুক্ত আহার করিলে, অন্য সকলে একেবারে নিরন্ন হইয়া পড়িবে। যদি মানুষের এত দৈন্য ও ক্লেশ, তবে নিরর্থক পশু পালন ও বৃদ্ধি করিয়া, পশুর অনশন ও অবনতি ঘটাইয়া, উপযুক্ত চাষ ও সার হিসাবে জমির উর্ব্বরতাহানি করিয়া, এবং পরিমাণ ও গুণ দুইই অনুসারে মানুষের খাদ্যের অভাব বাড়াইয়া বাঙালী কি গোমাতার চরণে সবই বিসর্জ্জন দিবে!

উপার্জ্জনশীলের সংখ্যা-হ্রাস

বাংলার কৃষির দুরবস্থা হইতে যদি আমরা শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলেও আমরা আশার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যেমন ভারতবর্ষে তেমনই বাংলায় লোকবৃদ্ধি অনুপাতে শিল্পোন্নতি

কিছুই দেখা যাইতেছে না, বরং সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে শিল্পী ব্যবসায়ীর সংখ্যা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় বেশ কমিয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে,—

		১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯১১—১৯৩৩
		কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি
লোকসংখ্যা	ভারতবর্ষ	৩১ ৫০	৩১।৯০	৩৫।৩০	+১২·১
	বাংলা	৪।৬৩	৪।৭৫	৫। ১	+১০·০
উপার্জ্জনশীল কর্ম্মীর সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১৪। ৯	১৪। ৬	১৫। ৪	+ ৪·০
	বাংলা	১।৬২	১।৬৮	১।৪৭	− ৯·০
শিল্পকারখানা প্রভৃতিতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১।৭৫	১।৫৭	১।৫৩	−১২·৬
	বাংলা	।১৭	।১৭	।১৩	−১৪·২
শতকরা হিসাবে কর্ম্মীর সংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১১। ০	১১। ০	১০। ০	− ৯·১
	বাংল	১০। ৫	১০। ১	৯। ০	−১৪·২
শতকরা হিসাবে মোট লোকসংখ্যা অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	৫। ৫	৪। ৯	৪। ৩	−৩৫·৮
	বাংলা	৩। ৯	৩। ৭	২। ৫	−৩৫·৮

গত ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্পী, ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। এই সংখ্যা-হ্রাস ও মোট কর্ম্মী ও লোকসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকসংখ্যার শতকরা অবনতি ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালায় অধিক বেশী। ইহা হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলার দ্রুততর আর্থিক অবনতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ত্রিশ বৎসরে বাংলায় উপার্জ্জনশীল কর্ম্মীর সংখ্যা হ্রাস (শতকরা ৯) বিশেষ আশঙ্কার কথা। অথচ বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—শতকরা ১০। যাহারা মুখের গ্রাস চাহে, তাহাদের দুই হাতই যে কাজ করে তাহা নহে। এই বৈপরীত্যই বাংলার অধোগতির প্রধান কারণ।

শ্রমিকের সংখ্যাহ্রাস

কিছুকাল যাবৎ বাংলার শুধু যে শিল্পের প্রসার হয় নাই তাহা নহে, বরং হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যত লোক কাজ করিত ১৯৩১ সালে তাহা অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম লোক কাজ করিত। ১৯২১ সালে তন্তুবায়রা সংখ্যায় ছিল ৪½ লক্ষ, ১৯৩১ সালে তাহা ২ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩৩ সালে কারখানার সংখ্যা ২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিকসংখ্যা ৫০ হাজারের অধিকও হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য তাহার পর ১০।১২টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক বৎসরে কয়েক মাস ধরিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বাংলার যে-কৃষি আর লোকসংখ্যার গুরুভার বহন করিতে পারিতেছে না শিল্পের অবনতিতে তাহা আরও বিপর্য্যস্ত হইতেছে। যত লোক এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহাদের সকলের কৃষির দ্বারা জীবনযাত্রা অসম্ভব, অথচ কৃষিনির্ভর লোকের সংখ্যাই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে আর্থিক অবনতি হেতু ১৯৩১ সালে বাংলায় উৎপন্ন সকল প্রকার ফসলের মোট মূল্য শতকরা ৬১ হ্রাস পাইয়াছে। অন্য কোন প্রদেশে এই পরিমাণে মূল্যহ্রাস ঘটে নাই, অথচ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কৃষিনির্ভরতা অনেক অধিক বাড়িয়াছে। কুটীর-শিল্পগুলিও ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মান্দ্রাজে যে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির চেষ্টা চলিয়াছে বাংলায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। শুধু তুলা-শিল্পই ১০ বৎসরে মান্দ্রাজে ৭০ হাজার বেশী লোককে কাজ দিয়াছে।

কারখানা ও কুটীর-শিল্প

বর্ত্তমানে বাংলার কলকারখানাগুলির অধিকাংশই ব্যাণ্ডেল হইতে বজবজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল কলকারখানায় প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া কাজ করে। যে সকল অঞ্চলে যেরূপ কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই সকল অঞ্চলে যদি সেই শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়, তবে পড়তা কম হওয়ায় ও বাঙ্গালী মজুর সহজে পাওয়া যাওয়ায় শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাংলার পল্লীবাসী-দেরও ঐ সকল কারখানায় জীবিকার্জ্জনের সুযোগ হইতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে বড়-বড় কলকারখানা স্থাপিত হইলে কি উপকার হইতে পারে, কুষ্টিয়া ও ঢাকার কাপড়ের কলগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এই সকল কলকারখানা কৃষিজীবীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে এবং পল্লীবাসীদের জীবিকার মান এত উন্নত করিয়াছে যে, পাটের আবাদ দ্বারা বহু বৎসরেও তাহা সম্ভব হইত না।

বাংলার অনেক কুটীর-শিল্প বহুকাল হইতে ভারতীয় এমন কি বহির্বাণিজ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অনেক কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য এখনও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয়। ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরের কাপড়, দাঁইহাট ও খাগড়ার ধাতব বাসন, নদীয়ার সোলার টুপি কিংবা ঢাকার শাঁখা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন ও বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ঋণগ্রহণ ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তের অভাব। মান্দ্রাজে ও যুক্ত প্রদেশে কুটীর-শিল্পের রক্ষাসাধন ও বিস্তারের প্রকাণ্ড আয়োজন চলিতেছে। যুক্ত প্রদেশে ছোট কারখানা ও কুটীর-শিল্পকে যথাযথ ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা

দানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক ও পণ্যসরবরাহের কোম্পানী গঠিত হইতেছে। বাংলাদেশে ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয়। যেখানে আপাততঃ শিল্পীদের মধ্যে সমবায় প্রথায় কাজ করা সম্ভব নহে, সেখানে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠান মাল বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে এবং কাঁচামাল সরবরাহেরও বন্দোবস্ত করিবে। শিল্পীদের উচ্চমূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়, এদিকে তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কলিকাতার বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প সমিতির সহযোগে মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে এবং পল্লী অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে একযোগে কাজ করিতে পারে। বস্ত্র, আসবাবপত্র, ধাতব বাসন, প্রভৃতি যে সকল শিল্পে কারু, কলা ও নক্সার প্রয়োজন, কলিকাতার আর্ট স্কুলের ঐ সমস্ত শিল্পের জন্য নূতন নূতন মনোজ্ঞ নক্সা প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট ঢাকা ও বিষ্ণুপুরে তন্তুবায়দিগের জন্য একটি ক্যালেণ্ডারিং কল স্থাপন করিতে পারিলে বয়নশিল্পের বিশেষ সুবিধা হয়। বর্দ্ধমানেও তেমনই একটি নিকেল-প্লেটিং কল স্থাপিত হইতে পারে। উহাতে ধাতু-শিল্পের বিশেষ সাহায্য হইবে। স্যাক্সনি এবং সুইজারল্যাণ্ডের মত ঘড়ি প্রস্তুত, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের মত কাঠ, ধাতু সেলুলয়েড বা রবারের পুতুল, বেভেরিয়ার মত পেন্সিল প্রস্তুত যদি কুটীর-শিল্প হিসাবে করা যায়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বহু যুবকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে ও রাষ্ট্রের সুবিধাবিধানে এই সমস্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ

শিল্পে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ফলিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বাংলার শিক্ষিত যুবকের পক্ষে অল্প মূলধনে জার্ম্মানী ও জাপান হইতে অল্প টাকার কল আমদানি করিয়া এই সকল শিল্পের পরিচালনা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

মাঝারি ও বড় কারখানা হিসাবে বাংলায় কাগজ, গালা, দেশলাই, চামড়া, শণ, তামাক, তৈল ও হাড় প্রভৃতির ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যত প্রকার শিল্প হইতে পারে, ছোট, মাঝারি, বড় সব রকম শিল্পের বিস্তার না হইলে বাংলায় যে কৃষিনির্ভরশীলতা এই ৩০ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের উপায় নাই; অথচ উহার প্রতিরোধ না করিতে পারিলে অনশন, অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু বাড়িতেই থাকিবে। কয়েকটি সহরে বড় বড় কারখানা স্থাপন অপেক্ষা যদি পল্লী অঞ্চলে আখ, তেল, তামাক, চামড়া প্রভৃতির কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে জনসংখ্যার ভার কমিয়া কৃষির উন্নতি সাধন হইবে এবং কৃষকও সংবৎসর সমানভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে, তাহার এখনকার মত বৎসরে ২।৩ মাস করিয়া আলস্যে অথবা অল্পশ্রমে দিন কাটাইতে হইবে না।

মৎস্যের ব্যবসায়

পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষির অবসরে অনেক কৃষক মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা চালায়। বাংলাদেশ বহুকাল ধরিয়া মৎস্যের অপচয় করিতেছে। অনেক জেলায় মাছ মুড়ির দরে বিক্রয় হইতেছে, আবার সেই সময় অন্য জেলায় লোক অনশনে কাটাইতেছে। মাছের পরিমাণ দেশে

খুব দ্রুত কমিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে। যে সময়ে মাছ ডিম পাড়ে সেই সময় মাছধরা,—কিংবা যে-সব জাল বা বেতের ফাঁদ অতি ক্ষুদ্র মাছকেও পলাইতে দেয় না তাহার ব্যবহার,—নিষেধ করাইবার জন্য, কিংবা নদীতে সহরের ময়লা বা কারখানার তেল ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া মাছের অবনতি সাধন বন্ধ করাইবার জন্য আইন পাশ করাইতে হইবে। নদীর মোহানায়, সুন্দরবনে বা সমুদ্রতটে মোটর পোতের সাহায্যে মাছ ধরা, তৈল দ্বারা বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংবন্ধন করা, বরফের কারখানা স্থাপন করিয়া মাছ রক্ষা করা এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া বরফের আবরণে দূর অঞ্চলে মাছ পাঠান,—আমাদিগের শিক্ষিত যুবকদিগকে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী মাছের ব্যবসায়ে প্রচলন করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন সমস্ত বাংলাদেশে মাছের দর কমিবে, অপরদিকে অপচয়ও বন্ধ হইবে। জাপানীরা পূর্ব্বসমুদ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মাছের ব্যবসায় করতলগত করিয়াছে। শিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী যুবকের এই ব্যবসায়ের প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অপকর্ষ

বাংলার অধোগতির যে-চিত্র আমি খুব সহজ ও সরল রেখায় টানিলাম তাহা পাছে অতিরঞ্জিত কাহারও মনে হয় এই জন্য মোটামুটি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী যে দুর্গতির পথযাত্রী তাহার তুলনামূলক পরিচয় এইবার দিব।

১। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা লোক-

বহুল এবং জন প্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা কম (·৪৭ একার)। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা হইতেছে ·৬৩ একার; যুক্ত-প্রদেশ ও মান্দ্রাজের সংখ্যা ·৭৪ একার। বাংলার অতিজননসমস্যা সব প্রদেশ অপেক্ষা ভয়াবহ।

২। উপরোক্ত কারণে বাংলা দেশের জোত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, খণ্ডবিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে কৃষিকার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অবনতি দৃষ্ট হইয়াছে। লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষা পরিবার পোষণের অনুপযোগী ক্ষুদ্র জমি অধিক অনুপাতে বাড়িয়া যাইতেছে।

৩। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার গো-মহিষ যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা নিৰ্জ্জীব ও নিকৃষ্ট। প্রজননের ষাঁড়ের জন্য বাংলা অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করে।

৪। বাংলার খাদ্য উত্তর ভারতের অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তাহাতে যেমন চাউলের প্রাচুর্য্য তেমনই পলীয়ের (প্রোটিন) অভাব। পাঞ্জাবের কয়েদখানায় আমাশয়ে মৃত্যু বিরল; বাংলায় উদরাময়, আমাশয়, বেরি বেরি, চোখের রোগ, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু তাহার খাদ্যের অভাব ও অসামঞ্জস্যের সাক্ষ্য দেয়। শুধু জলবায়ুর জন্য নহে, অপরিপুষ্টির জন্যও বাঙ্গালীর দেহে, উত্তর ভারতবাসী অপেক্ষা শক্তি ও সহনশীলতা কম।

৫। বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী মান্দ্যের সময় অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় প্রধান-প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৯২৮—২৯ সালের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কমিয়াছে। বাংলায় কমিয়াছে শতকরা ৬১·১; বিহার ও উড়িষ্যায় ৫৮·২; মান্দ্রাজে ৪৫ এবং যুক্তপ্রদেশে ৩৫·২। পাট

ও চাউলের মূল্যহ্রাস ইহার প্রধান কারণ। ইহাতে বাংলাদেশে এখন যে পরিমাণে জীবনযাত্রার মান কমিয়াছে অন্য প্রদেশে তাহা হয় নাই।

৬। সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিলে উপার্জ্জনরত কর্ম্মীর সংখ্যা গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৪ বাড়িয়াছে, কিন্তু বাংলায় কমিয়াছে (—'৯০)।

৭। এই ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্প-প্রসার দূরে থাক মোট শিল্পী-ব্যবসায়ীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী কমিয়াছে (শতকরা—১৪'২); যদি সমগ্র জনসংখ্যা হিসাবে শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত ধরা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশে এই হার শতকরা ৩৫'৮ কমিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে কমিয়াছে শতকরা ২১'৮।

৮। বাংলা দেশের জন্মহার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা দ্রুততর কমিতেছে। বাংলার জন্মহার ১৯২৯—৩৩ সালে গড় পড়তায় (১০০০ প্রতি) ২৭'০ ; বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৪'০ ; যুক্তপ্রদেশে ৩৬'০। এই জন্মহ্রাস আনন্দের বিষয় হইত যদি ইহা মানুষের স্বেচ্ছায় হইত। অর্দ্ধাশন ও অনশনের ফলে খুব সম্ভবতঃ এই প্রকার জন্মহ্রাস দেখা গিয়াছে।

৯। ১৯৩৩—৩৪ সালে বাংলার পল্লী-অঞ্চলে শিশুমৃত্যু হাজার প্রতি ১৮৯। ইহা শুধু মান্দ্রাজ অপেক্ষা কম, অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী ; যুক্ত-প্রদেশের সংখ্যা হইতেছে হাজার প্রতি ১৭৫, ও মান্দ্রাজের হাজার প্রতি ১৯২।

১০। বাংলা দেশে গড়পড়তায় স্ত্রীলোকের পরমায়ুর হার কমিয়া যাইতেছে, অন্য প্রদেশে তাহা হইতেছে না। ১৮৮৭ সালের ২৬'৫১

হইতে কমিয়া ১৯৩১ সালে উহা ২৪'৮০ হইয়াছে; যুক্তপ্রদেশে তাহা ২৪'৯৪ হইতে বাড়িয়া ২৫'০৯ হইয়াছে ও সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা ২৫'৫৮ হইতে বাড়িয়া ২৬'৫৬ হইয়াছে।

১১। কিন্তু পুরুষের পরমায়ুর হার বাঙলা ও যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম, যথাক্রমে ২৪'৯১ ও ২৪'৫৬; পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যার ও মান্দ্রাজের হইতেছে ২৮, বোম্বাইয়ের ২৭'৮৪ ও সমগ্র ভারতবর্ষের ২৬'৯১।

১২। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জাতিসমুদয়ের বেশী বংশবৃদ্ধি হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যেমন শিশুসংখ্যা অধিক, তেমনই আবার মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা বাংলাদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে শিশুমৃত্যু যেমন অধিক, তেমনই তাহাদিগের অনুপাতে বৃদ্ধের সংখ্যাও কম। বাঙলার কু-জনন অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা কৃষ্টির অধিকতর অন্তরায়।

১৩। বাঙলা-দেশে যদিও পাঁচ বৎসরের ও ততোধিক-বয়স্ক হাজারকরা শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশ অপেক্ষা বেশী (১১'১), কিন্তু এই দশ বৎসরে বাঙলায় শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সকল প্রদেশ অপেক্ষা কম বাড়িয়াছে (+৯'৭); যুক্তপ্রদেশে বাড়িয়াছে ৩৪'৪; বোম্বাইয়ে ২০; মান্দ্রাজে ১৯'১; বিহার ও উড়িষ্যায় ৮'৯।

১৪। বাঙলায় ম্যালেরিয়া রোগে লোক মরে গড়পড়তায় বৎসরে ৩৫০,০০০। সকল প্রদেশ অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাঙলাতেই বেশী, এবং ইহা বাঙলার আর্থিক অধোগতি, স্বাস্থ্যহানি ও জন্মহ্রাসের

একটি প্রধান কারণ। বাঙলার ৮৬,৬১৮গুলি গ্রামের মধ্যে ৬০,০০০গুলি গ্রাম ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষেতে পরিশ্রমের মাত্রা কমে, মাঠে, পথে-ঘাটে জঙ্গল বাড়ে। মানুষ সহজে অন্য রোগেও আক্রান্ত হয়। ডাক্তারেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুতে গড়পড়তায় মানুষের ভোগ হয় ২০০০ দিন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় এই সব লোক মাসে ১০৲ করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে বাঙলাদেশে ম্যালেরিয়া হইতে, জীবনের ক্ষতি ছাড়া আর্থিক ক্ষতি হয় বৎসর-বৎসর প্রায় ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

১৫। সকল প্রদেশ অপেক্ষা মেষ্টন বাটোয়ারায় বাঙলার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার ফলে বাঙলায় কিছুকাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্য কোন কোন দিকের জাতীয় উন্নতি অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বাটোয়ারাতে বাঙলার ৪ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের জন্য রাজস্ব ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা, কিন্তু বোম্বাই-এ ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১৫ কোটি, এবং পাঞ্জাবের ২ কোটি লোকের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা। ইহার ফলে জনপ্রতি রাজস্বের ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলায় কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক কম হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার জন প্রতি রাজস্ব-ব্যয় বাঙলা অপেক্ষা কম হইয়াছে মাত্র ১।/০। বাঙলায় ব্যয়ের পরিমাণ, ১৯৩১—৩২ সালে হইয়াছে ১৸/০, বোম্বাইয়ে হইয়াছিল পক্ষান্তরে ৬৸০; পাঞ্জাবে ৪৶০ এবং মান্দ্রাজে ৩।৶০। শিক্ষার জন্য ইহার ফলে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলা-দেশে কম খরচ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে রাজস্বের খরচ

হইয়াছে শিক্ষার জন্য, টাকা হিসাবে বাঙলায়, '২৮,—যুক্তপ্রদেশে '৪২,—মাদ্রাজে '৬,—পাঞ্জাবে '৮০,—বোম্বাই-এ ১। সেইরূপ জনস্বাস্থ্য ও ডাক্তারী বিভাগের জন্য শুধু যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা বাঙলার রাজস্বের ব্যয় সবচেয়ে কম হইয়াছে। মাথা হিসাবে বাঙলার খরচ '২১; যুক্তপ্রদেশের '১৪; পাঞ্জাবের ৩৯; মান্দ্রাজের '৩৩; বোম্বাইয়ের '৪৭।

১৬। রাজস্ব বিভাগে এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি মন্ত্রিবিভাগে ব্যয়ের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলায় মন্ত্রিগণের নিজস্ব বিভাগের ব্যয় খুব কম বাড়িতে পারিয়াছে। ১৯২২ সালের মধ্যে বাঙলার মন্ত্রিবিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ১৪; বোম্বাই-এ বাড়িয়াছে শতকরা ২৫; যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০; পাঞ্জাবে শতকরা ৮২; মান্দ্রাজে শতকরা ৮৬। অবশ্য পাটশুল্ক হইতে আদায়ের অর্দ্ধেক অংশ বাঙলার রাজস্বের অন্তর্গত করায়, অন্যায়ের প্রতিকারের কিছু চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পাটের দর এখন কম এবং বিদেশী বাজারও মন্দা, ইহাতে শুল্কের চাপ খানিকটা বাঙলার কৃষকের বহন করিতেই হইবে। বাঙলার কাঙাল চাষীর দেওয়া ধন বাঙলাতেই সবটা ব্যয়িত হইলে পাট রপ্তানির উপর শুল্কের খানিকটা অনুমোদন করা যায়। কৃষির এই দুর্দ্দিনে শস্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা, বিশেষতঃ যে শস্যের চাষ কমাইতে হইতেছে,—তাহার খানিকটা কৃষিকার্য্যের উপর এমন কি জীবনযাত্রার উপরও আসিয়া পড়ে।

১৭। তবুও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করভারাক্রান্ত। বাঙ্গালী জনপ্রতি ট্যাক্স দেয় ৭৷৷০ টাকা।

যুক্তপ্রদেশের ট্যাক্সের পরিমাণ ৩৷৹, মাদ্রাজে ৫৷৶৹ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৸৹। বাঙলার করপ্রদানের ক্ষমতা বোম্বাইয়ের অপেক্ষা কম; অথচ বহির্বাণিজ্যের শুল্ক, পাট রপ্তানির শুল্ক, ইন্‌কম ট্যাক্স এবং লবণ শুল্ক মিলিয়া বাঙলা বোম্বাই-এর দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কর দেয়। জমির স্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে যে বাঙালীকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক, কারণ এইটি দেড় শত বৎসরের পুরাতন অনুষ্ঠান। যে-ধন ইহার কোন পরিবার বা শ্রেণীবিশেষ উদ্বৃত্ত রাখিয়াছিল, তাহা এই শতাব্দীতে বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐ ধন বণ্টিত হইয়াছে, তাহার ফলে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে এবং তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নয়, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টই বেশী লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া জমির কায়েমী বন্দোবস্ত বাঙালী কৃষকের প্রয়োজনমত, এমন কি জমিদারেরও প্রয়োজনমত, প্রবর্ত্তিত হয় নাই। উপরন্তু, উহার ফলে বাঙ্গালী কৃষকের ও জমিদারের দেওয়া অর্থে ইংরাজের সমগ্র ভারতবিজয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যদি অন্য প্রদেশে বাঙলাকে গত যুগের জমির কায়েমী বন্দোবস্তের জন্য সাধারণ করদানের হার আরও বাড়াইতে বলে, তবে বাঙলা তখন যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা ফেরতের জন্য সে এখন ন্যায্য দাবী করিতে পারে।

১৮। বাঙলাদেশের মত আর কোন প্রদেশের প্রাদেশিক বাজেটে এতবার ঘাটতি দেখা যায় নাই। এই বৎসর ঘাটতির সপ্তম বর্ষ এবং আমরা যদি ১৯২৮ ও ১৯৩০ এই দুই সালের অল্প বাড়তি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে রাজস্বের ঘাটতির অবস্থা সুরু হইয়াছে ১৯২৬ সাল হইতে।

এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী রাজকোষের অনটন বাঙলার সব দিককার উন্নতি স্থগিত করিয়াছে। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, বিশেষতঃ বোম্বাই অনেক দিকে বাঙলা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে অনেক দিকে বাঙলা তাই তাল রাখিতে পারে নাই।

অস্তমিত গৌরব

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ও মানুষের অবহেলায় বাঙলার নদী ও জল-সরবরাহের অবনতি। ইহার ফলে বাণিজ্যের হ্রাস, স্বাস্থ্যহানি এবং কৃষির অধোগতি। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বিরাট রাজধানী সপ্তগ্রাম য়ুরোপীয় ও আরব বণিকের সমাগমে, ধনীর বিলাসপ্রমোদে ও বিরাট উচ্চ সৌধের স্পর্দ্ধায় আপনার সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিত, তখন কে জানিত তিন শতাব্দীর মধ্যেই এই অঞ্চল শ্রীহীন, স্বাস্থ্যহীন ও অরণ্যাবৃত হইয়া পড়িবে, ফিরিঙ্গী কথিত "পোর্টো পেকুইনোর" চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে! সপ্তগ্রাম যখন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছিল তাহার প্রায় সওয়া শত বৎসর পরে একজন ফরাসী নৌসেনাপতি (১৭২৫) কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াকে ভাগীরথীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য শহর বলিয়া লিখিয়াছিলেন। অবশ্য টেভারনিঁয়া বিদিত (১৬৬৬) নদীয়া, কাশীমবাজার ও মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধির সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু ঠিক ঐ সময় হইতেই ভাগীরথীর অবনতি হেতু জাহাজগুলিকে ত্রিবেণীতে নঙ্গর করিতে হইত; সেখান হইতে দেশী নৌকায় পণ্যদ্রব্য কাশীমবাজারে লইয়া যাইতে হইত।

এইরূপ ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে ফেডারিকি (১৫৭৮) বর্ণনা করিয়াছিলেন বিদেশী বণিকদিগকে বেতড়ে (হাওড়া সহরের অন্তর্গত বেতাই) জাহাজ নঙ্গর করিয়া নৌকায় পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রাম-বন্দরে যাইতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীমবাজার ইংরাজের সুপরিচিত, বাঙলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেশমব্যবসার কেন্দ্র ছিল। তখন কে অনুমান করিতে পারিত যে পশ্চিম বঙ্গের এই বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ দীপ্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা বর্দ্ধমানকে বাঙলার উদ্যান বলিয়া বর্ণনা করিত। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকর মনোরম দীর্ঘিকা ও আম্রকানন-সুশোভিত এবং বহু মন্দির ও চতুষ্পাঠীমণ্ডিত, শাস্ত্রাধ্যয়ন-মুখরিত জনপদ যে এত অধঃপাতে যাইবে তখন কে কল্পনা করিয়াছিল! অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ক্লাইভ ভাগীরথীর পথে মুর্শিদাবাদ পৌছিয়া নগরীর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেই বিরাট রাজধানীকে লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন কে জানিত ৫০ বৎসরের মধ্যেই রাজধানীর অদূরবর্ত্তী রাণী ভবানীর প্রসিদ্ধ বরানগর ম্যালেরিয়ায় একেবারে বিধ্বস্ত হইবে! উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ না হইতেই সেই প্রথম বাঙলার এই মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছিল বরানগরে। মুর্শিদাবাদ আজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জর্জ্জরিত;—শৃগাল-কুক্কুর আজ স্বচ্ছন্দে গঙ্গাপার হইয়া যায়, রাজধানীর অপর পারে জগৎ শেঠের গুপ্ত রাজকোষের রক্ষী যক্ষের আত্মা স্বর্ণ মুদ্রা গুণিতে-গুণিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, আর কবরে সিরাজউদ্দৌলার খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ গৌরবহানিতে শিহরিয়া উঠিয়া উত্তপ্ত শোণিতে রক্তিম হয়! উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কাশিম

বাজার, জঙ্গীপুর, সৈদাবাদ (ফরাশডাঙ্গা), কুমারখালি ও রাধানগর রেশমের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে আজ নদী-প্রবাহও নাই, বাণিজ্যও নাই, শিল্পও নাই, আছে শুধু বিপণির পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, শস্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে অরণ্য, গ্রামভিটার পরিবর্ত্তে ফণী মনসার কণ্টকবন, মানুষের পরিবর্ত্তে মশককুল !

আর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা

নদীরক্ষা না হইলে বাঙলার তিনভাগের দুইভাগে কৃষির উদ্ধার ও পল্লীর সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বাঙলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল যদি এমনই ভাবে আরও অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়, তবে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই কলিকাতাও সপ্তগ্রাম বা মুর্শিদাবাদের মত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। নদী রক্ষা ও সংস্কার, জলসেচ ও নিয়ন্ত্রিত জলপ্লাবন প্রবর্ত্তনের যে প্রণালীর আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে কলিকাতা বা ঢাকার মত শহরে জলস্রোত ও জলসরবরাহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার বসাইতে হইবে। গঙ্গা নদী যাহাতে বাঙলার নদীর ও জলপথের উত্তরোত্তর অপকর্ষ সাধন ও উপর্য্যুপরি বন্যা আনয়ন না করিতে পারে কমিশন বসাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্ত-প্রদেশ তাহার সুবিধামত জলসেচের জল গঙ্গা, যমুনা ও সর্দ্দা হইতে অপর্য্যাপ্ত টানিয়া লইতেছে। ইহাও বাঙলার নদীর গতিহ্রাসের একটি কারণ। একটি নিখিল ভারতীয় গাঙ্গেয় কমিশন যুক্ত-রাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন অনুগঙ্গ প্রদেশের বিপরীত স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

নদী-শাসন ও সংস্কার এবং জলসেচের আয়োজন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু যদি কায়েমী জমি বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হয় তবে যুক্ত প্রদেশ বা পাঞ্জাবের মত প্রাদেশিক উন্নতিবিধানে ঋণের অসুবিধা বা অর্থের অভাব হইবে না। মজুর, প্রজা, জমিদার ও বণিক সকলেরই স্বার্থ এখন কৃষির সম্পদ ও পল্লীর স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত। একটা বড় রকমের বহুবর্ষব্যাপী নদীশাসন, সংস্কার ও জলসেচের পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও কার্য্যকরী না করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল নাই; ইহাতে যেমন প্রজা ও মজুরের ক্ষতি তেমনই ক্ষতি জমিদারের। জমিদারকে আপনার শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলিতে হইবে না, তাহাকে শুধু অর্জ্জন করিতে হইবে সৎসাহস। কি উপায়ে নির্ব্বিবাদে জমির বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা আমি আমার "Land Problems of India" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখনকার খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্র জমিদারকে তাহা দিবার দায়িত্ব স্বীকার করিবে। জমিদারের নিকট হইতে স্বত্ব কিনিয়া লইয়া যেমন ঋণ শোধ হয় তেমনই কয়েক বৎসর ধরিয়া সুদ ও কিছু আসল হিসাবে রাষ্ট্র কিস্তি অনুসারে শোধ দিবে এবং প্রত্যেক প্রজার সঙ্গে জমির নূতন বন্দোবস্ত করিবে। খাজনার কত গুণ মূল্য হইবে, কিংবা কত কিস্তিতে জমিদার তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া জমিদারকে, বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিয়া প্রজাদিগকে, রাষ্ট্রের জামিন অবলম্বনে, জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

কায়েমী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন হইলে বাঙলায় শিল্প ও ব্যবসা নূতন

বল পাইবে। জমি বাংলার বাঙালী উকিল, ব্যবসায়ী ও মহাজনের প্রায় অধিকাংশ উদ্বৃত্ত অর্থ টানিয়া লইতেছে। তাই আজ বাংলার বড় শিল্প ও কারখানা ব্যবসায়ের মালিক ধনিক ইংরাজ, গুজরাটী ও মাড়োয়ারী। যখন লোক শিল্প, ব্যবসায় বা জমিকে সমানভাবে মূলধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্র মনে করিবে, তখন জমির দিকে ঝোঁক কমিবে। বাণিজ্যের মূলধনের তখন অভাব হইবে না। বাঙালী যেমন যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রপোতবাহী বণিক ছিল, আবার তেমনই হইবে। শিল্প, কারখানা ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য জমির সুবন্দোবস্ত যেমন অনুকূল হইবে কয়লার খনিতে ভরা বাঙলা-ভাষাভাষী সিংভূম, মানভূম প্রদেশকে বাঙলার রাষ্ট্রিক সীমানার মধ্যে ফিরাইয়া আনাও সেইরূপ উহার অনুকুল হইতে পারে। বঙ্গ বিভাগ এখনও রদ হয় নাই, উহার পূর্ণ রদ করিতে পারিলে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সাহায্যে বাঙলায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এখন যে একটা অসমতা রহিয়াছে তাহা শীঘ্র সংশোধন করা যাইতে পারে।

এত বিপুল কৃষিপ্রধান লোকবহুল দেশে কৃষি ও শিল্প কার্য্যের একটা যথাসম্ভব সমতা ও আদান-প্রদান প্রবর্ত্তিত না করিতে পারিলে আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে না। কারখানা ও শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে পল্লী-অঞ্চলে একটা নূতন বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও আয়েরকৌশল সঞ্চারিত হইবে। পশ্চিম বঙ্গের অনেক অঞ্চলের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জমির ফসলেরও কিছু পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের ন্যায় এখানেও আউশ ধান, যব, জাওয়ার, রবিশস্য প্রভৃতি অধিক পরিমাণে চাষ করিতে হইবে। কূপ-খনন বহুল পরিমাণে

চালাইতে হইবে। দামোদর বা দ্বারকেশ্বরের সানুদেশে যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত হইবে তাহা যেমন লোহার ও ইস্পাতের কারখানার বিরাট যন্ত্র-গুলিকে উঠাইবে নামাইবে, তেমনই আবার নলকূপ হইতে জল তুলিয়া দিকে-দিকে কৃষকের শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিয়া দিবে অথবা তন্তুবায়ের কুটীরে তাঁত এবং লোহা, পিত্তল ও কাঁসার কারিগরের কুটীরে লৌহযন্ত্র চালাইতে থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ফসলের পর্য্যায় ও কৃষির প্রণালী না বদলাইলে বাঁকুড়া জেলা যেমন এখন বাঙলার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতম সেই দশা বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলারও কৃষি, মানুষ ও গোমহিষকে আক্রমণ করিবে। শিল্পবিস্তার না হইলে কৃষির সম্যক্ উদ্ধার নাই। বাঙলাকে এই আসল আর্থিক তত্ত্বটুকুকে আজ আগ্রহে গ্রহণ করিতেই হইবে।

বিজ্ঞান ও সামাজিক বিচারবুদ্ধি

শিল্পের সঙ্গে আসে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সঙ্গে আসে কর্ম্মকুশলতা ও সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি। বাঙ্গালী আজ অভাবগ্রস্ত, অনশনক্লিষ্ট, তবুও সে অমিতব্যয়িতার দ্বারা তাহারা অনটন ও অনশন বাড়াইতেছে। তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্দ্ধশতাব্দীতে মান্দ্রাজ ব্যতীত অন্য সব প্রধান প্রদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আর এই লোকবৃদ্ধি হেতুই কেবল শিক্ষা-প্রচার, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, সংস্কৃতির বিস্তার নয় বাঙলার কৃষির উন্নতিও সুদূর-পরাহত হইতেছে। কৃষকের পরিবার বাড়িলে জোত খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়, চাষের ব্যাঘাত ঘটে। বাঙালী চাষীর অতি ক্ষুদ্র জমি তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে পারে না, অথচ, সে পরিবার-বৃদ্ধিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া

আছে। শহরে-শহরে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়িয়া চলাতে মজুরীর হার বৃদ্ধি, শ্রমিকের বাসস্থান নির্ম্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যবিধ সামাজিক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানেরও বিঘ্ন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি যে প্রজাস্বত্ব সংস্কার না হইলে কৃষকের মিতব্যয়িতা ও জীবনের উচ্চতর পদবী লাভ অসম্ভব, তাহাও অতিরিক্ত বিক্ষিপ্ত, জমি ও ভিটাবঞ্চিত, কৃষাণশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংখ্যা আজ প্রতিরোধ করিতেছে। বহু বৎসর হইতে বাঙলার জনসমাজ বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে ঘোর অমিতব্যয়ী হইয়াছে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অল্প বয়সে ঋতুমতী হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও নিকাপদ্ধতি প্রচলিত। যৌনজীবনে স্মৃতি ও আচারের বিধি-নিষেধ বাঙলার পল্লীসমাজ বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছে;—অপরদিকে অনাহার ও অস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের জীবনের উচ্চতর আশা নির্ম্মূল করিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট, রুগ্ন ও অবসন্ন দেহে সংযম রক্ষা করা সুকঠিন। তাই মিতব্যয়িতার আদর্শ দেশে টিকে নাই। বাঙলার কৃষকবধূ ১২ কিংবা ১৩ বৎসরেও জননী হয় এবং গৃহস্থালীর কাজ, মাঠ বা গোয়াল ঘরের কাজ যেমন তাহাকে বিশ্রামের অবসর দেয় না, তেমনই তাহার সন্তানউৎপাদনও দ্রুত চলিতে থাকে। যদি তাহার সন্তান ধারণের ব্যবধান বাড়ে তাহা হইলে হয়ত এতগুলি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, হয়ত ২।১ জনের শিক্ষার ব্যবস্থাও রোগের সেবা হয়, অবসরসময় সে একটু বিলাস প্রমোদ করিতে পারে, এবং সুজন্মার দিনে হয়ত ২।১টি রূপার গহনাও সে দাবী করিতে পারে। একটি সুনিয়ন্ত্রিত, ক্ষুদ্র পরিবারের নূতন আদর্শ কৃষকের কুটীরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য ও মহামারী বাঙলার নিত্য সঙ্গী হইবে। আচার

ও সংযম, মিতব্যয়িতা ও দূরদর্শিতা হারাইবার ফলে বাঙালী আজ দারিদ্র্যকে ও মহামারীকে অলঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাঙলার আর্থিক অধোগতির পশ্চাতে রহিয়াছে আরও ভীষণতর দারিদ্র্য, —যে দারিদ্র্য চিত্তের ও চরিত্রের।

মানুষ ও আবেষ্টন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দুই-এর মধ্যে আদান-প্রদানই জীবন। সূর্য্যচন্দ্র, ঋতু-পর্য্যায়, নদী-সমুদ্র যেমন মানুষের পরিশ্রম, গৃহস্থালী ও তাহার আচার-ব্যবহার, বিধি-নিষেধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে রাখিয়াছে তেমনই তাহারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে মানুষের অন্তর্জ্জীবনে তাহার আশা-নিরাশায়, তাহার জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে।

এই দেড় শত বৎসরের ভৌগোলিক প্রকৃতির বিপর্য্যয় কৃষ্টি ও শিল্পের প্রধান প্রাচীন কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া বাঙালীজাতিকে অদৃষ্টবাদী ও তাহার জাতীয় চরিত্রকে আজ হীনবল করিয়াছে। কিন্তু জাতীয় চিত্তের গোপন অন্তঃপুর হইতেই জীবনের প্রথম সাড়া জাগে, এবং ঐ সাড়া জাগিলে মানুষের শ্রম ও চাতুর্য্য, বুদ্ধি ও বিক্রম, বিরুদ্ধ ভৌগোলিক প্রকৃতিকে পরাস্ত ও বশীভূত করিয়া,—কুম্ভকার যেমন বাঙলার পলিমাটী লইয়া স্বেচ্ছামত পুতুল তৈয়ার করে তেমনই—প্রকৃতিকে তাহার জীবনের প্রয়োজনের অনুযায়ী করিয়া গড়িতে থাকে। বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্তে সেই প্রেরণা আসিয়াছে, এবং তাহার ফলেই তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিশ্রম ও নির্ম্মাণদক্ষতা উচ্চতর জীবন-যাত্রার আদর্শে ধ্বংসোন্মুখ আবেষ্টনকে লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন করিবে, বাঙলাকে নূতন করিয়া গড়িবে, যেমন যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাকে নিত্যনূতন করিয়া গড়িতেছে বাঙলার বালার্ককিরণস্নাত, ঈষৎ রক্তাভ পঙ্কিল জলস্রোত।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বরাজ বনাম ভূ-রাজ

পল্লীগঠনের ব্যর্থতা

প্রায় ২৫ বৎসর হইল চট্টগ্রাম সাহিত্যসম্মিলনে আমি 'পল্লী-সেবক' নামে এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে তখন নূতন উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সাহিত্য তখন বাংলার সকল প্রকার ভাবধারাকে ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত আপনার উদ্দাম স্রোতে টানিয়া লইতেছিল, ঠিক সেই সময় পল্লীর স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কার বিষয়ক আন্দোলনের সাড়া সাহিত্য-সভাতেও পৌঁছিয়াছিল। তাহার পর আর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে পল্লী-সংস্কার লইয়া অনেক আলোচনা হইল। রাষ্ট্রীয় গঠনের ভিত্তিস্বরূপ পল্লীর নীরব, আড়ম্বরহীন সামাজিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইল।

আশ্চর্য্য এই যে, চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় দলই এই পল্লীগঠনের ক্ষেত্রে মিলিল। রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সমাজের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তখনকার নেতারা তাহা ভাব-প্রবণ কবিকল্পনা বলিয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সকল নেতা এখন ইহাকেই রাষ্ট্রীয় জগতের একমাত্র বাস্তব আদর্শ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাও একেবারে নিরর্থক কল্পনা। কোন জাতি, কোন

দেশ কেবলমাত্র পল্লীসংস্কাররূপ বস্তুতন্ত্রহীন প্রোগ্রাম লইয়া দাঁড়ায়ও নাই, সিদ্ধিলাভও করে নাই। পল্লী-স্বরাজের কল্পনা দেশে জাগিয়াছে ইহা সত্য। সে কল্পনা অতি মনোরম। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বাধীন পল্লী-সমাজের বিরাট সমবায়ে একটা নীরব কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে—সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের শ্রেণীদ্বন্দ্ব সদ্ভাবে পর্য্যবসিত হইবে, সেই প্রাচীন শ্রেণীসঙ্ঘ, জাতির সেই সনাতন স্বায়ত্তশাসন, সেই সমাজ-বিন্যাসের শৃঙ্খলা বর্ত্তমান জগতে আবার ফিরিয়া আসিবে। 'প্রাচ্য-প্রজাতন্ত্র' (Democracies of the East) গ্রন্থে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে পার্লামেণ্টই প্রজাতন্ত্রের একমাত্র অথবা চরম অভিব্যক্তি তাহা নহে; বরং গ্রাম বা জাতি-পঞ্চায়েতে, শিল্পী বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্বায়ত্ত-শাসনে যে প্রজাতন্ত্র প্রাচ্যের বটতরুমূলে, মন্দির-প্রাঙ্গণে, গ্রামমণ্ডপে উন্মেষিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রকট হয় নাই, স্বাবলম্বন ধর্ম্ম শিথিল হয় নাই, হঠাৎ-নেতার অভ্যুদয়েও তাহা বিচলিত হয় নাই, উপরন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী রাষ্ট্রবিপ্লবের বহু ঝঞ্ঝা, সংগ্রাম বিদেশী আক্রমণের বিপুল বন্যা তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে তবু—সে ত সেই সহস্রশাখ গ্রামতরুর মত লোকচৈতন্যের উপর একটা নিবিড় শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ছায়া বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্র ও সমাজ

রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্রমবিকাশের কোন না কোন সময়ে লোক বুঝিতে পারে যে, সাম্যতন্ত্র জিনিষটা কেবল অনুষ্ঠানের ফল নহে। আমাদের দেশে এখন যে প্রজাতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে এই

ধারণা এখন ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে যে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি না থাকিলেও প্রজাতন্ত্রের গোড়ায় গলদ থাকিতে পারে।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ব্যত্যয়ের কথা আরও বেশী উঠিতেছে। কারণ, যে প্রজা-তন্ত্রের আদর্শ আমরা আজ গ্রহণ করিতেছি তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-সভ্যতা-প্রসূত, তাহার জন্ম ও বিকাশ ধন-তন্ত্রের সূতিকাগারে।

এ কথা বলা বাহুল্য, যে-প্রকার রাষ্ট্র-গঠন আমরা স্বীকার করিতেছি তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফল, তাহা কৃষি-প্রধান দেশের আধার ও আশ্রয় গ্রাম্য-সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইউরোপের কৃষি-প্রধান দেশসমূহে যে পার্লামেণ্ট ছাড়া আর এক প্রকার শাসন-পদ্ধতি আছে, ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন কেন্দ্রের সমবায়ে যে এরূপ শাসনে সমূহ বন্ধন হইতে পারে, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও আমরা বিলাতের সহিত ঝগড়া করিয়া নিছক বিলাতী জিনিষেরই সরবরাহ করিতেছি।

যে-সকল দেশে সমাজ ও সভ্যতার বৈচিত্র্য বেশী, সেখানে একটানা মাথা-হিসাব ভোট-নীতির অবলম্বনে পার্লামেণ্টের শাসন যে সাম্যের সৃষ্টি করিবে তাহা কৃত্রিম ও বিষময়।

অপর দিকে মাথা-হিসাব ভোট-নীতি কেবলমাত্র সেই সমাজেই চলিতে পারে, যেখানে শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও সমাজে শ্রেণী, জাতি বা ধর্ম্মের বিরোধ নাই। শিক্ষার তারতম্য অথবা জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়গত বিরোধ থাকিলে, শাসন কোন বিশেষ প্রবল শ্রেণীর করতলগত হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্র তখন ভিন্ন দল, জাতি বা ধর্ম্মের মনোমালিন্যের ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠে। ইহা সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর।

অশিক্ষিত জনবহুল বিরাট্ কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে শাসনের কেন্দ্রীকরণ শুভ নহে। কৃষি ও জমি সংক্রান্ত আইন-কানুন যাহাতে বিচিত্র হয়, তাহাই কৃষকের পক্ষে হিতকর। তাহা ছাড়া জাতিধর্ম্মগত দ্বন্দ্ব নিরাকরণের প্রধান আধার গ্রাম্য-সমাজ। পূত ও অপবিত্র জাতির বিরোধ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইত্যাদির মীমাংসার পথ তখনই প্রশস্ত হইবে, যখন,—রাজধানীর বৈঠকে নহে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও শহরের বিচিত্র সভা-সমিতিতে,—সকলে মিলিয়া স্থানীয় অভাব মিটাইবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে;—মন-গড়া দ্বন্দ্ব তখন আর বিচিত্রমুখী হইয়া দেখা দিবে না।

দেশের ইতিহাস ও আবেষ্টনের প্রভাব এত বেশী যে, বহু প্রয়াস-সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট-ঔষধ এ দেশে ধরিবে না। নিখিল-রাজনৈতিক দল মিলিয়া জোর-গলায় চীৎকার করিলেও সমাজ-বিন্যাস ও জন-চরিত্রের প্রভাবই যে বেশী, তাহা প্রমাণ হইতে দেরী হইবে না।

রাষ্ট্র-গঠনের উপর সমাজ-সংস্কারের ভার দিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কারণ, রাষ্ট্র যদি সমাজ-রীতির অনুকূল আচরণ না করে, তাহা হইলে সমাজে নূতন অশান্তি ও অসদ্ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাসের বৈপরীত্য বেশী দেখা দেয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যতই জাতি-সমুদায় ভূমিগ্রাসী ও অর্থলোলুপ হইয়া অপরের গ্রাস কাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল, ততই রাষ্ট্রসমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া আপনারই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। রাষ্ট্রশক্তির এই বিপরীত আচরণ তখন হইতে পৃথিবীতে কতই না অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হইয়াছে! কারণ,

যুদ্ধ যেমন রাষ্ট্রের প্রধান সহায়, রাষ্ট্রও তেমনি যুদ্ধের প্রধান অবলম্বন, —সে-যুদ্ধ সমাজের বাহিরেই হউক, বা ভিতরেই হউক।

পার্লামেণ্ট-শাসনের খসড়ায় হিন্দু-মুসলমানের বাহিরের বিরোধের মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু শাসন-বিন্যাসের ফলে বিরোধ সমাজের অভ্যন্তরে আরও সুপ্রতিষ্ঠ হইল। গ্রামে, ও জনপদের পঞ্চায়ত ও সভায়, সাধারণ রাষ্ট্রিক দায়িত্ববোধ—জাতি ও ধর্ম্মগত বৈরভাব নিরাকরণের একমাত্র উপায়। ভিন্ন-ভিন্ন স্থানীয় পঞ্চায়ত, সভা ও সমিতি যদি প্রাদেশিক সভায় প্রতিনিধি পাঠায়, তবেই সেই প্রতিনিধির জাতি ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব ঘুচিবে। যে-দেশে জাতি ও ধর্ম্ম-গত বিরোধ প্রবল, সেখানে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন গৌণভাবে করা বিধেয়। তবেই প্রতিনিধিগণ ধর্ম্ম ও জাতির গোঁড়ামির দ্বারা না হইয়া, স্থানীয় জন-হিতৈষণার দ্বারা, প্রেরিত ও নিয়মিত হইবে। রাষ্ট্রনীতির এই regionalism তত্ত্ব আমরা রাষ্ট্র-বিন্যাস খসড়ায় সাদরে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ফলে সার্ব্বজনীন শিক্ষার কথা উঠিলে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃগণ তাহা কিরূপে সম্প্রদায়-গত রাষ্ট্রশক্তির ইন্ধন যোগাইবে, তাহাই চিন্তা করিবে, শিক্ষা যে শিক্ষার জন্যই, রাষ্ট্রের ইন্ধনের জন্য নহে এ ধারণা তাহাদের আসিবে না। হিন্দু বিধবা-বিবাহনীতি প্রবর্ত্তন করিবে, প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কার হিসাবে নহে, রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির কামনায়।

ইহার ফলে শিক্ষার বিস্তার ও সমাজের কল্যাণের পক্ষে নানা অবান্তর বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে।

কৃষিপ্রধান দেশে ভূমিই লক্ষ্মী, ভূমিই রাক্ষসী। ভূমি-সংক্রান্ত

আইন-কানুন রীতি-নীতি সমাজের শান্তির কারণ, বিপ্লবেরও কারণ। যাহাতে প্রত্যেক কৃষক তাহার শ্রমলব্ধ ফসলের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত না হয়, অথবা জমিদার বা মহাজন তাহার ন্যায়ের দাবী অস্বীকার না করে,—যাহাতে প্রত্যেক কৃষক উত্তরাধিকার-সূত্রে বংশপরম্পরালব্ধ ক্ষেত্র ভোগ করিয়া আপনার শ্রম ও ধন ভবিষ্যৎ বংশকে দায়-স্বরূপ অর্পণ করিতে পারে,—যাহাতে কৃষক-শ্রেণী বিলাসী ও রাষ্ট্রবিমুখ হইয়া ভূমি-হীন চাষীকে শোষণ না করিতে পারে,—রাষ্ট্রের সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে ভূমি-স্বত্বের বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাতে কৃষক হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, শাসক ও শোষক শ্রেণীর অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অযোধ্যা, আগ্রা ও বাংলায় ভূমির অধিকার ও স্বত্বের যে মীমাংসা হইল, তাহাতে ন্যায় বা অর্থনীতির জয় হয় নাই, জয় হইয়াছে কূট, সম্প্রদায়-গত সঙ্কীর্ণ রাজনীতির। ফলে, ভূমি দিকে-দিকে রাক্ষসী-মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে ; ধন ও অধিকারের যে ভূমি-কম্প আসন্ন তাহার ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি।

জনশিক্ষা-বিস্তার ও সামাজিক সংস্কার ও কল্যাণের সুদীর্ঘ পথ, জাতীয় উন্নতির সহজ ও প্রশস্ত পথ। এই ‹.গ সবল সুস্থকায়, শিক্ষিত গর্ব্বোন্নতশির জনগণের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। বিপ্লবের রক্ত-নিশান সেখানে উড়ে না। শান্তি-স্থাপনের দুর্নিবার অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজনও সেখানে নাই। জনগণ যখন জাতি শ্রেণী বা ধর্ম্মের বিরোধ আপনাদের শিক্ষা ও সামাজিকতার প্রভাবে অতিক্রম করে তখনই রাষ্ট্রের কল্যাণ-শ্রী প্রতিভাত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য,

জমিদারীর দুর্নীতি, জাতি ও ধর্ম্মের বিরোধ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রভেদ, সমাজের লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রত্যাখান করে। অপরদিকে রাষ্ট্র যখন শান্তি ও সামাজিকতার আধার ও প্রতিভূ হয়, তখন সে শুধু দশপ্রহরণ-ধারিণী হয় না, তাহার দুই পাশে থাকে—লক্ষ্মী-সরস্বতী, সম্মুখে থাকে তাহার সিদ্ধি ও সৌন্দর্য্য। পুরাণে আছে, 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বস্থনাঞ্চিকিতুষী।'

পার্লামেণ্ট বনাম প্রজাতন্ত্র

ইংরাজ-রাষ্ট্রি আমাদিগকে শাসন-তন্ত্র দিতেছেন কিন্তু জনশিক্ষা ও জন-শক্তি দেন নাই। বরং দেশের প্রাচীন নীরব প্রজাতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করিতেছেন এবং জাতিতে-জাতিতে এবং সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কলহের সৃষ্টি করিয়া প্রজাশক্তির কল্যাণ মূর্ত্তির নয়, রাক্ষসী মূর্ত্তির প্রশ্রয় দিতেছেন। জনসাধারণ পার্লামেণ্ট চাহে না, কিন্তু প্রজাতন্ত্র চাহে। দেশের শাসন দেশের সমাজ-বিন্যাসের উপর গঠিত না হইলে তাহা সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। বিদেশী অনুকরণের যুগে এ কথা পুস্তকে-প্রবন্ধে, সভা-সমিতেতে নানারূপে বলা প্রয়োজন। কারণ টেম্‌সের কিনারা হইতে নূতন আমদানী যে শাসনের অনুষ্ঠান গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই দেশের লোককে দেশের চিত্ত হইতে টানিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা মিথ্যা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে।

এ কথা ঠিক যে আমাদের পার্লামেণ্ট জনসাধারণের চিত্তে স্থান পায় নাই, জনসাধারণের অভাব ও অভিযোগ তাহা কমই শুনে।

ইহা যে মধ্যবিত্ত বা ধনীর স্বার্থসাধনের উপায় বা বিরামের আশ্রয়,— তাহা সাম্যবাদীর আক্ষেপ বলিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। অপরদিকে এই প্রকার রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান দেশের পুরাতন সহজ ও কায়েমী শাসনের অন্তরায় হইয়াছে। শুধু পঞ্চায়েতের পুনরুদ্ধার,—কয়েকজন গভর্ণমেণ্টের আম্‌লা, প্রেসিডেণ্ট, পঞ্চায়েত, দফাদার, চৌকিদার প্রভৃতি সৃষ্টি করিলে চলিবে না। উপর হইতে উহাদের নিয়োগ ও দৈনিক তত্ত্বাবধানই উহাদের প্রধান বিঘ্ন। ইউনিয়ন-বোর্ড-আইন পরিবর্ত্তনেও কিছুই হইবে না। গোড়াপত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে গ্রাম্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভার, খাজনা সংক্রান্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, খাজনা আদায় প্রভৃতির দায়িত্ব দিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, জেলা হইতে হুকুম জারি বন্ধ করিতে হইবে। এক কথায় পুরাতন পল্লীসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

পল্লীসমাজের সমবায়ে জেলা-সমাজ, জেলা-সমাজের সমবায়ে প্রাদেশিক সমাজ, এইরূপে স্তরে-স্তরে বিস্তার চাই এবং উত্তরোত্তর প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পী অথবা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কেন্দ্রে সহজেই মীমাংসিত হইবে।

এই প্রকার রাষ্ট্রের গঠনে আমলা ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইবে, শাসনের ব্যয় কমিবে অথচ শাসন প্রত্যক্ষ হওয়াতে লোক-চৈতন্য জাগ্রত থাকিবে।

কিন্তু যে-সঙ্ঘ আমাদের পুরাতন সমাজ-বিন্যাসকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ভারতে একটা সজীব অনুষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহা রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ না হইয়া

ভারতের বিশেষ দান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, প্রজামণ্ডলের এইরূপ সঙ্ঘ স্থাপনে অনেক বিঘ্ন।

প্রজার অধঃপতন

কৃষিপ্রধান দেশে জমির অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের ছাঁদ নিরূপণ করে। জমির অধিকার হইতে পল্লীসমাজ ধীরে-ধীরে গত এক শতাব্দী ধরিয়া বিচ্যুত হইয়াছে, তাই সমাজবিন্যাস বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে।

সে ইতিহাস ভারতের জনসাধারণের পতনের অতি করুণ ও শোচনীয় ইতিহাস। এই ইতিহাসের মর্ম্ম না বুঝিলে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তোলা কঠিন। বাংলা দেশের কায়েমী বন্দোবস্ত, প্রজার দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহার পুরাতন প্রথানুযায়ী স্বত্বের লোপ সাধন করিয়াছিল এবং যে-গ্রাম্যসমাজ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইত তাহারও মূলচ্ছেদ করিয়াছিল। যেখানে জমিদারের আবির্ভাব সেখানেই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্যসমাজের বিশৃঙ্খলা। গ্রামের সাধারণ গোচারণভূমির উপর সকলের অধিকার। ছুতার, কামার, নির্ঘন্টী, চৌকীদার প্রভৃতির নিয়োগ ও শাসন, গ্রামের খাল ও পুষ্করিণীর সংস্কার, জল-সরবরাহ প্রভৃতিতে গ্রাম্যসমাজের দায়িত্ব—সবই জমীদারীর সূচনায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষির অবনতি হইয়াছে, অপর দিকে জমির স্বত্বের হস্তান্তরে সমাজও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে সাধারণ গোচারণ-ভূমি, মাঠ ও জঙ্গলে সকলের সমান অধিকার ছিল,—কেহ ব্যক্তিগত

ভাবে তাহা ভোগদখল করিতে পারিত না। গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা জাতিসভা গোচারণের জন্য শুল্ক ধার্য্য করিয়া তাহা সাধারণ উন্নতি, পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার বা বৃক্ষরোপণ প্রভৃতিতে ব্যয় করিত। জমিদার এখন কৃষির ক্ষেত হইতে গোচারণ-ভূমি পর্য্যন্ত সব ভোগদখল করিতেছেন। গোচারণ-ভূমি দখলের জন্য গো-জাতির অবনতি দেখা গিয়াছে। বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশে প্রজা-জমিদারের বিরোধের একটি প্রধান কারণ গ্রামের অনাবাদী প্রান্তভূমির উপর জমিদারের অধিকার স্থাপন। গো-জাতির খাদ্যশস্য ও মানুষের পোড়ানি কাঠ সংগ্রহের অসুবিধা নানারূপে জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্তরায় হইয়াছে।

বাংলা, বিহার, যুক্ত এবং মধ্যপ্রদেশে প্রজার সনাতন স্বত্বের লোপসাধন যে কৃষির অন্তরায় হইয়াছে, এবং সেই ভুল সংশোধন আধুনিক প্রজাস্বত্ব-সংক্রান্ত আইন সমূহের মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক প্রদেশেই জমিদার ও প্রজার স্বত্ব এইরূপে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত উঠা-পড়ার ছন্দে চলিয়াছে, কিন্তু আইনের নির্ব্বিকার লীলা যে কত পুরাতন অনুষ্ঠান ভাঙ্গিয়াছে, কত অচ্ছেদ্য সমাজ-গ্রন্থি ছিঁড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন প্রজার উচ্ছেদ ও অবাধ খাজনা বৃদ্ধি নিবারণ প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। পূরাপূরি স্বত্ব গ্রাস করিয়া পরে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতি অনুসারে প্রজাস্বত্বের কিছু অংশ রাখিয়া কিছু অংশ ফিরাইয়া দেওয়াতে নানা বিপদ ঘটিয়াছে। খাজনা ছাড়া নানাবিধ আব্‌ওয়াব ও উপরী, বাংলা বিহার উড়িষ্যা যুক্ত ও মধ্য প্রদেশে প্রচলিত আছে। কায়েমী স্বত্ব

থাকার জন্য বাংলা বিহারে আব্ওয়াবের উপদ্রব বরং কম; তবুও জমির হস্তান্তরের সময় জমিদার নজর বা সেলামী পান। মধ্যপ্রদেশে ১৯২০ সালের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন হইবার পূর্ব্বে জমিদার ও পুরাতন প্রজা উভয়েই নূতন প্রজার নিকট কিছু আদায় করিয়া লইত।

যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে প্রজা-স্বত্ব সম্পূর্ণ কায়েমী না হইয়া সাত বা দশবৎসরের অথবা এক পুরুষের হওয়াতে একদিকে যেমন জমিদার সময়াতিবাহের সহিত যাহাতে স্বত্ব না বর্ত্তায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, অপর দিকে প্রজা হস্তচ্যুতির ভয় ও অনিশ্চয়তা হইতে অব্যাহতি চাহে। জমির তুলনায় চাষীর সংখ্যা বেশী। প্রজা দুর্ব্বল, তাই জমিদার খাজনা বাড়াইয়া লয়, নজরানা পায়।

নিম্নশ্রেণীয় প্রজা

প্রজা আবার কায়েমী স্বত্ব পাইলে কৃষাণ মজুর বা ভাগীদারের নিকট জমিদার সাজিয়া বসে। বাংলা দেশে পাঞ্জাবে ও মান্দ্রাজে তাহা ঘটিতেছে।

বাংলার ১৮৮৫ সালের যে আইন—প্রজা-স্বত্ব রক্ষার আদর্শ বলিয়া অন্য প্রদেশে গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রধান ভুল হইয়াছে এই যে, ইহা কায়েমী স্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা রায়তের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে না লাগিয়া অনেক সময়ে আসল কৃষকের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করার সহায় হইয়াছে। জমির লেন-দেনে আইনের বাধা থাকা স্বত্ত্বেও জোতদার—জমি অপরের দ্বারা চাষ করাইয়া তাহার স্বত্ব ভোগ করিতেছে। যে-জোতদারের স্বত্ব আইনের দ্বারা সুরক্ষিত

তাহার নীচে এইরূপে বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশে এক অবলম্বনহীন নিম্ন রায়ত শ্রেণী দেখা দিয়াছে। যেখানে লোকসংখ্যা অধিক এবং জমির পরিমাণের তুলনায় মানুষ বেশী, সেখানে এইরূপে চাষী জমিদার সাজিতেছে,—অপেক্ষাকৃত নিরাশ্রয় চাষীকে জমি ভাগে দিয়া নিজে কৃষি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা দেশে ভাগীদার, আধিয়ার, বর্গাদার প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম নহে। অনেক সময় তাহারা নিজেরাই রায়ত ছিল, এখন জমি বন্ধক দিয়া, বিক্রয় করিয়া মহাজন অথবা ধনী রায়তের নিকট দিনমজুর অথবা ভাগী হিসাবে খাটিতেছে। এইরূপে যাহারা আসল প্রজা তাহারা বিপর্য্যস্ত বিতাড়িত হইতেছে, 'নিজ বাসভুমে পরবাসী' হইতেছে। জমি বন্ধক দেওয়া, ভাগে দেওয়া,—এর পশ্চাতে এইরূপ কর্ম্মঠ কৃষকের উচ্ছেদের একটা নীরব ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে পাঞ্জাব স্বাধীন স্বাবলম্বী, কৃষকপরিবারের কর্ম্মভূমি সেই এক পাঞ্জাবে গত দশবৎসরের মধ্যে খাজনা আদায়ীর সংখ্যা ৬,২৬,০০০ হইতে দশ লক্ষের অধিক হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে যে-সব জেলায় ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি এবং পাড়িয়াল দাসের সংখ্যা অধিক সেখানে ভূস্বামী কৃষক অপেক্ষা ভূমিশূন্য হলবাহী চাষীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে।

হলবাহী

কিন্তু যেখানে গভর্ণমেণ্ট জমিদারের সহিত স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন হলবাহী কৃষকের সংখ্যা সেখানেই বেশী। এবং সেই সব প্রদেশেই স্বামিত্ববিহীন হলবাহী চাষী যে ভারতের একটা

নূতন অথচ বিষম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করিতেছে তাহার খোঁজ খুব কম নেতাই রাখেন।

প্রথমতঃ হলবাহী চাষী, অপেক্ষাকৃত নিঃসম্বল। তাহার মূলধন কম, সঞ্চয় নাই বলিলেও চলে। কাজেই তাহার জমি টুকরা হিসাবে সব চেয়ে কম। অথচ জোদদার, চুকানিদার ও অন্যান্য কায়েমী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা সে অধিক পরিমাণে জমির খাজনা দেয়। দিনাজপুরের কয়েকটি জমিদারীতে জমির পরিমাণ ও খাজনা এইরূপ দেখা গিয়াছে।

চাষী	জমির পরিমাণ	খাজনা—প্রতি একার
	একার	টাঃ আঃ পঃ
মৌরুশী	৭.২৯	১—১৩—০
কায়েমী	৩.১৫	১—১৫—০
জোতদার	২.৫৪	১—১২—০
বর্গাদার প্রভৃতি	২.২৬	২—১৫—০

যুক্তপ্রদেশে অনেক জেলাতেই স্বামিত্ববিহীন হলবাহী আসল প্রজা অপেক্ষা দেড় এমন কি দ্বিগুণ খাজনা দেয়। অথচ তাহাদের জমির পরিমাণ আধ একার, এমন কি সিকি একারেরও কম। বস্তি ও গোরখপুর জেলায় জমির টুক্‌রা এত কমিয়াছে যে, কৃষির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিযাছে। চাষীকে লাঙল-বলদ ধারে অথবা যৌথে আনিতে হয়। ক্ষেতের ফসলে পরিবার প্রতিপালন সঙ্কুলান হয় না। কয়েক মাস নিজের জমিতে চাষ, এবং অন্য কয়েক মাস কৃষাণের কাজ, করিয়া চাষী পরিবার প্রতিপালন করে, অথবা গ্রাম ছাড়িয়া দলে-দলে চা-বাগানে কুলীর কাজ করিতে যায়।

খুচরা জমি

ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ভূমি খুব উর্ব্বরা, সেখানে লোক-সংখ্যা খুব বৃদ্ধি ও জমির পরিমাণ খুব হ্রাস পাইয়াছে। হলবাহী হল পায় না—কোদাল ধরিতেছে, ক্ষেতের ফসলের পরিশ্রমানুযায়ী অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে হয়ত কৃষাণ হইয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে ফিরিতেছে—অথবা আড়কাটীর প্রস্তাবিত সৌভাগ্য-স্বপ্নে প্রলুব্ধ হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে।

জমির আকারের হ্রাস নিবারণের একমাত্র উপায় উত্তরাধিকার--আইন পরিবর্ত্তন। পাঞ্জাবে যৌথ চাকবাটা-সমিতি বিক্ষিপ্ত জমির পরিবর্ত্তে এক সীমানার মধ্যে কৃষকের জমি পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। দেড় শতের অধিক এইরূপ সমিতি কৃষকের উপকার সাধন করিতেছে। তাঞ্জোর ও ত্রিবাঙ্কুরে কৃষকেরা পরস্পরের মধ্যে জমি বদল করিয়া চাষের সুবিধা করিতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বিক্ষিপ্ত জমির টুক্‌রা বৃদ্ধির অসুবিধা এত বেশী ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, আইন সংস্কার ভিন্ন তাহা দূর করা কঠিন। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে প্রথা আছে যে, কর্ত্তার মৃত্যুর পর জমি উত্তরাধিকার-সূত্রে একজন মনোনীত পুত্র বা অন্য কাহাকে বর্ত্তায়। সে অন্যান্য উত্তরাধিকারীকে কিছু টাকা দিয়া ক্ষতিপূরণ করে। ইহাতে জমি বিভক্ত হইতে পায় না এবং চাষের অসুবিধা ঘটে না। এই ধরণের কোনও নীতি এ দেশে প্রচলন করার খুব প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এটা ঠিক, যেদেশে দুই তিন বা আরও বেশী ফসল উৎপন্ন হয়, সেদেশে ভিন্ন-ভিন্ন মাটির ভিন্ন ভিন্ন মাঠে খুচরা জমি থাকিলে অজন্মা,

অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইতে ভয় খুব কম থাকে। সুতরাং খুচরা ও বিক্ষিপ্ত জমি ভারতবর্ষের কৃষির অবলম্বন। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি আইন পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী মনে করি।

আইন-সংস্কার

দেশে-দেশে খাজনা-আদায়-কারী একটি অলস শ্রেণীর সৃষ্টি কৃষির পক্ষে অল্প ক্ষতিকর হয় নাই। পূর্ব্বে যাহারা কর্ম্মী চাষী ছিল অবস্থা ফিরিতে তাহারাও জমি ভাগে খাটাইতেছে; নিজেরা বসিয়া থাকিয়া নিম্ন শ্রেণীর কৃষককে শোষণ করিতেছে। বাংলায় জোতদার বা বোম্বাই প্রদেশে লিঙ্গায়েতগণ, মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এইরূপে কৃষি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া কৃষকের লভ্য ভোগ করিতেছে। নানা উপায়ে এইরূপ শোষণ প্রতিরোধ করিতেই হইবে। আইন করিয়া পাঞ্জাবে কৃষকের নিকট হইতে মহাজন ও অন্য অকৃষক-শ্রেণীর নিকট জমির হস্তান্তর বন্ধ করা হইয়াছে। যে-জমি ভাগে দেওয়ার প্রথা কায়েমী-স্বত্ব-বিশিষ্ট বাংলার রায়ত, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের জমিদার চাষীকে কৃষিবিমুখ শোষক শ্রেণীতে পরিণত করিতেছে, এক বৎসরের অধিক জমি ভাগে খাটানো বন্ধ করিয়া তাহা মধ্যপ্রদেশে ১৯২০ সালে প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক আইন প্রতিরোধ করিয়াছে। সেখানে জমি চাষী বা আত্মীয় ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না, জমি হইতে এক বৎসরের অধিক অন্য কাহারও নিকট খাজনা আদায়ও হইতে পারিবে না।

রুশিয়ায় জমি কেহই অপরের দ্বারা এক বৎসরের অধিক চাষ

করাইতে পারে না। যদি কৃষক-পরিবার সহরে যাইতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে জমির অধিকার ত্যাগ করিতে হয়।

রুশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু একই প্রকার সমস্যা প্রায় একই প্রকার আইনের দ্বারা সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে মধ্যপ্রদেশের মত জমির হস্তান্তর ও জমি ভাগে দিয়া খাজনা আদায় নিবারণ করিতে পারিলে নিম্নতর কৃষকগণের প্রতি ন্যায়বিচার হয়। যুক্তপ্রদেশে প্রজা এখন কায়েমী স্বত্বই পায় নাই, এ সব ত দূরের কথা। কায়েমী-স্বত্ব প্রতিষ্ঠার যেখানে বিলম্ব আছে, সেখানে ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মত বাটাই বা ভাগে চাষ প্রবর্ত্তন কৃষির বিশেষ সহায় হইতে পারে। সেখানে জমিদার বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, বীজ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকে, প্রজা লাঙ্গল ও পরিশ্রম যোগায়। উভয়ের পরস্পরের দায়িত্বে বৈজ্ঞানিক কৃষির বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। ভাগের নানাপ্রকার চুক্তি আছে এবং তাহাদের মূল উদ্দেশ্য জমিদার ও প্রজা উভয়েরই কৃষি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণ। চুক্তি লইয়া বিবাদ হইলে গ্রাম্যসভাই নিষ্পত্তি করিয়া দেয়।

কৃষাণের সংখ্যাবৃদ্ধি

সকল কৃষকের জমি সম্বন্ধে সমান অধিকার, গ্রামের গোচারণ-মাঠ, জঙ্গল, পুষ্করিণী ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রামবাসী সকলেরই অধিকার ;—ইহ হইতে প্রজাস্বত্বের লোপসাধন ও উচ্ছেদ এবং এক নিরাশ্রয় 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' কৃষাণ ও দিনমজুর শ্রেণীর সৃষ্টি গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। পূর্ব্বেকার মত কৃষাণ আর কৃষির দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারিতেছে না। ১৯১১-১৯২১ দশকে বাংলা দেশে সাধারণ কৃষক ও তাহাদের প্রতিপালিত আত্মীয়গণের সংখ্যা ২৭,৭৪৮,৬৬৬ হইতে বাড়িয়া ৩০, ৫৪৩, ৫৫৭ হইয়াছে। কিন্তু কৃষাণের সংখ্যা ৩,৬৬০,০০০ হইতে ১,৮০৫,৫০২ কমিয়াছে, সংখ্যা দশ বৎসরে অর্দ্ধেক হইয়াছে। মধ্য-প্রদেশে কৃষাণের সংখ্যা শতকরা ৫২, বিহারে ২২ এবং যুক্ত প্রদেশে ১১·৩ কমিয়াছে। এদিকে দিনমজুর শ্রেণী উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে দিনমজুরের সংখ্যা ৮,২৭৩,৬৫০ হইতে ৯,৩০০,১০৫ বাড়িয়াছে—শতকরা ১২·৪ বৃদ্ধি।

১৯২১—৩১ দশকে জোতদার ও রায়তের সংখ্যা ৯,২৭৪,৯২৪ হইতে কমিয়া ৬,০৪১,৪৯৫ হইয়াছে ;—দশ বৎসরে শতকরা ৩৫ হ্রাস। অপরদিকে কৃষাণেরা শতকরা ৫০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা এখন সংখ্যায় ২,৭১৮,৯৩৯। ১৯২১ সালে কৃষাণ ও চাকরদের সংখ্যা ছিল ১,৮০৫,৫০২। বুঝা যাইতেছে যে, বাটোয়ারা হেতু জমি ক্ষুদ্রতর হওয়ার জন্য এবং ব্যবসায়মান্দ্য হেতু কৃষির দুর্দ্দশার জন্য অনেক জোতদার ও প্রজা জমি হইতে বিতাড়িত হইয়া কৃষাণশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অপরদিকে জমি ক্রমশঃ চাষবিরত মহাজন ও মধবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়িতেছে। বাংলায় ১৯২১—৩১ সালের মধ্যে ভূম্যধিকারী এই মধ্যবর্ত্তীদের সংখ্যা ৩৯০,৫৬২ হইতে বাড়িয়া ৬৩৩,৮৩৪ হইয়াছে। কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের মোটসংখ্যা বৃদ্ধি, অথচ যাহারা ভূম্যধিকারী কৃষক তাহাদের সংখ্যা হ্রাস এবং কৃষাণের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘোর

সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিচয় দিতেছে। চাষের মাঠে যতই মধ্যবিত্ত ও মহাজনশ্রেণীর প্রভাব বাড়ে, যাহারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা নিজেরা চাষ করে তাহারা ভূমির অধিকার হইতে যতই বঞ্চিত হয়, অথবা যেখানে তাহাদের ভূমির অধিকার আছে সেখানে অতিরিক্ত খাজনা বা মহাজনের সুদ বাদ দিয়া তাহাদের লভ্য যতই এমন কমিতে থাকে যে পরিবার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না, ততই মাঠের দ্বন্দ্ব একটা বিপুল রাষ্ট্রিক বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইতে থাকে। এই ইন্ধনে আবার বাতাস যোগান দেয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। বাংলায় যে-সব অঞ্চলে জমিদার ও মহাজন হিন্দু এবং রায়ত ও কৃষাণ মুসলমান সেখানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অশান্তি, ঈর্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিলিয়া একটা ঘোর সামাজিক ওলটপালটের সূচনা করিতেছে।

ঋণসালিশী

বাংলার নূতন ঋণসালিশী আইন মহাজনের অবিচার ও অত্যাচার হইতে অনেকটা চাষী খাতককে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই আইনের সম্পূর্ণ ফল পাইতে হইলে নানা দিক হইতে চাষীকে কৃষি-ঋণ সুলভে দিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। ঋণসালিশী-বোর্ড গঠনের জন্য কৃষিঋণ অল্পবিস্তর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে রায়তদের নিঃসন্দেহে এই উপকার সাধিত হইয়াছে যে, সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে তাহারা এখন কম খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং ঋণের জন্য তাহাদের জমিজমা বিক্রয়ের সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কৃষিকার্য্যের সাধারণ প্রয়োজনেও তাহারা যে

ঋণের পরিমাণ কমাইয়াছে, তাহাতে চাষবাসের প্রণালী খারাপ না হইয়া পারে নাই। গরীব রায়তেরা অনেক সময় হালের গরু পর্য্যন্ত কিনিতে পারে না। একমাত্র সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিই পল্লী মহাজনদের স্থানাধিকার করিতে পারিত! কিন্তু সমবায় ঋণদান সমিতি সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; কাজেই আংশিকভাবে শস্যহানি ঘটিলেও কৃষিঋণদান বৃদ্ধি করা ভিন্ন সরকারের অন্য উপায় থাকিবেনা। ঋণসালিশী ও খাইখালাশী জমিবন্ধক রহিতের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে সে-সঙ্গে সরকার-অনুমোদিত সমবায় সমিতি ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। মহাজনদের কিস্তী আদায়ের যথোচিত বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথায় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ও সমিতি-সমূহের নিকট ফসল দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বহু কৃষকের হাতে আর রূপা নাই! গ্রামের শতকরা ১৫ জন লোক বর্গাদার; তাহাদের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হইতেছে। অনেক অঞ্চলে কানী প্রতি ৩ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্য্যন্ত জমি-বর্গার জন্য দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে নিড়ানের খরচ ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বহু বর্গাদার ও দরিদ্র রায়তকে গরু-বাছুর বিক্রী করিতে হয়। সে সময় বহুলোক ডাল-ভাতের পরিবর্ত্তে মিঠা আলু খাইয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকে। বৃষ্টির দিনেও তাহারা নিজেদের জীর্ণ কুটির মেরামত করিতে পারে না। রোগে চিকিৎসা ও শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই তাহাদের নাই।

গ্রামে-গ্রামে সামাজিক সাম্যতন্ত্র প্রচার করিবার লোকের অভাব নাই। অনটন ও নির্য্যাতনের মধ্যে ভূমিস্বত্বহীন বর্গাদার ও নিরাশ্রয়

কৃষাণ উভয়েরই শ্রেণীচেতনা জাগিয়া উঠিতেছে। একদিকে শ্রমবিমুখ মধ্যবর্ত্তী অংশীদার অপরদিকে কৃষাণ ও দিনমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আসন্ন। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলির সহিত অল্প পরিচয়েই বুঝা যায় যে, প্রজা-বিদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয়ে সংঘর্ষের উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া বৃহত্তর সঙ্কটের পথে পূর্ব্ববঙ্গকে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে।

কৃষি ও শিল্পের যোগস্থাপন

পূর্ব্ববঙ্গে কৃষকগণের পরিশ্রম দেখিলে বিস্ময় আসে। জলপ্লাবিত পাট ও ধানের জমিতে কৃষকেরা যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত কঠোর পরিশ্রম করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গভীর জলে প্রতিবার ডুব দিয়া দিয়া কৃষকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাট কাটিয়া থাকে; অনেক চাষী মেঘনার উত্তাল জলরাশি অতিক্রম করিয়া জনমানবহীন নির্জ্জন চরে জমির কাজ করিতে যায়। ঝড় দুর্য্যোগ তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। চারিদিকে জলরাশি, অফুরন্ত জলকল্লোল, তাহ'র মধ্যে একটি উচ্চ ডাঙার উপর একটিমাত্র কৃষক পরিবার। কৃষকবধূ শিশুকে কোলে করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দূর হইতে দেখে পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়া ডিঙা মসমসিয়া চালাইতে-চালাইতে দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া কৃষক ঘরে ফিরিতেছে। তবু এই পাটের জন্য কৃষকের যত দুর্গতি! পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দেওয়া কঠিন সমস্যা বটে; কিন্তু কৃষি রক্ষার জন্য এই সমস্যার সমাধান অনতিবিলম্বে হওয়া উচিত।

রাষ্ট্র শুধু যে জমিদারের খাজনার হার বা মহাজনের সুদ নিরূপণ করিয়া দিবে তাহা নহে, যাহাতে কৃষকের জীবন-যাত্রা স্বচ্ছন্দ হয় তাহার জন্য জমিদারের যাবতীয় অন্যায্য দাবী এবং গভর্ণমেণ্টের করভারও লাঘব করিতে হইবে। কৃষককে ঋণ গ্রহণের সুবিধা দিতে হইবে এবং যাহাতে ফসলের দাম বাড়ে তাহার জন্য যৌথ পণ্য-বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়া বা ফসলের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দিয়া কৃষি ও কৃষকের রক্ষা করিতে হইবে। ইহার পর চিকিৎসা ও কার্য্যকারী শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, যেন সাধারণ কৃষক পরিশ্রম নিয়োগে আপনাব পরিবার স্বচ্ছন্দে পরিপালন করিতে পারে। যেখানে জমি অত্যন্ত টুকরা-টুকরা ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে সেখানে নানারূপ কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াও কৃষকের আয় বাড়াইতে হইবে। চিনি, তেল, চামড়া, পাট, দড়ি, খেলনা প্রভৃতির কল-কারখানা গ্রামে বসাইয়া, যাহাতে ক্ষুদ্রতম জমির মালিক ও প্রজা ও কৃষাণেরা অন্য উপায়ে গ্রামেই উপার্জ্জনক্ষম হয় এবং নিজ নিজ সুবিধা ও বিভিন্ন ঋতু অনুসারে কৃষি ও শিল্পের কাজ বাছিয়া লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা চাই। কৃষিজাত মালমশলা যদি গ্রামেই কারখানায় ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ইহাতে যদি চিনি, সাবান, তেল, জুতা, দড়ি, বস্তা প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্য তৈয়ারী হয় তাহা হইলে যেমন কৃষক অধিক মূল্যের ফসল উৎপাদন করিয়া এখনকার ব্যবসামান্দ্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তেমনই অতিরিক্ত কৃষাণ-শ্রেণী মাঠে ভিড় না করিয়া কারখানায় কাজ করিবে। সব দিক হইতে ইহাতে গ্রামের শিক্ষা-সংস্কার, কার্য্য-কৌশল ও জীবন যাত্রার উন্নতি হইবে।

কৃষাণ ও শ্রমজীবি-সমস্যা

ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প ব্যবসার এমন প্রসার হয় নাই যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান, নিরাশ্রয় দিনমজুর শ্রেণীর আহার বরাবর জোগাইতে পারে। মাঠ হইতে চা-বাগান, চা-বাগান হইতে নগরের কারখানা, কারখানা হইতে কয়লার খনিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহারা সহরে আসিয়া বস্তিতে বস্তিতে মাছির ঝাঁকের মত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বস্তিতে মৃত্যুর হার ভয়াবহ; ঘন বসতি ও পঙ্কিলতার জন্য কোথাও যক্ষ্মা, কোথাও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কোথাও বা কলেরা বসন্তের প্রাতুর্ভাব, ধূমাবতী কুলা করিয়া সমস্ত দৈহিক ও সামাজিক ব্যাধি এখানে ছাড়িয়া দিয়াছেন;—মার, মড়ক, মাতলামী,—তিনটি মারক মিলিয়া পুরুষকে পশু বানাইতেছে, স্ত্রীলোকের ইজ্জত ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে।

সহরে শ্রমজীবিগণের কম মজুরী, অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ও মনুষ্যত্ব-হানি নূতন ভারতের একটি বিষম সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার আর একটা দিক যে গ্রামে-গ্রামে প্রজার উচ্ছেদ, কৃষাণের নিরাশ্রয় অবস্থা ও দিনমজুর শ্রেণীর হঠাৎ বৃদ্ধি,—একথা ভুলিলে চলিবে না। শ্রমজীবীরা জোট বাঁধিতে পারে, শ্রমজীবীদের আন্দোলন শীঘ্রই মুখর হইয়া উঠে; কিন্তু গ্রামের কৃষাণ ও মজুর নীরবে সকল দৈন্য অভাব উৎপীড়ন সহ্য করে, নির্ব্বিবাদে তুর্ভিক্ষের সময় মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়। দেশ তাহার খোঁজই রাখে না, পায়ও না।

তবুও গ্রামে পূর্ব্বেকার সে জড়ভাব নিরুদ্বেগ অবসাদ ও নীরব সহিষ্ণুতা আর নাই। বাজার লুট, কৃষাণের জোট-বাঁধা, ও ঘর্ম্মঘট

আজকাল গ্রামেও দেখা গিয়াছে। বাংলায়, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ-আন্দোলনের সূত্রপাত দেখা গিয়াছে। মাঠের দিনমজুর জোট বাঁধিতেছে, স্থানে-স্থানে রায়তরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জমিদারের উৎপীড়নের বাধা দিতে অগ্রসর। প্রজা অন্যান্য আবওয়াব, সেলামী বা খাজনার দাবী অগ্রাহ্য করিতেছে। বাংলা বিহারে আব্ওয়াব আদায় আগেকার মত সহজ নহে। ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে জঙ্গল ও জল সরবরাহের স্বত্ব লইয়া প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। কোথাও বা প্রজা বেগার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। গ্রাম-পঞ্চায়েতে বসিয়া প্রজা-জমিদারের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে কেহ আর ভয় পায় না।

এইরূপে ক্ষেতের বিরোধ রাষ্ট্রের ইন্ধন জোগাইতেছে। এখনও পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পরিস্ফুট হয় নাই, ভয় ও অনিশ্চয়ের ধোঁয়ায় চারিদিক আবৃত।

পরিবর্ত্তন আসিতে বেশী দেরী নাই। কৃষির উৎপাদন কম—এদিকে লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশে লক্ষ্মীর কৃপা কম—এ দিকে মা ষষ্ঠীর কৃপা অত্যধিক। যতই কৃষিলভ্য অর্থ শ্রম অনুসারে বিভক্ত না হইয়া বিলাসী জমিদার অথবা অলস খাজনা-আদায়ী মধ্যবর্ত্তী ও উচ্চশ্রেণীর কৃষকের হাতে যাইতেছে ততই আসল চাষীর অবস্থা মন্দ হইতেছে। অবাধ লেন-দেনের ফলে জমি মধ্যবিত্ত ও মহাজন শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িতেছে। পুরাতন গ্রাম্য সমাজের জমি ও অর্থ বিভাগের সে সাম্য ও সৌসামঞ্জস্য নাই, তাই রাষ্ট্র-বিন্যাসের পবিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

সহুরে রাষ্ট্রনীতি

এদিকে রাষ্ট্র জিনিষটাকে আমরা এত দিন সহুরে, সৌখীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাই ক্ষেতের বিরোধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। অপরদিকে যে-পরিমাণে রাষ্ট্রের আন্দোলন ও আদর্শ ক্ষেতের বিরোধকে আশ্রয় করে নাই, সেই পরিমাণে তাহারা কৃত্রিম ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একচেটিয়া করিয়াছে। জনসাধারণের উদ্বেগে তাহারা উত্তপ্ত, জীবন্ত হইতে পায় নাই।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জিনিষটা সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির বিরোধের একটি প্রকাশ মাত্র। আসল সনাতন জিনিষ হইতেছে মাঠের দ্বন্দ্ব। যদি রাষ্ট্র কখনও আমাদের হয় তবে সৈন্য-বিভাগের অপব্যয়, অথবা মুষ্টিমেয় চাকুরী-সংস্থান লইয়া আমরা গণ্ডগোল না করিয়া ক্ষেতের দ্বন্দ্ব মিটাইতে চেষ্টা করিব। নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় দল তখন জমির স্বত্ব ও স্বামিত্ব লইয়া ভিন্ন-ভিন্ন প্রোগ্রাম দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। তখনি জানিব আমাদের রাষ্ট্র সমাজের আসল শক্তি ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ। ইহা হইতে বেশী দেরী নাই।

কৃষকের স্বরাজ

অপর দিকে এই জিনিষটাকে দেশকে আজ না হয় কয়েক বৎসর পরে বুঝিতে হইবেই যে ক্ষেতে অনৈক্য থাকিলে আসল স্বরাজ পাইবার আশা নাই। প্রজা জাগ্রত হইলে সব দিকে সমান অধিকার চাহে! পার্লামেণ্ট বা মজলিসে কয়েকটি পদ পাইবে অথচ ক্ষেতের লভ্য হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা একবারে অসম্ভব।

প্রজাশক্তি এখন জগতে এক ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছে। তাহার জন্ম মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের দাসের ঘরে। তাহার বেশ দিন-মজুরের মত। হাতে তাহার মুষল, বক্ষে তাহার যুগপরম্পরার্জ্জিত বিষম হিংসানল। মহাযুদ্ধের ভস্মাবশেষের তিলক পরিয়া সে প্রচণ্ড দর্পে রাজার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছে, জমিদারকে নিধন করিয়াছে, ইতালী হইতে সাইবেরিয়া, রুমানিয়া হইতে দেনমার্ক পর্য্যন্ত তাহার লেলিহান সর্ব্বগ্রাসী রসনা ধূমকেতুর করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

ভারত চিরকাল আর এক প্রজাশক্তির রূপ কল্পনা করিয়াছে। সে-রূপ কমনীয় মূর্ত্তি হলধরের। বিশাল বপু তাহার শান্তি ও ধৈর্য্যের আশ্রয়। হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রীর, ধ্বংসের পরিবর্ত্তে উৎপাদনের আনন্দ তাহার। যিনি হলধর তিনি ভূ-রাজ। হলধরের রাজ্যে অশান্তি নাই, অধর্ম্ম নাই। সেখানে অন্যের শ্রমের ফল আর একজন ভোগ করে না। দেবতা যেখানে হল ধরিয়াছেন, প্রকৃতি সেখানে উর্ব্বরা, মানুষ সেখানে স্বাধীন। হলধরের রাজ্যই আমাদের আসল স্বরাজ।

দশম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার সীমানা

রাষ্ট্রিক সীমানা ও সাহিত্য

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের আসল স্থায়ী পত্তন হয় পালরাজগণ যখন পঞ্চগৌড়েশ্বর হইলেন। উহাদিগের বিকাশ ঘটে একাদশ শতাব্দীতে যখন রাঢ় প্রদেশের সেন রাজগণ সমস্ত বাঙ্গলাকে একচ্ছত্রাধীন করেন। রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিরাট অভ্যুত্থান ও সাহিত্যের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। "পঞ্চগৌড়েশ্বর"দিগের আমলে বাঙ্গালী-সমাজ পরিপূর্ণ অবয়ব পাইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সাধনা ও সংস্কৃতির আশ্চর্য্য উন্নতি ও প্রসারের কারণও বাঙ্গলার বিপুল পরিসর।

বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী মিশ্র জাতি। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গলার প্রাচীন নাম নহে। যে-অঞ্চলে যাহারা বাস করিত তাহারা মিশ্রিত হইয়া, বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হইয়া শেষে, বঙ্কিমের ভাষায়, "একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গলায় পরিণত হইল"। এই সহজ সংস্কৃতির বিস্তারের ফলে বাঙ্গলা-প্রদেশ 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল

নিনাদ করাল,' একই ভাষাভাষী হইয়াছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার তাহা হয় নাই। সেখানে বহু জাতির সঙ্গে বহু ভাষা ও কৃষ্টি ঐক্য ও সংহতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। ইংরাজ যখন দেশ জয় করে তখন বাঙ্গলার রাষ্ট্রিক সীমানা বাঙ্গলার ভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করিয়াছিন।

মুঘল আমলে, কি আরও পূর্ব্বে, 'দ্বাদশ বাঙ্গলা' যে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ব্যাহত বা বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল ইংরাজের আমলে তাহা বরং সংহত হইয়া আধুনিক সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলেই বাঙ্গলা সাহিত্যের অপ্রত্যাশিত বিকাশ ও গৌরব প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণের পশ্চাতে রহিয়াছে সপ্ত কোটি বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর ঐক্যবোধ। বাঙ্গলার সংবাদপত্র 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' যে আজ অন্ততঃ এক লক্ষ বাঙ্গালী প্রত্যহ পাঠ করে তাহা এক ভাষাভাষী বাঙ্গলার যুগপরম্পরালব্ধ সংহতি সাধনার ফল, বর্ত্তমান কালের মুদ্রণযন্ত্রের সহজ দান নহে।

আসামে বাঙ্গালী-প্রাধান্য

কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য-শক্তির সহিত বাঙ্গালীর সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গলার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়াছে ও বাঙ্গালীর বাসভূমি বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার অনেক বাঙ্গলা ভাষাভাষী পরমুখাপেক্ষী ও 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া পড়িয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাঙ্গলাদেশ

কমলা-উদ্যানবেষ্টিত সুদূর আসাম ও মধুক-সুরতি ছোটনাগপুর উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত,—

'বাম হাতে যা'র কমলার ফুল,
ডাহিনে মধুপমালা,
ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট
কিরণে ভুবন আলা
সাগর যাহার বন্দনা রচে
শত তরঙ্গভঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই
তীর্থ বরদ বঙ্গে'

কবির বিবরণ যে কত ঠিক তাহা বর্ত্তমান আসাম, ছোটনাগপুর ও বিহার প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদিগের অনুপাত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। সমগ্র আসাম-প্রদেশে অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১,৯৯৫,০০০ লোক, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী,—৩,৯৯৬,০০০। ১৯২১-১৯৩১ সালের মধ্যে বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে আসামে—৪৪০,০০০,—শতকরা ১২·৫, অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে—২৬৯,০০০,—শতকরা ১৫·৬। আসামকে আলাদা রাষ্ট্রিক প্রদেশ করা হয় হউক, কিন্তু অন্ততঃ সুরমার সমতলভূমি,—যেখানে বাঙ্গালীর শুধু প্রাধান্য নহে, বাঙ্গলার সংস্কৃতির একাধিপত্য,—তাহা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। নচেৎ বাঙ্গালীর প্রতি, বাঙ্গলার সংস্কৃতির প্রতি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যরীতিতে ঘোর অবিচার হইতে থাকিবে।

সুরমা-ভূমি	মোট লোক-সংখ্যা	বাঙ্গলা-ভাষাভাষী	অসমীয়া-ভাষাভাষী
কাছাড়	৫৭০,৫৩১	৩৩৮,৭৭২	২,২১৫
শ্রীহট্ট	২,৭২৪,৩৪২	২,৫০৯,৬৮২	১,৪৭৭

ধরা যাইতে পারে অসমীয়া-ভাষা কেবল আসাম সমতলভূমিতেই কথিত হয়। কিন্তু এখানেও বাঙ্গলা ভাষা কম চলিত নহে।

আসাম সমতলভূমি	মোটি লোক-সংখ্যা	বাঙ্গলা ভাষাভাষী	অসমীয়া ভাষাভাষী
গোয়ালপাড়া	৮৮২,৭৪৮	৪৭৬,৪৩৩	১৬১,১৭৯
কামরূপ	৯৬৭,৭৪৬	১৭০,৪০৯	৬৪৯,৫১২
দারং	৫৮৪,৮১৭	৯৫,১১৫	১৯৩,০৮৯
নওগাঁ	৫৬২,৫৮১	১৯৩,৫৬৯	২৩৭,৪০৬
শিবসাগর	৯৩৩,৩২৬	৭৩,৩৫১	৫০৩,৬০৩
লখিমপুর	৭২৪,৫৮২	৭৭,৪৭১	২২৮,৪৬১

উপরোক্ত অঞ্চলে ১৯২১-১৯৩১ সালের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮৫২,০০০ হইতে ১,০৮৬,০০০ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বিশেষতঃ কামরূপ ও নওগাঁ জিলায় বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত সুরমা অঞ্চল ও গোয়ালপাড়া জিলার যে-অংশ বাঙ্গালীপ্রধান, তাহা বাঙ্গলাকে ফিরাইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সুরমা সমতলভূমির শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ের সমতল অংশ বাংলার সীমানার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ভাষা ও সমাজধর্ম্ম হিসাবে এই অঞ্চল একেবারে বাংলার অনুরূপ। গোয়ালপাড়া জেলার অন্ততঃ যে-কয়টী থানায় বাংলা ভাষা অধিক পরিমাণে কথিত হয়

বাংলাকে সেইগুলি ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ;—যেমন বিলাসীপাড়া, কোকরাজহর এবং লখিপুর। গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বদিকে কামরূপ জেলার চর ও নদীতটে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উপনিবেশ খুব অগ্রসর হইয়াছে। বারপেটা সবডিভিসনে লোকসংখ্যা ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে—শতকরা ৬৯। ময়মনসিংহ হইতে কৃষকেরা তাহাদিগের পরিবারবর্গকে লইয়াই আসামের জঙ্গলের অকর্ষিত ভূমিতে চাষ আরম্ভ করিতেছে।

বারপেটা সবডিভিসনে বাংলা ভাষারই প্রাধান্য। ইহাও বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নওগাঁ জেলায় অন্ততঃ এই কয়টী মৌজায় বাংলাভাষা-ভাষীর প্রাধান্য ;—খাতোয়াল, জুরিয়া, লাওখোয়া, ধিং, বোকোনি এবং লাহোরীঘাট। সেইরূপ দারং জেলায় বাঙ্গালী কৃষকের প্রাধান্য মঙ্গলডাই সবডিভিসনে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে যে বিস্তৃত অঞ্চল নিবিড় জঙ্গলে ভরা ছিল, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গ, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ, হইতে মুসলমান ও হিন্দু কৃষকগণ আসিয়া অসীম সাহস বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মাঠে সোনা ফলাইতেছে এবং বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও জনপদ সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা ঐ জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছে, আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে এবং শুধু ইহাই নয়, তাহাদিগের কৃষি-জ্ঞান ও কৃষিকর্ম্ম হইতে অসমীয়ারা অনেক শিখিতেছে। এখন যখন গোয়ালপাড়া ও নওগাঁর উৎকৃষ্ট অঞ্চলগুলি অধ্যুষিত হইয়াছে তখন অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা ক্রমশঃ কামরূপ, মঙ্গলডাই ও উত্তর লখিমপুরের দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ব্রহ্মপুত্রের চর ও অরণ্যাবৃত

সমতলভূমিতে বাঙ্গালী কৃষকের উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে একমাত্র চীন কৃষকের মাঞ্চুরিয়াতে উপনিবেশের তুলনা হইতে পারে। ১৯১১ সালে এই নীরব নির্ব্বিবাদ জঙ্গল-কাটা আরম্ভ হয়। ১৯২১ সালে কৃষক ঔপনিবেশিকের সংখ্যা ছিল—৩ লক্ষ। ১৯৩১ সালে তাহাদের তাহাদের সংখ্যা ছিল—অন্ততঃ ৫ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ বাসীর সংখ্যা—৩ লক্ষ ৩৮ হাজার। ২০ বৎসরে আসাম সমতল-ভূমিতে পুরাতন কৃষক ঔপনিবেশিকেরা খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

বিহারে বাঙ্গলা-ভাষাভাষী

কিন্তু বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার সংস্কৃতির প্রতি আরও অধিক অবিচার হইয়াছে। ১৯২২ সালে যখন নূতন বিহার-রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন তাহার সঙ্গে বাঙ্গলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত করায়, ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গলা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ছিল--মোট ১,৯৩৭,৫৮৭। এই সংখ্যাটি যে ভুল তাহার কারণ পরে দেখা যাইবে। আমি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা অন্ততঃ ২,৫২০,০০০ ধরিব। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের যে-অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর প্রাধান্য, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

	মোট লোকসংখ্যা	বাঙ্গলা ভাষাভাষী	হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দূ) ভাষাভাষী
মালভূম	১,৮১০,৮৯০	১,২২২,৬৮৯	৩২১,৬৯০
সিংভূম	৯২৯,৮০২	১৪৭,৫১৭	৮১,০৪৭

	মোট লোকসংখ্যা	বাঙ্গালা ভাষাভাষী	হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দ্দু) ভাষাভাষী
সাঁওতাল পরগণা	২,০৫১,৪৭২	২৫২,২০৩	৯৪২,৭৭৭
পুর্ণিয়া	২,১৮৬,৫৪৩	৭২৮,৮৫০	....
		(সংশোধিত)	

পুর্ণিয়া জেলায় গ্রিয়ার্সন সাহেব নিরূপণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গলা ভাষাভাষীদিগের সংখ্যা ছিল ৬০৩,০০০,—মোট লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। তাঁহার ভাষাসমীক্ষণে কিষেণ-গঞ্জিয়া বা শিরিপুরিয়া উপভাষা উত্তর-বঙ্গের উপভাষার রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ১৯২১ সালের সেন্সাসে ঐ জেলার এক অর্ব্বাচীন হাকিম নির্দ্দেশ করিলেন, ঐ উপভাষা হিন্দীরই রূপান্তর। সঙ্গে-সঙ্গে ৬০০,০০০রও অধিক লোক অ-বাঙ্গালীরূপে পরিগণিত হইল। গ্রিয়ার্সনের বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ অনুসারে, যে কিষেণ-গঞ্জিয়া উপভাষা ১৯১৯ সেন্সস পর্য্যন্ত উত্তর-বাঙ্গলার অপভাষা বলিয়া গণ্য হইত, তাহা অন্ততঃ ঐ জিলার এক-তৃতীয়াংশ লোক ব্যবহার করে। পুর্ণিয়া জেলার বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় তাহা হইলে, ৭২৮, ৮৫০;—১০৭২৯৯ নহে। বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল ২,২৯৪,৯৪৪;—তাহা বাড়িয়া তাহা হইলে এখন হইয়াছে অন্ততঃ ২,৫২০ ০০০। ইহা ছাড়া ২৭০,৭৪৬ লোক বাঙ্গলাকে ব্যবহার করিতেছে দ্বিতীয় পোষাকী ভাষারূপে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্য জিলাতেও বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা কম নহে ঃ—

মুঙ্গের	...	৩,৩২০
ভাগলপুর	...	৪,৫৩৮
পাটনা	...	৬,৯৩৮
রাচী	...	১৪,১৭১
হাজারীবাগ	...	১১,২৭১
বালাসোর	...	১৬,৯৪৯
কটক	...	১৩,৮৮০
পুরী	...	৩,৭৪৯
উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য	...	৪০,৪২৬
ছোটনাগপুরের দেশীয় রাজ্য	...	৪৫,৩৬৪

সিংভূম সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডা-দ্রাবিড় জাতিরা তাহাদিগের ভাষা রক্ষা করিলেও বাঙ্গলা শিখিতেছে এবং এবং নানাদিক্ হইতে বাঙ্গলার সংস্কৃতির আয়ত্তে আসিতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। সাঁওতাল পরগণার ডুমকা সাব-ডিভিসনে ১৪,৮৬৪ সাঁওতালেরা পোষাকী ভাষারূপে বাঙ্গলাভাষা অর্জ্জন করিয়াছে এবং মাত্র ১,৮৯৮জন হিন্দুস্থানী কহিতে পারে। ঐ জিলায় বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ভাষার যে পাল্লা চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষাই জয়লাভ করিতেছে।

শুধু ডুমকা সবডিভিসনে নয়, পাকুড় সবডিভিসনে ৬৮,৭৯২ লোক বাংলা-ভাষাভাষী এবং ৪৪,৪৫৫ হিন্দুস্থানী ভাষী; জামতাড়া সবডিভিসনেও ৭৩,০৯১ লোক বাঙ্গলা-ভাষাভাষী এবং ৭০,৩৬২ হিন্দুস্থানী-ভাষী; রাজমহল সবডিভিসনে ৪২,৯৩৭ লোক বাংলা-ভাষাভাষী; গড্ডায় ৭,৬৯৬ লোক বাংলা-ভাষাভাষী; দেওঘরে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩,৬০৯। প্রতি থানায় ভাষা সমীক্ষণ করিয়া

বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা যেখানে অধিক এবং অনুচ্চজাতি ও অন্য অবাঙালীর মধ্যে যেখানে হিন্দুস্থানীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা ভাষা অধিকতর মনোনীত ও ব্যবহৃত হইতেছে সে-অঞ্চলগুলি বাংলা প্রদেশকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। ডুমকা, পাকুড় ও জামতাড়া এবংরাজমহল ও দেওঘরের কিছু অংশ বাংলার মধ্যে পড়িবে।

মানভূম জেলার সদর সবডিভিসনে বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ১,০৪৬,৬৫৩ এবং হিন্দুস্থানী-ভাষীর সংখ্যা মাত্র ৬২,২৬৯; ইহা বাংলার অন্তর্গত হওয়া উচিত। ধানবাদ সবডিভিসনে বাঙ্গলা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১৭৬,০৩৬, কিন্তু হিন্দুস্থানী-ভাষীর সংখ্যা ২৫৯,৪২১। ধানবাদ কয়লা-ক্ষেত্র, এখানে অধিকাংশ হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীদিগের মত স্থায়ী অধিবাসী নয়। শিল্পপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুস্থানীভাষী শ্রমজীবীর আধিক্য দেখা যাইলেও শ্রমজীবীরা যাযাবর। এই হিসাবে ধানবাদে বাঙ্গালীদিগের প্রথম উপনিবেশ, কয়লার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ী বসবাস বলিয়া উহা বাংলার নিজস্ব। কয়লা ও লাক্ষা ব্যবসায়ের উন্নতি ও অধোগতির সহিত বাঙ্গালীর সমৃদ্ধি এখানে নিবিড়ভাবে জড়িত।

সিংভূম-জেলার ধলভূম সবডিভিসনে বাঙ্গলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৪১, ১০৫। কিন্তু হিন্দুস্থানী-ভাষীর সংখ্যা মাত্র প্রায় ৫০,০০০; এই সবডিভিগন বাংলাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। সদর সবডিভিসনে বাঙ্গলা-ভষাভাষীর সংখ্যা ৬,৪১২।

ময়ুরভঞ্জ ও শেরাইকেলাতে বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা কম নয়। ময়ুরভঞ্জে ৩৩,২৪৩ এবং শেরাইকেলাতে ৪৩,১১৭। করদ রাজ্যে রাষ্ট্রিয় সীমানা পরিবর্ত্তনের কথা তুলা কঠিন। তবুও এখানেও ভাষা-সমীক্ষণ

আবশ্যক। তাহার পর বালেশ্বর। এখানে বাঙ্গলাভাষীর সংখ্যা ১৬, ৯৪৯। বাংলার সন্নিকটস্থ জলেশ্বর, বালিয়াপাল এবং বাস্তা থানাগুলিতে বাঙ্গলা-ভাষাভাষী অপেক্ষাকৃত অধিক হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় সীমানা ঠিক করিবার জন্য এ-অঞ্চলেও অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

এইবার আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে যে সকল অঞ্চল অবিলম্বে বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্ত্তনের জন্য ভাষাসমীক্ষণ প্রয়োজনীয় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল :—

মহাবঙ্গের অন্তর্গত

	আশু প্রত্যর্পণীয়	ভাষা সমীক্ষণের পর প্রত্যর্পণ যোগ্য
আসাম প্রদেশ	শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা ; গোয়ালপাড়া জেলার বিলাসীপাড়া, কোকরাজহর এবং লখিপুর থানা ; কামরূপ জেলার বারপেটা সবডিভিসন ; নওগাঁ জেলার খাতোয়াল, জুরিয়া, লাওখোয়া, ধিং, বোকোনি এবং লাহোরীঘাট ; দারং জেলার মঙ্গলদাই সবডিভিসন।	গোয়ালপাড়া জেলার গোয়ালপাড়া, ডুধ্‌নাই, উত্তর শালমারা এবং বিজনি থানা ; দারং জেলার তেজপুর ; লখিমপুর জেলার উত্তর লখিমপুর ও লালুক।

বিহার প্রদেশ	পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ ও সদর সর্বাডিভিসন ; সাঁওতাল পরগণার তুমকা, পাকুড় ও জামাতাড়া সবডিভিসন ; মানভূম জেলার সদর ও ধানবাদ সবডিভিসন , সিংভূম জেলার ধলভূম সবডিভিসন ।	পূর্ণিয়া জেলার আবেরিয়া সবডিভিসন । সাঁওতাল পরগণার রাজমহল দেওঘর ও গড্ডা সবডিভিসন ; শেরাইকেলা, কেওনজহর, খারসোঁয়া ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্য । সিংহভূম জেলার সদর সবডিভিসন ।
উড়িষ্যা প্রদেশ		বালেশ্বর জেলার সদর সবডিভিসনে জলেশ্বর, বালিয়াপাল,বাস্তা থানা ।

যে সকল অঞ্চলে ভাষা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য সেখানে একাজ অবিলম্বেই আরম্ভ করা উচিত। কারণ বিহার গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় এবং উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট দ্বারা ধলভূম সবডিভিসনের হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া ভাষা প্রচারের কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবহেলায় বাংলা ভাষা হটিয়া যাইতে বাধ্য।

ভাষা-অনুযায়ী রাষ্ট্রিক বিভাগ

দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশের লোকেরা ভাষা অনুসারে তিনটী নূতন রাষ্ট্রিক প্রদেশ চাহিয়াছে। কংগ্রেস ও মাদ্রাজ

ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা তাহাদিগের এই উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়াছেন। কংগ্রেস বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলির প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে মত দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, মহাত্মা গান্ধী নিজে ভাষা-অনুযায়ী প্রদেশ গড়িবার ও ভাঙ্গিবার ব্যবস্থাপত্র এখন তৈয়ার করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ও'ডোনেল কমিটিও বিহারের বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। একজন কংগ্রেস-সেবক বাঙ্গালী যদি বিহার ব্যবস্থাপক সভায় এই কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাহা এখন খুব সমীচীন হয়।

প্রাদেশিকতার ব্যভিচার

বিহার প্রদেশ হইতে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়ার এবং আসাম প্রদেশ হইতে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, কামরূপ ও দারং জেলার কিছু অংশ বাঙ্গলাকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব শুধু ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উঠে নাই। যেমন বিহারে তেমনই আসামে প্রাদেশিকেরা বাঙ্গালীকে শিক্ষার ব্যাপারে ও চাকুরীতে সমান অধিকার দেয় না। গণতান্ত্রিক যুগে আইন-সভাতেও সংখ্যানুপাতে বাঙ্গালীদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার নাই। আসাম প্রদেশে অসমীয়াদিগের সংখ্যা মোট ১,৯৯৫,০০০। বাঙ্গালীরা তাহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় দ্বিগুণ,—৩৯৬৬,০০০। অথচ অসমীয়ারা ঐ প্রদেশের রাষ্ট্রিক হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হইয়া বহু বৎসরের মৈমনসিংহীয়া ও অন্য বাঙ্গালীর বসতি ও উপনিবেশ স্থাপনের ধারা নিতান্ত

স্বেচ্ছচারের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। শিক্ষা, চাকুরী, সরকারী-ঠিকা প্রভৃতি বিষয়েও অসঙ্গত সাম্প্রদায়িকতা দেখাইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি এমন ব্যবহার গণতন্ত্রের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গমাত্র দাঁড়াইয়াছে।

প্রাদেশিক স্বাধীনতা ভারতের বিভিন্ন জাতির ঐক্যবোধের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিবে যদি প্রদেশে-প্রদেশে বিভিন্ন অধিবাসীদিগের মধ্যে কলহ বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। ভারতীয় মহাজাতি গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং ভারতের উদার সংস্কৃতি ব্যর্থমনোরথ হইবে যদি প্রদেশে-প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার চলিতে থাকে। বিহার প্রদেশে বাঙ্গলা-ভাষাভাষীদিগের নিকট হইতে বাসভূমির লিখিত ঘোষণা চাওয়া যেমন ভারতীয় জাতীয়তাকে অবজ্ঞা করা, তেমনই তাহা বাঙ্গালীকে তাহার সাধারণ রাষ্ট্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা। আর ঐ বিধি আরও অপমানজনক, কারণ মুসলমান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানকে সাধারণতঃ ঐ জন্মপরিচয়পত্র দিতে হয় না। বিহারের ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের পশ্চাতে বাঙ্গালীর অর্থ, উদ্যোগ ও প্রতিভা গত যুগের জাতীয়তা গঠনের সহায় হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাঙ্গালী ব্যবসায় গভর্ণমেণ্টের কাজের ঠিকা ও ব্যবসায়ের সাধারণ প্রসাদ পাইতেছে না এবং বালকবালিকারা বিহারের বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে অবাধে বাঙ্গলাভাষার মারফতে শিক্ষা পাইবার সুযোগ অথবা গুণানুসারে বৃত্তি লাভ ও উচ্চ শিক্ষার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহাতে ঐ জাতীয়তা অধুনা লাঞ্ছিত হইতেছে বিহার ও উড়িষ্যায় ২৫ লক্ষ ও আসামে ৪০ লক্ষ বাঙ্গালী যদি পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রসাদ-ভিখারী হইয়া ধীরে-ধীরে বাঙ্গলার কৃষ্টির সহিত তাহাদিগের প্রাণের যোগ হারায়, রাষ্ট্রিক অবিচারের ফলে

তাহারা যদি স্বাবলম্বনহীন, ভগ্নোদ্যম কাপুরুষে পরিণত হয়, তবে তাহাতে বাঙ্গলার সংস্কৃতিরও কলঙ্ক। ইহা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। যদি আমরা মাত্র লক্ষ্য করি নিম্নলিখিত জেলায় যাহাদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গলা তাহারা সংখ্যায় বহু এমন কি গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে তবে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা যে বাঙ্গালী জাতির উপর কতদূর অন্যায় অত্যাচার করিতেছে তাহা স্পষ্ট হয়।

		মোট লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যার অনুপাতে, শতকরা
আসাম—		
	শ্রীহট্ট	৯৫
	কাছাড়	৬০
	গোয়ালপাড়া	৫৪
বিহার—		
	মানভূম	৬৭
	সিংভূম	১৬
	সাঁওতাল পরগণা	১২
	পূর্ণিয়া	৩৩

বাঙ্গলা-বিভাগ ও বাঙালীর দারিদ্র্য

কিন্তু বাঙ্গলার এই সকল অংশগুলি ফিরিয়া পাওয়ার দাবী শুধু সংস্কৃতির বা রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের দাবী নহে, বাঙ্গালীর দারিদ্র্য ও

অধোগতি নিবারণেরও দাবী। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলা সর্ব্বাপেক্ষা লোকবহুল এবং জন-প্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা কম ('৪৭ একর)। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা হইতেছে—'৬৩ একর; যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের সংখ্যা—'৭৪ একর। বাঙ্গলায় লোক-বাহুল্যের জন্য অনটন ও অর্দ্ধাশন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দারিদ্র্য ও অনশন নিবারণকল্পে আসামের বনজঙ্গলে ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদন-উপযোগী বাঙ্গালীর কৃষিবিস্তার প্রয়োজনীয়। অন্য-দিকে শিল্প প্রসার আরও অধিক প্রয়োজনীয়। গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালায় শিল্প প্রসার দূরে থাক মোট শিল্প-ব্যবসায়ীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী কমিয়াছে (শতকরা ১৪'২); যদি সমগ্র জনসংখ্যা হিসাবে শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত ধরা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলা-দেশে এই হার শতকরা ৩৫'৮ কমিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে কমিয়াছে শতকরা ২১'৮। বাঙ্গালী-প্রধান মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ও আসাম নানাবিধ আরণ্য ও খনিজ মালমসলায় পরিপূর্ণ। মানভূমে আছে কয়লা, লোহা, গ্রাফাইট, সিঁদুর ও গেরীমাটী; সিংভূমে আছে ম্যাঙ্গানীজ, লোহা, সোনা ও কাইনাইট এবং সাঁওতাল পরগণায় আছে কয়লা, লোহা, তামা ও সীসা। বাঙ্গালী ধুরন্ধরগণ যে এই অঞ্চলে শিল্প ও ব্যবসার সুযোগ ছাড়েন নাই, বাঙ্গালী পরিচালিত কয়লা, লোহা, অভ্র প্রভৃতির খনি বা কারখানার সংখ্যা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে ক্রমাগতই কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়িয়াই চলিয়াছে আর্থিক ক্ষেত্রে এই অসমতার সংশোধন না করিতে পারিলে বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি ও দারিদ্র্য মোচন অসম্ভব। খনিবহুল সিংভূম, মানভূম

ও সাঁওতাল পরগণা ফেরত না পাইলে বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্পকার্য্যের যথা-সম্ভব সমতা ও আদান-প্রদান প্রবর্ত্তন অসম্ভব। তাই বাঙ্গলা-ভাষাভাষী এইসব অঞ্চল ফেরত পাইবার দাবী অনশনক্লিষ্ট বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অলঙ্ঘনীয় দাবী। বিহারের পক্ষে মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণা-ভুক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, বাঙ্গলার পক্ষে অনশন ও ক্ষয় নিবারণের জন্য। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান এই আর্থিক তত্ত্বটুকু সম্বন্ধে নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখাইতেছে।

অর্থনৈতিক অবিচার

আর একদিক হইতে বাঙ্গলার রাষ্ট্রিক সীমানা পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গলায় সব প্রদেশ অপেক্ষা বেশী মোট রাজস্ব ৩৮ কোটী টাকা আদায় সত্ত্বেও ২৬ কোটী দিল্লীতে দিয়া ৫ কোটী লোকের জন্য নিজস্ব রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে মাত্র ১২ কোটী টাকা; কিন্তু বোম্বাইএ ১ কোটী ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১৫ কোটী টাকা, এবং পাঞ্জাবের ২ কোটী লোকের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১ কোটী টাকা। ইহার ফলে জন-প্রতি রাজস্বের ব্যয়ের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলায় কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক কম হইয়াছে। অন্য প্রদেশের সহিত তুলনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় অনেক কম অর্থ ব্যয়িত হয়। অথচ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করভারাক্রান্ত। বাঙ্গালী কর দেয় জন প্রতি ৭॥০। যুক্তপ্রদেশের করের পরিমাণ ৩॥০, মাদ্রাজে

৫॥৶০, এবং বিহারে ও উড়িষ্যায় ১৸০। বাঙলার কর প্রদানের ক্ষমতা বোম্বায়ের অপেক্ষা কম; অথচ বহির্ব্বাণিজ্যের শুল্ক, পাটরপ্তানির শুল্ক, ইনকম ট্যাক্স এবং লবণ-শুল্ক মিলিয়া বাঙ্গলা বোম্বায়ের দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কর দেয়। জমির স্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে যে বাঙ্গালীকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক। কারণ দেড়শত বৎসরের পুরাতন অনুষ্ঠান এইটি এবং ইহারই প্রসূত অর্থে ইংরাজের মাদ্রাজ, উত্তর ও মধ্যভারত বিজয় সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯১০ সালে বাঙ্গলা প্রদেশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বোম্বাই মাদ্রাজ ও যুক্ত-প্রদেশের দ্বিগুণ অর্থ চাঁদাস্বরূপ প্রদান করিত। বাঙ্গলা দেশের মত আর কোন প্রদেশের প্রাদেশিক বাজেটে এতবার ঘাট্‌তি দেখা যায় নাই। এই বৎসর বাড়তির বৎসর। কিন্তু আগামী বৎসরে খুব সম্ভব আবার ঘাট্‌তি হইবে। এক রকম বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলা দেশের রাজকোষে অনটন ঘটিয়াছে দ্বাদশবর্ষব্যাপী। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও বিশেষতঃ বোম্বাই অনেক দিকে বাঙ্গালা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিকে বাঙ্গলা তাই তাল রাখিতে পারে নাই।

রাজকোষে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনটন দূর করিবার সহজ ও প্রধান উপায় খনিজ মাল মসলায় সমৃদ্ধ বিহার ও আসামের বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গলা প্রদেশে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা। বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবিচার যাহা বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলা ভাষাভাষীর প্রতি নিতান্ত অবিচার, তাহাই আবার সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির বিষম অন্তরায় হইয়াছে।

এই দ্বিবিধ অন্যায়ের আশু প্রতিকার চাই। বাঙ্গলার তিন ভাগের দুই ভাগ আজ ম্যালেরিয়া-পীড়িত, ক্ষয়িষ্ণু। ৮৬,০০০ গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ ৬০,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত। মারীভয়, কৃষির অবনতি, জঙ্গল বৃদ্ধি ও ভিটা ত্যাগ দেখা দিয়াছে বাঙলায় অন্ততঃ ৩০,০০০ বর্গ মাইল ধরিয়া। স্বাস্থ্যপ্রদ ও বিরল বসতি বিহারের বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি ফেরত না পাইলে ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা এক প্রকার অসম্ভব। বাঙ্গলার তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগে যেভাবে জলা, জঙ্গল ও মশককুল বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সহজে অনুমান হয় জাতিক্ষয় অবশ্যম্ভাবী যদি বাঙ্গালীকে অস্বাস্থ্যকর, জঙ্গলাবৃত ঘনবসতি অঞ্চলসমূহেই চিরকাল বাস করিতে হয়।

রাষ্ট্রিক অবিচার

ইউরোপে গত যুদ্ধের পর কতকগুলি নূতন রাজ্য সংগঠনের জন্য, সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অবিচার নিবারণের জন্য জাতিসঙ্ঘ নূতন শান্তি ও অধিকার-পত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে সংখ্যালঘু জাতিরা প্রত্যেক রাষ্ট্রে সর্ব্বপ্রকারে সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। তবুও চেকোশ্লোভাকিয়াতে সংখ্যালঘু জার্ম্মাণ জাতির আস্ফালন এখন কম হইতেছে না।

যে-সব অঞ্চল বাঙ্গালী-প্রধান নহে, অথচ যেখানে বাঙ্গালীদিগের বসবাস নিতান্ত অল্পও নহে, বিহার ও আসাম প্রদেশের সেইসব জিলায় বাঙ্গালীদিগকে বিহারী ও অসমীয়াদিগের মত সবক্ষেত্রে সহজ ও সমান অধিকার দিতে হইবে। নতুবা ঐ জিলাগুলিকে বিহার ও

আসামপ্রদেশ হইতে ফিরাইয়া দিবার জন্য বাঙ্গালীর দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ছোটনাগপুরে বাঙ্গালী-সংস্কৃতি

এইবার ছোটনাগপুরের কথা তুলা যাউক। জাতি ও ইতিহাসের দিক দিয়া বিহার হইতে ছোটনাগপুরের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিহার গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছেন ১৯৩২ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল ছোটনাগপুরে ১৬ লক্ষ টাকা এবং সাঁওতাল পরগণায় ৫½ লক্ষ টাকা। দুই অঞ্চলে সম্মিলিত ঘাটতি হইয়াছিল ১৯৩২ সালে ২১½ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮ সালে ২৮ লক্ষ টাকার। কিন্তু ইতিহাসের দাবী অর্থনীতির অপেক্ষা কম নহে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিহার হইতে উড়িষ্যার বিচ্ছেদ।

একটু ব্যাপকভাবে অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে বাঙ্গলার সংস্কৃতি দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার চিত্রোৎপলা নদী ও পূর্ব্বে কর্ণফুলী নদী, এমন কি সুদূর আরাকান পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত তমলুকের বাঙ্গালী বিখ্যাত গঙ্গাবংশ উড়িষ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন বাঙ্গলা ভাষার সহিত উৎকল ভাষার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বরের শিলালেখ প্রাচীন বাঙ্গলায় লিখিত এবং নৃসিংহদেবের অনুশাসনগুলিও আধুনিক বাঙ্গালায় বিরচিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর হইতে উৎকল লিপিতে প্রাদেশিকতার

জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে নূতন উৎকল ভাষার উদ্ভব হইল। সেইরূপ আসামে বৈগ্যদেব ও বল্লভদেবের অনুশাসনে (১১৮৮) ও অন্য শিলালেখেও বাঙ্গলা লিপি ব্যবহৃত। অসমীয় শঙ্করদেবের বাঙ্গলা ভাষায় রচিত মহাভারত সে দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে সাদরে পঠিত হইত। পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যেই মিশনারীগণের প্রভাবে পৃথক অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি। উহার পূর্ব্বে আসাম ও আরাকানের রাজসভায় ও বিগ্যালয়সমূহে বাঙ্গলা ভাষাই সুভাষা বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ছোটনাগপুর অথবা প্রাচীন ঝাড়খণ্ড অরণ্যাবৃত ছিল বলিয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতি দ্বারা তত প্রভাবান্বিত হয় নাই। তবুও ষোড়শ শতাব্দী হইতে যখন চৈতন্যদেব পদব্রজে ঐ অরণ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন হইতে ছোটনাগপুরে বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম আদিম আরণ্যক ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়া আসিতেছে। তাহার এক শতাব্দী পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ঝাড়খণ্ড অতিক্রম করিয়া বনবিষ্ণুপুরের দিকে রওনা হইয়াছিলেন। অন্ততঃ তিন শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও কৃষ্টি পঞ্চকোট ও ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহার ফলে কত আদিম বুনো জাতি নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার ও অনার্য্য ধর্ম্ম ও পূজা ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীতে গৃহীত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাঁওতাল, ওরাঁও ও মুণ্ডারা তাহাদিগের আদিম ভাষা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙালীর সংস্কৃতি আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুসমাজবিন্যাসে পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের ভূঁইয়া, ঘাটওয়াল, ভুমিজ, খয়ড়া, করা, ডোম, মুসাহার ও বাউড়ী প্রভৃতি জাতি কি উপায়ে

বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল তাহার কৃষ্টি-সংযোগ ও আর্য্যকরণের মূক ইতিহাস বাঙালীর গৌরবের সামগ্রী।

আরণ্যক জাতির সংস্কার ও আর্য্যীকরণ

সাঁওতাল, খাড়োয়া প্রভৃতি জাতিরা গ্রামে-গ্রামে বাঙ্গালীর অনুকরণে কালীপূজা করে! সাঁওতাল পরগণা, পঞ্চকোট ও ছোট-নাগপুরে অনেক আদিম জাতি বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা উৎসবেও যোগ দেয়। দলে-দলে লাঠি খেলিয়া ও বিসর্জ্জনের সময় নাচ দেখাইয়া তাহারা সহর্ষে মুড়ি-মুড়কীর প্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরে। চাইবাসা ও অন্য অঞ্চলের হো-জাতি গলায় কণ্ঠী ধারণ ও নিরামিষ আহার করে এবং আপনাদিগকে বৈষ্ণব-মতানুযায়ী বলিয়া গৌরব অনুভব করে। সেইরূপ বীরভূম জিলার গ্রামে গ্রামে যেমন সংকীর্ত্তন চলে। মানভূমের সীমানায় পঞ্চ পরগণায় মুণ্ডা ও ওরাঁও জাতিরা বহু বৎসর হইতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান নিজ ভাষায় রচনা করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছে, ছোটনাগপুরের অভ্যন্তরে রাঁচি ও পালামৌ জিলায় যে তানাভকত আন্দোলন ওরাঁও ও মুণ্ডাদিগের মধ্যে একটা সামাজিক সংস্কার ও উন্নতির বন্যা আনিয়া দিয়াছিল তাহার মূলেও বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ভক্তিভাবের আধিপত্য। বাঙ্গলার কৃষ্টির প্রভাবে আরণ্য ও পার্ব্বত্য জাতির আমূল পরিবর্ত্তনের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক বাঙ্গলার সংস্কৃতির সংযোগ ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডাদ্রাবিড় জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান কারণ হইয়াছে। শুধু বাঙ্গলার বাহিরে নহে, ভিতরেও। বহু বৎসর যাবৎ পশ্চিম উপত্যকা

ও অরণ্য হইতে দলে-দলে আসিয়া মুণ্ডাদ্রাবিড় জাতিরা বাঙ্গলার সমতল ভূমিতে কৃষিকায্য করিতেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আদিম জীবন-যাত্রা ও আরণ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। নিম্নের তালিকায় বাঙ্গলা অভিমুখে এই আদিম জাতির উপনিবেশ-স্রোতের পরিমাণ দেখান হইল,—

	সাঁওতাল	ওরাঁও	মুণ্ডা
১৯০১	৫২৮,৪১৫	১১৮,২২৫	৫১,৪৬৫
১৯১১	৬৬৯,৪২০	১৬৫,৩৩৭	৬৭,২৫২
১৯২১	৭১২,০৪০	২০২,৪৪২	৯৯,৩৪৩
১৯৩১	৭৯৬,৬৫৬	২২৮,১৬১	১০৮,৬৫৬

বাঙ্গলা-প্রবাসী সাঁওতাল ও মুণ্ডাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী এখন হিন্দু-পর্য্যায়ভুক্ত; সাঁওতাল ৪৩৩,৫০২ হিন্দু, মুণ্ডা ৬৩,০০০ হিন্দু এবং অধিকাংশই বাঙ্গলা-ভাষাভাষী। কালকেতু ব্যাধ ও কালুডোমকে কাহিনীর নায়ক হিসাবে চিত্রিত করায় আদিম ও আরণ্যক জাতিকে গ্রহণ, রক্ষণ ও পোষণ বাঙ্গলার ধর্ম্ম-মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গলার জনসমাজে ব্যাধ ও ডোম তাহার নীচকুলজনিত অগৌরব হারাইয়া শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিল। অলঙ্কার শাস্ত্রের পুরাতন বিধি লঙ্ঘন করিয়াই বাঙ্গলার কাব্য মুণ্ডা-দ্রাবিড় জাতি হইতে নায়ক বাছিয়া অ-বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া লইল। ভারতবর্ষের সমাজ-বিন্যাস যেরূপ, তাহাতে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব অপেক্ষা সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্ম্মের উপর বাঙ্গালী সহযোগিতার ঘাত-প্রতিঘাত হিসাবে ছোটনাগপুরের সঙ্গে বাঙ্গলা প্রদেশের পুনর্মিলন

সেখানকার আদিম জাতিদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। ছোটনাগপুরকে আলাদা প্রদেশ করা যদি সম্ভব হয় ভালই; তাহা না হইলে বাঙ্গলার সহিত পূর্ব্বেকার মত তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া ইতিহাস-অনুকূল;—ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বিহারের প্রতিও অবিচার হইবে না।

বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

আজও পর্য্যন্ত বৃহৎ বাঙ্গলার বিভাগ রদ হয় নাই। বৃহৎ বাঙ্গলাকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিবার ফলে যেমন বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে, তেমনই বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করা হইয়াছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের পর যখন দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দুর্নিবার রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়কট-আয়োজন ভারতীয় কংগ্রেস সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গলার নেতাগণ তখন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ভাবী সঙ্কোচ ও প্রাদেশিকত্বের বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলার সংস্কৃতি সঙ্কুচিত তো হইয়াছেই। মানভূম ও সিংভূম—যেখানে অনেক জৈন তীর্থঙ্করের সমাধি-মন্দির বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ভাগলপুর—যেখানকার বেহুলা নদীতে বাঙ্গালী সতী তাঁহার স্বামীর শব অঙ্গে ধরিয়া আজও ভাসিয়া চলিয়াছে, গয়া—যেখানকার বোধিবৃক্ষতল হইতে বুদ্ধের মহাশিক্ষা বাঁকুড়া হইতে চট্টগ্রাম ও আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া আজও সজীব রহিয়াছে, ও আসাম—যাহা বৈষ্ণব-জগতের গুরুকুলের জন্মভূমি, বাঙলার মনোময় মানচিত্র হইতে তো তাহারা এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

শুধু তাহাই নহে। ইহার সঙ্গে দেখা দিয়াছে বাঙলার স্বল্প-পরিসরে লোকবাহুল্য ও ভীষণ দারিদ্র্য সমস্যা। জাতীয়তার সঙ্কোচ শুধু নহে, জাতির অনাহার, কৃষি ও শিল্পের দুর্গতি ও ম্যালেরিয়া মহামারীর আধিপত্য, জীবন যাত্রার অধোগতি ও জাতিধ্বংস বাঙলার নিদারুণ ভাগ্যের সম্মুখে দিকেদিকে মুখব্যাদান করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যেমন বাঙলার অভ্যন্তরে জাতি ও সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রিক সংঘর্ষ আনিয়া বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে খর্ব্ব করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টের কোন প্রকার বিপুল আর্থিক পরিকল্পনা উদ্ভাবন অসম্ভব করিয়াছে, তেমনই বাংলার অঙ্গচ্ছেদ এই ঘনবসতি দেশে জন ও জমির পরিমাণের অনুপাতে একটা ঘোর অসমতা আনিয়া অভাব ও অনটন বৃদ্ধি করিতেছে। যদি বাঙালার রাষ্ট্রিক সীমানা বিস্তার করিতে পারা যায়, তবেই শিল্প বিস্তার, কৃষিবিস্তার এবং কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সমতা ও আদান-প্রদান সম্ভবপর হইবে। এই বিস্তার আজ কৃষিপ্রধান, নদী-পরিত্যক্ত, ক্ষয়িষ্ণু বাঙলার জীবনমরণ সমস্যা। তাই আমি একদিকে যেমন রাষ্ট্রিক নেতাদিগকে সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গ-বিভাগ রদ আন্দোলন অপেক্ষা আরও ব্যাপক একটি স্বদেশী বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলন আনিতে নিবেদন করি, তেমনি অপরদিকে উপযোগী শিল্পী বণিককে সীমানার পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই মানভূম, সিংভূম, ছোট নাগপুর ও আসামের দিকে-দিকে খনিজ দ্রব্য সন্ধান করিয়া কয়লা, লোহা, ইস্পাত, গ্যাস ও তৈল প্রভৃতি উত্তোলন ও প্রস্তুতকরণ শিল্প-প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করি। আবার, বাঙলার বাহিরে যে-সব অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা বাঙালীর মনে জাতি-বৈরী ও পক্ষপাতিত্ব হেতু নিরুৎ-

সাহ দেখা দিয়াছে সেখানে বহির্ব্বঙ্গ সাহিত্য আন্দোলনের প্রসারে আহাদিগকে আত্ম ও জাতি-গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। বাঙলা ভারতীয় জাতীয়তার প্রথম ভাবুক, বাঙালী ভারতীয় মহাজাতির একটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু অন্য প্রদেশ যদি এমন প্রাদেশিকতা দেখায় যাহাতে বাঙালী তাহার স্বাভাবিক ও সহজ রাষ্ট্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ না করিলে ভারতীয় জাতীয়তারই ব্যত্যয় ঘটিবে।

সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-শক্তি

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু যে প্রাচীন, গৌরবময় সংস্কৃতের অবিসম্বাদিত উত্তরাধিকারী তাহা নহে। বাঙলা সাহিত্য বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিভায় সমৃদ্ধ ও প্রাণবাণ হইয়া, নিখিল বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য বিচারে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আজ ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অনায়াসে গৃহীত হইতে পারে। ইহাতে সমগ্র ভারত-বর্ষেরই কল্যাণ। হিন্দুস্থানী জাগতিক কারবার ও হাটবাজারের ভাষা। প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে যেমন প্রসাধনের অলঙ্কারের প্রভেদ, হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙলা, তামিল, তেলুগু, কর্ণাটি, মারাঠী প্রভৃতি মাতৃভাষার তেমন প্রভেদ। রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চাতে থাকিলেও ইহার মর্য্যাদা এমন হয় নাই যে, হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল ছাড়া হিন্দী কোন মাতৃভাষার স্থান লইতে পারে। ভারতবর্ষের ত্রৈভাষিক হইবার কল্পনা বা অনুশাসনও সমস্ত শিক্ষাবিজ্ঞান রীতিবিরুদ্ধ। অপরদিকে কংগ্রেসের অনুমোদনের ছাপ না পাইয়াও আপনার বিরাট মহিমায় বাঙলা সাহিত্য বিভিন্ন

প্রদেশের উচ্চশিক্ষিতের বন্ধনী হইয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া বাঙলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য মগধের নির্ব্বাপিত শলাকা হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া সমগ্র পূর্ব্বভারতে সংস্কৃতির প্রভা উজ্জ্বল রাখিয়াছিল। এমন কি পূর্ব্ব ভারত অতিক্রম করিয়া ঐ সংস্কৃতি পৌছিয়াছিল তিব্বত ও চীনে—যখন দীপঙ্কর ও শ্রীজ্ঞানের ভিতর দিয়া সমগ্র বৌদ্ধ-জগৎ বাঙালীর অলৌকিক প্রতিভা ও সৎ-সাহসের পরিচয় পাইয়াছেন। ঐ দীপ্তিতে আলোকিত হইয়াছিল যেমন ভুবনেশ্বর ও কোনার্ক, তেমনি হইয়াছিল ত্রিপুরা, মণিপুর, ও কামরূপ এবং সাগরপারে যব, বালি ও নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের প্রদেশ—ভাঙ্গাগড়া, রাষ্ট্রিক সীমানার নিত্যনূতন পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বারানসী হইতে আরাকানের গিরি-প্রান্তর, গয়াপীঠ হইতে কামাখ্যা, চম্পা-ভাগলপুর হইতে জগন্নাথ তীর্থ পর্য্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতি যে সীমা আঁকিয়া দিয়াছে, তাহা মনোজগৎ হইতে ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ মুছাইয়া দিতে পারে নাই।

বারশত বর্ষ পূর্ব্বে পালরাজগণের সময় বাঙলা যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া তিব্বত, চীন, বর্ম্মা ও দ্বীপময় ভারতে অনার্য্য ও বিদেশীর মধ্যে আর্য্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সমাজ নানা অশিক্ষিত ও আরণ্য জাতিকে হিন্দু-ধর্ম্ম ও বর্ণ বিভাগের সূত্রে আজও এই বিংশ-শতাব্দীতে গাঁথিয়া লইতেছে। আসামের কামাখ্যা শক্তিপীঠে যেমন মহাদেবী কিছু বাঙালী, কিছু চীনা, কিছু দেশাচারে পূজিত, তেমনি মানভূম, সিংভূম ও ছোটনাগপুরে কত রক্ষাকালী আরণ্য জাতির নিকট সুলভ মুরগী ও মহিষ বলি ও পচাইয়ের নৈবেদ্য পাইয়া হিন্দুসমাজের

বিরাট অঙ্কে তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতেছেন। আবার আসামের গ্রামে যেমন গোস্বামীর আশ্রম ও সামাজিক নেতৃত্বে অসমীয়াকে বাঙ্গলার নিমাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতেছে, তেমনি দূর ময়ূরভঞ্জ, পঞ্চকোট ও ছোটনাগপুরের গিরিপ্রান্তরে হরিসভা ও সংকীর্ত্তন কত কোল, দ্রাবিড় জাতিকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত করিয়া, তাহাদিগের বিবাহ-নীতি সংস্কৃত করিয়া, অবশেষে হিন্দুর জাতি-বিন্যাসে তাহাদিগের একটা স্থান নির্ণয় করিয়া সুসভ্য করিতেছে। নদীয়া হইতে গোস্বামীরা সুদূর কটক ও বালেশ্বরে বৎসর বৎসর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের মহালে-মহালে ছড়িদারের সাহায্যে আজও ধর্ম্মশাসন চালাইতেছেন। তখন উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভাগবতপাঠ ও হরি-সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া যায়। এই উপায়ে সংস্কৃতি যে পর্ব্বত, অরণ্য, নদী অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিজাত বিচিত্র মালমশলা নিয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য ও অশিক্ষিতের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক সংস্কার সাধন করিতেছে, ইহা কৃত্রিম রাষ্ট্রিক-গণ্ডি বাঁধিয়া দিয়া পণ্ড করিলে চলিবে না। ইহাতে সর্ব্বপ্রকারের অকল্যাণ।

বাঙলার ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পকলাকে অন্য প্রদেশ অস্বীকার করে করুক, কিন্তু সংস্কৃতির এমন একটা অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অঘটন-পটীয়সী শক্তি আছে যে, সময় সময় সে রাষ্ট্রশক্তিকে অনায়াসে পরাজয় করে. রাষ্ট্রের সীমানা তখন নূতন করিয়া টানিয়া সে আপনার বাসভূমি, স্বরাষ্ট্র বা 'নেশন' গঠন করে। সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রশক্তি যখন একযোগে কাজ করে তখন রাষ্ট্রিক শান্তি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে! ইহাতে সর্ব্বপ্রকারের মঙ্গল। এই যোগাযোগ না থাকিলে বহু বিঘ্ন,

বহু ক্লেশের মধ্যদিয়া শেষে সংস্কৃতিরই জয় হয়। বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি কৃত্রিম প্রাদেশিক বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে নিশ্চিতই পরাজিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পশ্চাতে আছে এক হাজার বৎসরের ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য দেয়—বাঙালীর তিব্বত ও চীন বিজয়ের, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ ও দ্বীপময় ভারতে স্থাপত্য ও কলাশিল্পের নবযুগ আনয়নের, নব্য ন্যায়ের মত সূক্ষ্মদর্শন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত উদারতম প্রেমসাধনার চরম বিকাশের এবং আধুনিক যুগে রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বজনীন, সর্ব্বতোমুখী অদ্ভুত প্রতিভার।

গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন বাংলার নদী সমূহ।

ভ্যান ডেন ব্রুকের বাংলার মানচিত্র (১৬৬০)।
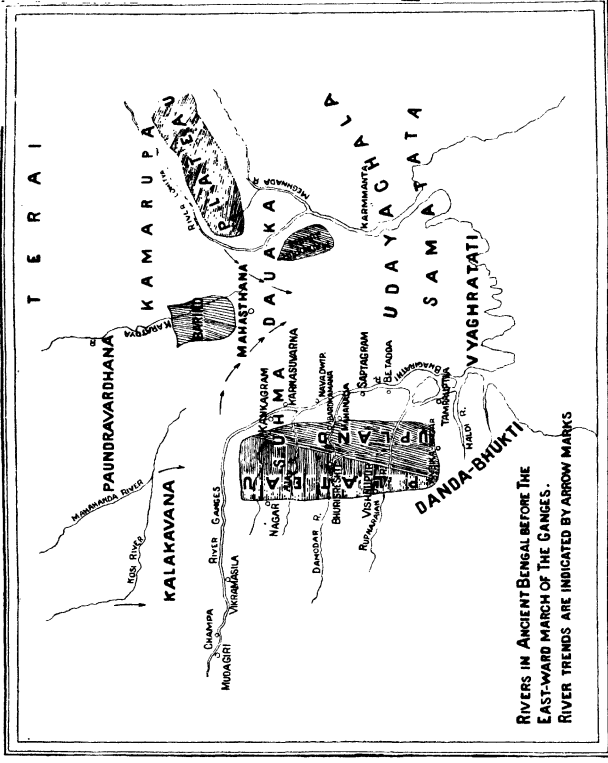
১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের নদী সমূহ।
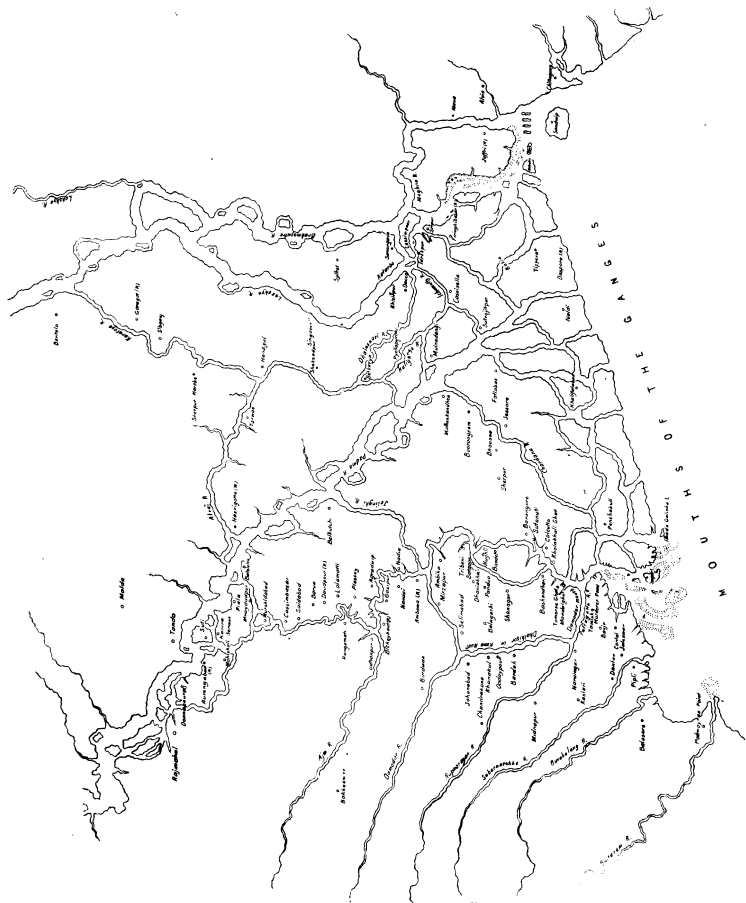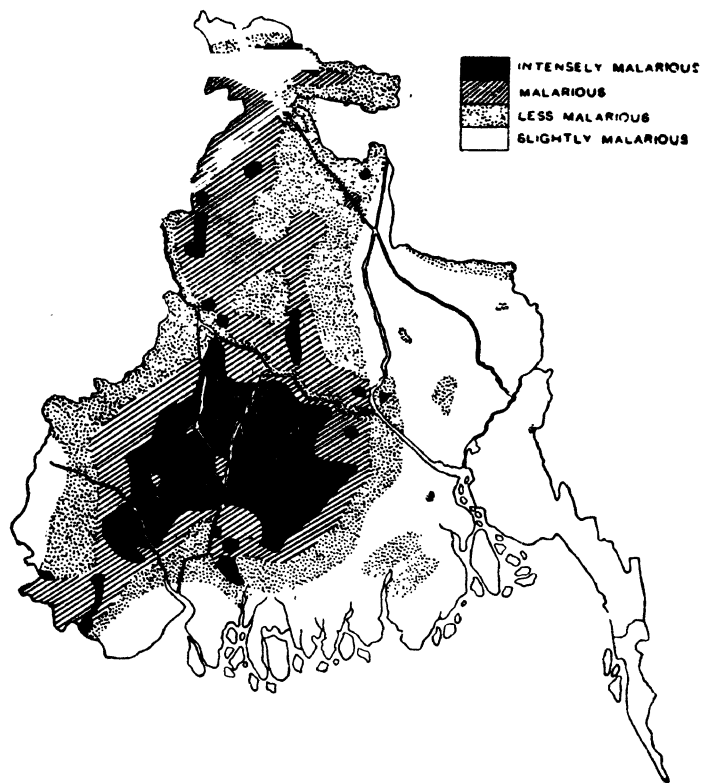
১৯১৬ সালে বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তার বুঝাইবার মানচিত্র।
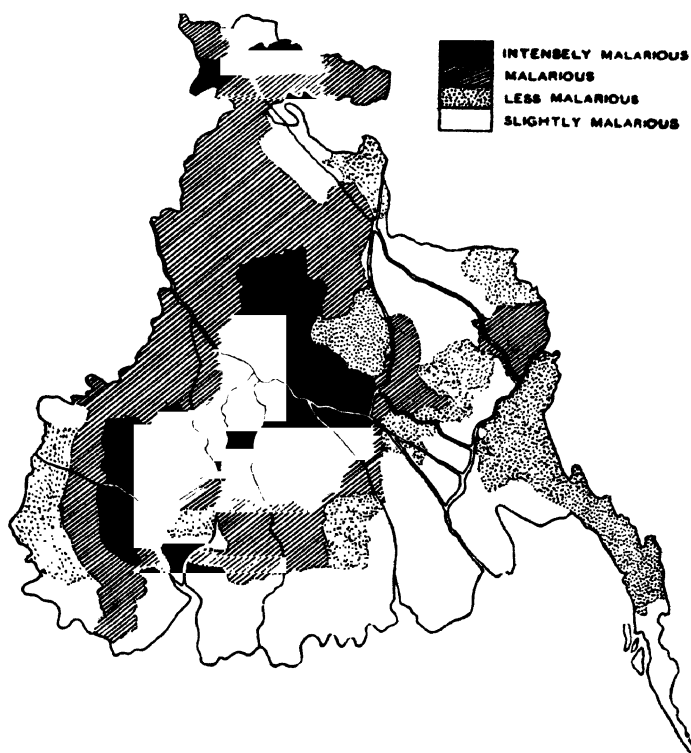
১৯৩৪ সালে বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তার বুঝাইবার মানচিত্র
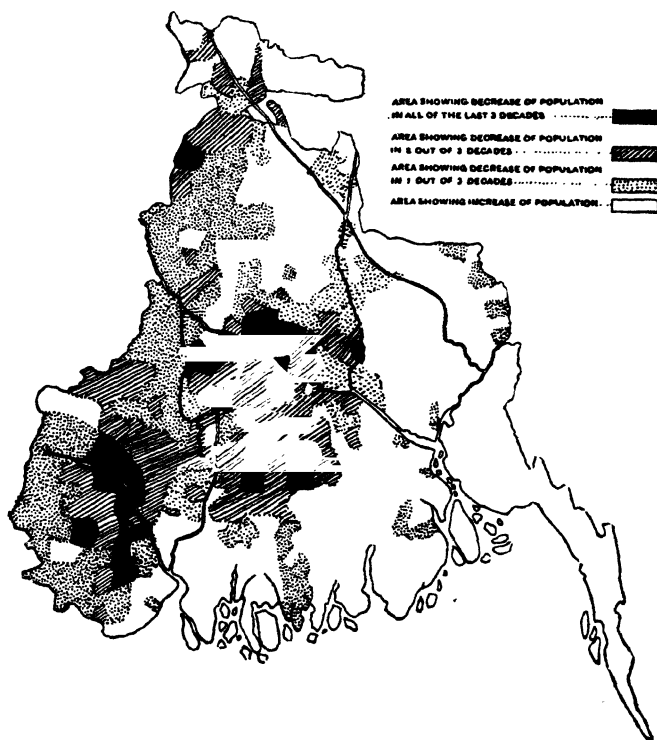
গত তিন দশকে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য
'মজা' ও গঠনশীল ব-দ্বীপ সমূহের মানচিত্র।

'মজা' ও জীবন্ত ব-দ্বীপ সমূহের কৃষির হ্রাসবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।

10
8
6
1872 1881 1891 1901 1911 1921 1931
B
A

A—Nadia.
B—Jessore.

10
8
C
6
1872 1881 1891 1901 1911 1921 1931
D
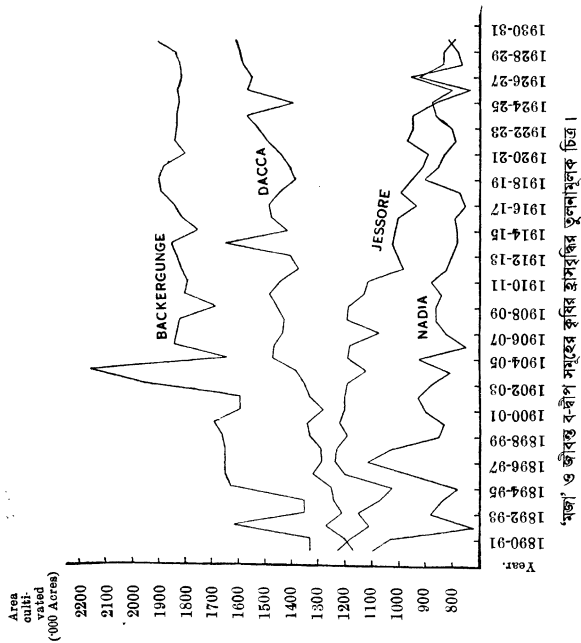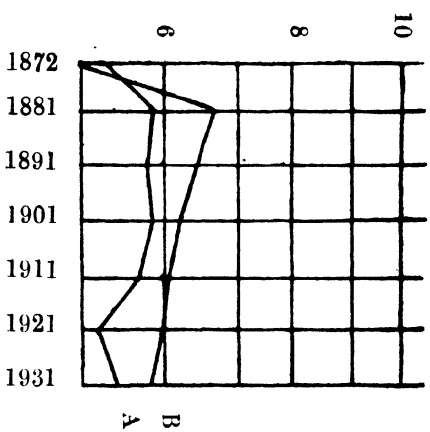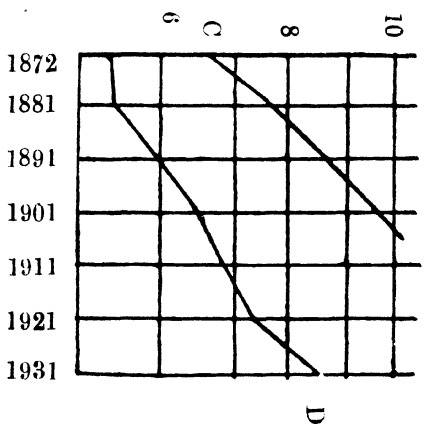
C—Dacca.
D—Bakargunj

'মজা' ও জীবন্ত ব-দ্বীপ সমূহের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।
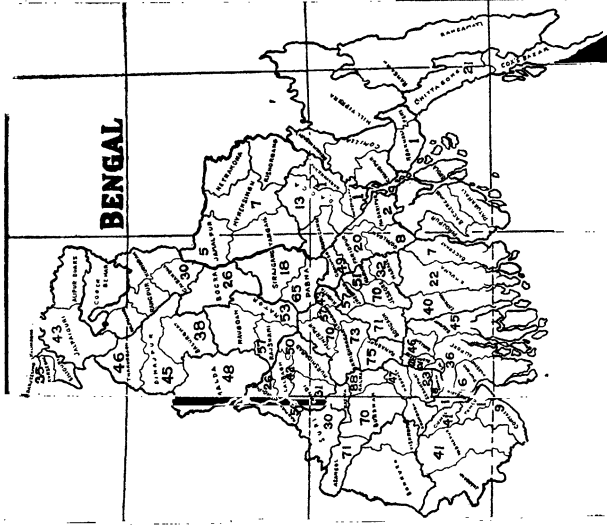
বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্লীহার বিস্তৃতি বিষয়ক চিত্র।

দ্রষ্টব্য—ম্যাপের মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি প্লীহারোগীর শতকরা হিসাব জ্ঞাপক।